প্রসঙ্গ ক্ষুদিরাম দাস

প্রসঙ্গ ক্ষুদিরাম দাস

ভূমিকা

বর্তমান অসহিষ্ণু, বিশৃঙ্খল ও স্বার্থান্বেষী সমাজে যখন প্রায় প্রতিটি মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে, হতাশ হয়ে পড়ছে, তখন মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতো এক ব্যক্তিত্ব সামনে থাকা প্রয়োজন। যার জীবনের পথে ঋজু প্রত্যয়ী হাঁটা, মানুষের মনে সাহস যোগাবে। যার দিকে তাকিয়ে মানুষ বিশ্বাস ফিরে পাবে যে- সরল অনারম্বর জীবন যাপন করে, সত্যের পথে অবিচল থেকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ও স্বার্থহীন ভালোবাসার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। শতবর্ষ পরেও মানুষ তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে এবং তাঁর বইগুলি Digital করা হচ্ছে। তাই আজ এই সামাজিক সংকটকালে তাঁর মানবিকতাময় জীবন মানুষের সামনে তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণেই ‘প্রসঙ্গ –ক্ষুদিরাম দাস’- এর অবতারণা।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে কিছু বিশিষ্টজনের লেখা যারা ডঃ দাসকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর অধীনে গবেষণা করেছেন, তাঁর কাছে পড়েছেন বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠনে একসাথে কাজ করেছেন। ডঃ দাস পদে পদে যে প্রতিকুলতার সাথে সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা তাঁদের রচনায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের লেখা বইগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ‘পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস’ বইটি সম্বন্ধে সমালোচকদের মতামত।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত ওনার সম্বন্ধে আলোচনা, বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তির খবর, ওনাকে লেখা বিভিন্ন গুনীজনের চিঠি ও শেষে কয়েকটি বিশেষ উপলক্ষে ওনার দেওয়া বত্তৃতা।

এই সব কিছুই কোন না কোনভাবে ডঃ দাসের একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছে আর সেই মানুষটিকে প্রকাশ করাই এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

আচার্য ক্ষুদিরাম দাস জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি কলকাতা শাখার পক্ষে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস - মানস মজুমদার	১০
২	ডঃ দাসের অধীনে যারা গবেষণা করেছেন -	
	অভিজ্ঞতা আলোকে ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের জীবনকথা- নমিতা মণ্ডল	২৯
	অনন্য ক্ষুদিরাম - অমরেন্দ্র গণাই	৩৯
	এই লভিনু সঙ্গ তব - পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী	৪২
	তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ - মুসা কালিম	৫১
৩	বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্ররা -	
	অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস স্মরণে-শ্রদ্ধায় - তরুণ মুখোপাধ্যায়	৫৩
	জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা - হর্ষ দত্ত	৫৭
	আচার্য কাহিনি - মণিদীপা দাস	৬১
	স্যারের সঙ্গে কয়েকদিনের অমলিন স্মৃতির কটি পাতা- অশোককুমার মিশ্র	৬৪
৪	মহাবিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্ররা -	
	প্রণাম- আচার্য ক্ষুদিরাম দাস - বাসুদেব সাহা	৬৯
	স্যারের জীবনের এক অদ্‌ভুত ট্র্যাজেডি- পবিত্রকুমার সরকার	৭৬
৫	যারা কাছ থেকে দেখেছেন -	
	যেমন দেখেছি- যেভাবে পেয়েছি - শতঞ্জীব রাহা	৮১
	কাছের মানুষ ক্ষুদিরামদা - চিত্তরঞ্জন লাহা	৮৪
	আমার দৃষ্টিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস- প্রকাশ চক্রবর্তী	৮৭

৬	সংগঠনে একসাথে কাজ করেছেন -	
	রসালো মনের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ক্ষুদিরামদা - ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০
	আমাদের চোখে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস - জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	৯৩
	পরিচয়ে গভীরে ক্ষুদিরাম দাস - ধনপতি সামন্ত	৯৪
৭	বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ -	
	ক্ষুদিরাম দাস ও শক্তিনাথ ঝা - আজিজুল হক	১০০
৮	বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী -	
	একালে অন্যতম অগ্রণী রবীন্দ্রভাবুক - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	১০২
৯	আত্মজার চোখে -	
	আমার বাবা - বাণীমঞ্জরী দাস	১০৬
	বাবার সান্নিধ্যে সেই সোনার দিনগুলি - ভারতী দাস	১০৯
	ক্ষুদিরাম দাস- একটি ব্যতিক্রমী নাম - বাণীমঞ্জরী দাস	১১৩
১০	'ভালোবাসার উৎসর্গ'	১২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডঃ দাসের লেখা বইগুলি সমালোচনা

১	রবীন্দ্র প্রতিভা পরিচয় - নির্ম্মল কুমার ঘোষ	১২৯
২	চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী- ভারতবর্ষ পত্রিকায়	১৩২
৩	পাণ্ডিত্য ও অনুভবের এক বিরল মিলন - ভবতোষ দত্ত	১৩৩
৪	গৌড়িয় বৈষ্ণব দর্শন ও কাব্য - নারায়ণ চৌধুরী	১৩৫
৫	Vaisnava Rasa Prakash - Narayan Choudhury	১৩৮
৬	সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ - আনন্দবাজার পত্রিকায়	১৪১
৭	রবীন্দ্রনাথের নভোবিজ্ঞানী চেতনা প্রতিই বেশি মনঃসংযোগ - ক্ষিতীশ রায়	১৪৩
৮	নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন - বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪৭
৯	চোদ্দশ'সাল ও চলমান রবি - বিনতা রায়চৌধুরী	১৫০
১০	চলিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ - মানস মজুমদার	১৫৪
১১	বানান বানানোর বন্দরে - আনন্দবাজার পত্রিকা	১৫৭
১২	অধিকার ও চিন্তার ব্যাপ্তি - বারিদবরণ ঘোষ	১৫৮
১৩	মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টির আলাদা জগতের প্রবন্ধ - বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	১৫৯
১৪	প্রবীণ আচার্যর রচনায় আজও সেই হীরকদীপ্তি - গৌতম ঘোষ দস্তিদার	১৬১
১৫	বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল ধারা - গৌতম নিয়োগী	১৬৪

১৬	প্রথাসিদ্ধ সুপণ্ডিত এবং বহুদর্শী ভাবুকের দুই ধারা - সোহিনী ঘোষ	১৬৭

তৃতীয় অধ্যায়

পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস বইটি সম্বন্ধে সমালোচকের মতামত

১	চলিষ্ণু উদ্দীপক বই - অপূর্ব কর	১৭০
২	শুধু মনীষা ঔজ্জ্বল্য নয় ধরা পড়ে অতীত চিত্রও - নিমলেন্দু ভৌমিক	১৭৩
৩	বিদগ্ধ অধ্যাপকের অন্তরঙ্গ চিত্র - রামেশ্বর শ	১৭৬
৪	এক বিশ্রুত অধ্যাপক - পুলিন দাস	১৭৮
৫	মননশীল গবেষককে শ্রদ্ধার্ঘ্য - পবিত্রকুমার সরকার	১৮০
৬	চমকপ্রদ তথের উজ্জ্বল উপস্থিতি - তুষারকান্তি মহাপাত্র	১৮৪
৭	বিদ্যাতীর্থের তাপস - কুন্তল মিত্র	১৮৬
৮	পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস - শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়	১৮৯
৯	বই পাড়া খবর	১৯২

চতুর্থ অধ্যায়

১	বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত ওনার সম্বন্ধে আলোচনা , বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তির খবর	১৯৫

পঞ্চম অধ্যায়

১	চিঠি পত্র	২৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়

১	কয়েকটি বিশেষ উপলক্ষে ওনার দেওয়া বক্তৃতা	২৬৬

প্রথম অধ্যায়

অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

মানস মজুমদার

জন্ম ও পরিবেশ

গ্রামটা ছিল বেশ বড়, বহু পাড়া-সমন্বিত এবং বহুজন-অধ্যুষিত। হাট, বাজার, পোস্টাপিস, ছোট রেলের স্টেশন, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় ছায়াশীতল আমের সারিতে আবদ্ধ দূর-দূরান্তর-বিসর্পী চওড়া লাল রাস্তা। উত্তরে মাইলখানেক দূরে একটা নদী, ক্ষীণ জলরেখা এঁকে সাদা বালির শয্যায় গা এলিয়ে সারাদিনমান উদাসীনভাবে রয়েছে পড়ে। আর দূর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ঘিরে কাঁকর-মাটির প্রান্তর ও আমের বাগান পেছনে রেখে শ্যামায়মান অন্ধকারে নীরবতার মন্ত্র জপ করে চলেছে সুদীর্ঘ শাল অরণ্য, গ্রামে গায়ে গায়ে লাগানো সব বাড়ি। দালান কোঠা, খড়ের চালা, টিনের চালার এক মহাসম্মিলন । মাটির বাড়িগুলো প্রায়শই ওপর- কোঠাওয়ালা, দোতলা। বহু পূর্ব থেকে জমিদার-অধ্যুষিত এই গ্রাম বহু জাতি ও বৃত্তির মানুষের বাসভূমি। অর্থনীতি ও জীবিকার দিক থেকে একটা সামগ্রিক ইউনিট, আশপাশের বিশটা গ্রামের কেন্দ্র।.....ইস্কুলগামী মাঝের বড় রাস্তাটায় এসে পড়লেই সারি সারি সূত্রধর (ছুতার), মোদক-কার (ময়রা) ও স্বর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের মানুষের দোকান ও বাড়ি। একদিকে কাঠের কাজ চলেছে বাটালি, বাসলে, রেঁদা ও দাগ বসানর তুরপুন নিয়ে, অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে মন্ডা, ম্যাচা, তেলেভাজা, টানানাড়ু, গুড়পিঠে, ওলা প্রভৃতি। সূত্রধরদের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে চিঁড়ে-কোটার শব্দ। দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে আঁকা পট-জাতীয় নানান্ চিত্রকলা। আবার কেরোসিনের ধূমায়িত দীপ নিয়ে সোনা-রূপোর অলংকার তৈরির শব্দ উঠছে ঠুক-ঠাক। পথের ওপর এ্যাসিড সহযোগে সোনা শোধন করার কটু গন্ধ আসছে ভেসে। জমিদার-তান্ত্রিক গ্রাম। ভালও বটে, মন্দও বটে। শিক্ষিত এবং আধা-কলকাতাবাসী লোকের সংখ্যাও কম নয়। জোতদারও ছিল, কিন্তু লাঙল হাতে জমি নিজে চাষ করার মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। গ্রামের উত্তর ঘেঁষে ছিল বহু শাখায়িত ও অবক্ষয়িত জমিদারগোষ্ঠীর দালান বাড়ি। পুবে ও দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলে নাপিত-পাড়া ও বামুন-পাড়া, মধ্যে ব্যবসায়ী তাম্বুলিকেরা, তার দক্ষিণে শুঁড়ি-জাতীয় উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকদের বাড়ি আর বৈষ্ণবদের পল্লী। আর প্রত্যন্ত ঘিরে বাস করতেন বাউরী, ডোম, মুচি ও লোহারেরা।

বহুবিচিত্র পাল-পার্বণ আর উৎসবের সমারোহ সে-গ্রামে। দুর্গাপূজো, কালীপূজো, জগদ্ধাত্রী, সত্যপির, হরিসংকীতন, শিবের গাজন, ধর্মঠাকুরের গাজন, মনসার ভাসান এসব তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, ব্যাঘ্ররায়, ইতুপুজো, তুষলা, ভাদু, এখ্যান পুজো, শেয়াল-শকুনির তুষ্টি সাধনের উৎসব, ধান পোঁতা আর কাটার উৎসব, ঘেঁটুপুজো। গ্রামের গাছতলায় অধিষ্ঠান ছিল ভৈরব, মাদানা, জিনাসিনী, রঙ্কিনী প্রভৃতি লৌকিক দেব দেবীর। এদের পূজোয় ছিল খিচুড়ি-মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা। যাত্রা, সং, কীর্তন, রামায়ণ গান, ভাগবত নিয়ে কথকতা ইত্যাদির আয়োজন মাঝেমধ্যেই হত।

গ্রামের নাম বেলেতোড় (বেলিয়াতোড়) । বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রাম। এই গ্রামেই ক্ষুদিরাম দাসের জন্ম। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর। সন ১৩২৩ সালের ২৩ শে আশ্বিন। কোজাগরি পূর্ণিমার সন্ধ্যালগ্নে। বাবা সতীশচন্দ্র, মা কামিনীবালা। বেলেতোড় গ্রামটি বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম একটি পীঠস্থান। এই গ্রামেই জন্মেছেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ, শিল্পী যামিনী রায়।

ক্ষুদিরাম দাসের শৈশব বাল্যের দিনগুলি মূলত মধ্যযুগের ঐতিহ্যে লালিত। যাত্রা, কীর্তন, রামায়ণ গান, কথকতা এসবের প্রভাব তাঁর অন্তরে স্থায়ীভাবে পড়েছিল। উত্তরকালে মধ্যযুগ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আর লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে আধুনিক কালের নিঃশব্দ পদসঞ্চারও ঘটেছিল। আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রবেশ পুরোনো সমাজব্যবস্থাকে নাড়া দিতে শুরু করেছিল। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার বাধা অতিক্রম করে নিম্নবর্গে মানুষজন আধুনিক শিক্ষা লাভ করে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। জাতবৃত্তির দাসত্বে আর তাদের বন্দি করে রাখা যাচ্ছিল না। ক্ষুদিরাম দাস কালের এই সংকেতধ্বনিতে সাড়া দিয়েছিলেন। জাতিগত অপমান এবং লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রবল আত্মবিশ্বাস, অপরিসীম সাহস, অমিত অধ্যাবসার আর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসহায়তায় বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

শিক্ষা

জীবনের প্রথম পাঠ নিয়েছেন বাবার কাছে। হাতেখড়ি, তালপাতায় লেখা, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, নামতা, যোগ-বিয়োগ, শুভঙ্করের দু চারটি আর্যা এসব বাবার কাছেই। একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় তিনি জানিয়েছেন; “বাবা অনর্গল মুখস্থ না করিয়ে ছাড়তেন না, আর কেমন করে জানি না,

আমারও সবকিছু দ্রুত মুখস্থ হয়ে যেত। ধ্বনি নিয়ে, উচ্চারণ ভঙ্গি নিয়ে, চোখে যা দেখছি তার মানসিক ছবি নিয়ে দ্বিতীয় ভাগ ত বটেই, অঙ্কগুলোও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল পাঁচ বছর না যেতেই। এর ফলে হয়েছিল, পথে বের হলেই মজা করার জন্য বর্ষীয়ানরা জিজ্ঞেস করতেন- 'পঞ্চান্ন বানান বল। আটানব্বই? ২৩ x ১৭ কত হয় ? "

এর পর ভরতি হলেন কেশবচন্দ্র মণ্ডলের পাঠশালায়। ক্ষুদিরাম দাস পূর্বোক্ত রচনায় জানিয়েছেন 'মাসিক চার আনা বেতনের ঐ পাঠশালাটায় বাবা জোর করে ভরতি করে দিয়েছিলেন। ঠিক পড়ার জন্য নয়, পুকুরের জল আর রাস্তার গাছের সরু ডাল থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য।' স্বভাবে একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন তিনি। তাই এ-সতর্কতা। পাঠশালা শুরু হত সুরে স্তব আবৃত্তি করে-'প্রভু মীশমনীশম শেষ গুণম্,' আর ছুটি হত ড্রিল এবং কড়াগন্ডা নামতা ঘোষান দিয়ে। তিনি এগুলো জানতেন, তাই সুরে সুর মেলাতেন। কিন্তু 'চোখ থাকত চিল উড়তে থাকা আকাশ-ছোঁয়া তেঁতুল গাছের মাথায় আর মনটা থাকত সঞ্চিত কাঠঠোকরা ফলের বীচিগুলোর ওপর, যা নিয়ে খেলার সময় হয়ে এল বলে।'

১৯২২-এ ৬ বছর বয়সে বেলিয়াতোড় মধ্য ইংরাজি স্কুলে ছাত্রজীবনের আর-একটি পর্ব শুরু হল। ভরতি করে দিয়ে এলেন ঠাকুমা। শিক্ষার্থীর পরনে পাঁচ আনা দামের লাল ফুলম পাড় একটি নতুন ধুতি এবং বোতামহীন ছিন্ন পকেট অতি-ব্যবহারে মলিন একটি জিনের কোট। ভরতির পরীক্ষায় উতরে গেলেন।

স্কুলবাড়িটি মাটির। খড়ের দোচালা। ক্লাস ওয়ানে বসতে হত চটের আসনে। জনা-তিরিশেক ছাত্র। স্লেট পেনসিল ছাড়াও আছে বর্ণপরিচয় ও ধারাপাত। একটা বড়ো ঘরে পাশাপাশি বসত ওয়ান এবং টু-এর ক্লাস। ক্লাস টু-এর ছেলেদের জন্যে অবশ্য ব্যবস্থা ছিল খাটো বেঞ্চের।

১৯২৫। ক্লাস ফোরের ছাত্র। দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা। বালক ক্ষুদিরামকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেল। অপূর্ব শিহরন। এভাবেই স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা হল। স্বদেশকে ভালোবাসতে শিখলেন। ক্লাস ফোরে পড়তে পড়তেই উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নেতৃত্বে এক দিনের জন্যে স্কুল বয়কট করলেন। দাবি ; স্কুলের নামের সঙ্গে যে- সাহেবের নাম যুক্ত আছে তা উঠিয়ে দিতে হবে।

স্কুলে পড়াশোনা যেমন ভালো হত, তেমনই শাসনও ছিল কঠোর। শিক্ষকদের ওপর অভিভাবকদের শ্রদ্ধা ছিল, ছিল আস্থা। শিক্ষকদেরও সামাজিক দায়বদ্ধতা বেশী ছিল। সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্যে তাঁরা প্রয়োজনে কঠোর হতেন, ছাত্রদের শাস্তি দিতেন। বালক ক্ষুদিরামকেও বালকসুলভ চপলতার জন্যে দুবার হেডমাস্টারমশায়ের কাছে শাস্তি পেতে হয়েছে। আবার রেগুলার অ্যাটেনড্যান্স-এর জন্যে একবার স্কুলের প্রাইজও পেয়েছেন।

বাংলা পড়াতেন হেড পণ্ডিতমশায় । নর্ম্যাল পাস। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে অসাধারণ। কী ব্যাকরণ, কী সাহিত্য দুইয়েতেই দক্ষ। ক্ষুদিরামের বাংলার ভিত তৈরি হয়েছিল এঁর হাতেই। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতের ভিত্তিভূমিটিও তিনি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

ন দশ বছর বয়সে এক জন বিখ্যাত টোলের পণ্ডিতের সংস্কৃতে বক্তৃতা শুনে সংস্কৃতের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন। তাঁর জীবনে এই বক্তৃতার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এসময় থেকেই তিনি গীতা পড়তে থাকেন। গীতা-র প্রায় সবটাই মুখস্থ হয়ে যায়।

একসময় মধ্য ইংরেজি স্কুলের জীবন শেষ হল। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বৃত্তি পেলেন। গ্রাম ছেড়ে চললেন বাঁকুড়া শহরে। ভরতি হলেন বাঁকুড়া জেলাস্কুলে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩। 'আরম্ভ হল একদিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রচন্ড সংগ্রাম, অন্যদিকে সাহিত্য ও আদর্শের স্বপ্নজাল রচনা।'

স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তাই স্কুলে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতা, মেঘদূতের বহু শ্লোক, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ এর সমস্ত শ্লোক এবং পাঠ্য ইংরেজি কবিতাগুলি তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। ১৯৩৩-এ শুধু যে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাই নয়, সংস্কৃত কাব্যের 'আদ্য' এবং পুরাণ পরিষদের 'মধ্য' পরীক্ষাও পাস করেন।

১৯৩৩-এ বাঁকুড়া ওয়েজনিয়ান মিশন ('অধুনা ক্রিশ্চিয়ান') কলেজে আই. এ. –র ক্লাসে ভরতি হলেন। কলেজে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ যেমন পেলেন, তেমনই সুযোগ পেলেন হস্টেলে বিনা বেতনে খাওয়ার। থাকেন স্কুলডাঙায় কবিরাজ রামব্রহ্ম সেনের ভেষজ উদ্যান বাটিকায়। ১৯৩৫ –এ আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ওই কলেজেই সংস্কৃত অনার্স ক্লাসে ভরতি হলেন। বাংলায় অনার্স তখনও কোথাও চালু হয়নি। কলেজের সংস্কৃত বিভাগে

তখন ছিলেন রামশরণ ঘোষ। অসাধারণ অধ্যাপক। ‘অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ মশায়ের অধ্যাপনা বিষয়ে স্মরণীয় কথা হল তিনি বেদ থেকে আরম্ভ করে ব্যাকরণ, অলংকার, নাটক, কাব্য-ছটা পত্রই সমান দক্ষতায় সঙ্গে পড়াতেন, লেখাতেন, এমন কী বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নপত্র দিয়ে ঘড়ি ধরে লেখাতেন। একাধারে ঐসব বিভিন্ন বিষয়ে তখনও কোনও একজন পড়াতে পারতেন না কোথাও, এখন তো নয়ই।’ তাঁরই তত্ত্বাবধানে চলল পড়াশোনা। ১৩৩৭-এ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। সেইসঙ্গে কাব্য ব্যাকরণের ‘মধ্য’ পরীক্ষাতেও পাস করলেন।

ইচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়েন। কিন্তু সংগতি নেই। অনেক ভেবেচিন্তে পকেটে মাত্র ন-আনা পয়সা নিয়ে এক দিন কলকাতায় পৌঁছোলেন। পরিচিত জনের সাহায্যে একটা আশ্রয় জুটিয়ে নিলেন। কয়েকটা টিউশনিও পেয়ে গেলেন। টিউশনিই ভরসা। কলকাতার খরচ চালানো এবং সাধ্যমতো বাড়িতে কিছু টাকা পাঠানোর অবলম্বন। ১৯৩৭-এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতিও হলেন। কিন্তু সংস্কৃতে নয়, বাংলায়। কারণ বাংলায় চাপটা কম। সকাল – সন্ধে টিউশান করতে হলে বাংলাই ভালো। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বাংলা বিভাগে ভাষাতত্ত্বের ক্লাসও নিয়ে থাকেন। তিনি এক দিন ক্লাসে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সামনে ক্ষুদিরামবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন; ‘আপনি সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়ে বাংলায় এম. এ. পড়তে এলেন কেন?’ ক্ষুদিরামবাবুর প্রত্যয়দীপ্ত উত্তরঃ ‘এখানেও আমি প্রথম হব। । will top the list.’ ক্ষুদিরামবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। ১৯৩৯ –এ বাংলা এম এ পরীক্ষায় ফল বেরোলে দেখা গেল, তিনি ৭২.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ স্বর্ণপদক–সহ পাঁচটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্যপদকের অধিকারী হয়েছেন। ১৯৩৯-এই তিনি কাব্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন পরীক্ষা পাস করেন। ১৯৪১-এ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

কর্মজীবন

ক্ষুদিরাম দাস স্কুল সাব-ইন্‌স্পেকটার রূপে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি অধ্যাপনা কর্মেই যুক্ত থেকেছেন। তাঁর কর্মজীবনের পরিসরটি ছোটো নয়। প্রায় চল্লিশ বছরব্যাপী প্রসারিত। তালিকাটি নিম্নরূপঃ

১৯৪২	কালনা ও খানাকুলে স্বল্পকালের জন্যে স্কুল সাব ইন্‌স্পেকটারের পদে নিযুক্ত।
১৯৪২	প্রায় দেড় মাস স্কটিশ চার্চ কলেজের লেকচারার
১৯৪৩-৪৫ জুলাই ৯	কলকাতার উইমেন্‌স কলেজে অধ্যাপনা। সেইসঙ্গে সিটি কমার্স কলেজের সান্ধ্য বিভাগে আংশিক সময়ের লেকচারার
১৯৪৫ জুলাই ১০- ২০ ডিসেম্বর ১৯৫৪	প্রেসিডেন্সি কলেজে লেকচারার পদে বৃত
১৯৫৪ ডিসেম্বর ২১ – ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫	কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে(একালের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ) অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর
১৯৫৫ ফেব্রুয়ারি ৪ – ১১ আগস্ট ১৯৫৫	প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রত্যাবর্তন
১৯৫৫ আগস্ট ১২ – ৩ জুলাই ১৯৫৯	অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, কৃষ্ণনগর কলেজ
১৯৫৯ জুলাই ৪ – ২ এপ্রিল ১৯৭৩	অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, মৌলানা আজাদ কলেজ
১৯৭৩ এপ্রিল ৩-৩১ আগস্ট ১৯৭৩	প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, হুগলী মহসীন কলেজ
১৯৭৩ সেপ্টেম্বর ১ – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, ১৯৬৯-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর আগস্ট পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রথিতযশা এই অধ্যাপক বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাগুরু। তাঁর কৃতি ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ, অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্রমুখ। যথার্থই তিনি শিক্ষকদের শিক্ষক।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর স্মৃতিচারণে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস সম্পর্কে লিখেছেনঃ

" চেহারায় খাটো, বর্ণ শ্যাম, উচ্চ গ্রামে কথা, উত্তেজনাপ্রবণ। সাহিত্যের রস নিবেদনের চেয়ে তার বিশ্লেষণে অধিক মনোযোগ তাঁর। ..... সংস্কৃতে অধিকার সম্পন্ন, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে সতর্ক ও বুদ্ধিশীল। মাঝে মাঝেই প্রচলিত ধারণার বিপরীত কথা বলেন, ফলে অনার্স ক্লাসে তাঁর সঙ্গে বেধে যেত তুমুল তর্ক। .... নির্মোহ নিরাসক্ত ভাবে তিনি মঙ্গলকাব্যকে উপস্থিত করতেন, তাতে দেবমাহাত্ম্যের ব্যাখান থাকত না, পরিবর্তে পেতাম মঙ্গলকাব্য তার অনাবশ্যক মেদের মধ্যে সমকালীন মনুষ্য-জীবনের বস্তুভার কতখানি বহন করছে তার সন্ধান। আর তাঁকে অসাধারণ শিক্ষকরূপে পেয়েছিলাম অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইটি পড়াবার সময়ে। এখানে তিনি স্বধিকারে বিচরণ করতেন। প্রায় দু'বছর ধরে প্রথম পিরিয়ডে তিনি এই চটি বইটি পড়িয়েছেন ..... ক্ষুদিরামবাবু সাহিত্য দর্শনকে সাহিত্যলোকে প্রবেশের আলোকলিপি-বিদ্যা মনে করতেন। পড়াবার সময়ে তিনি প্রশ্নের উত্তর লিখে দেখাতে বলতেন। অবিরাম প্রশ্নের উত্তর লিখে যাওয়া, তাঁর মতে, পরীক্ষা-তরণীর দাঁড় বাওয়া। একই উদ্দেশ্যে আর একটি ছাত্র-কৃত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন- পাঠ্য বইগুলি থেকে কিছু কিছু ছাঁকা অংশ মুখস্থ ক'রে ফেলা। .....সকল পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ভাব ছিল, সেটাই মনকে বিশেষভাবে টানত।"

অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ তাঁর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি অধ্যাপক দাসকে দেখতে দিয়েছিলেন। যথারীতি লেখাটি দেখে অধ্যাপক দাস যখন তা শঙ্খবাবুকে ফিরিয়ে দিলেন, তখন শঙ্খবাবুর অবস্থা হল করুণ ও মর্মান্তিকঃ " সমস্ত লেখাটা লালে লালে ভরে গেছে। লেখার নীচে নীচে দাগ, শুধুই দাগ, আর মার্জিনভরা লাল কালির মন্তব্য। ও-রকম নির্দয় প্রাণঘাতী মন্তব্য কোনোদিনই শুনিনি জীবনে। ..... লাল লেখাগুলির মধ্যে নিরীহতম ছিল বোধ হয় এইটে যে 'চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না'।" কিন্তু এর পর বি এ ফাইনাল পরীক্ষার আগে একটি প্রশ্নোত্তর লিখে দেখালেন তখন অভিজ্ঞতা হল ভিন্ন। শঙ্খবাবু জানিয়েছেনঃ ' কিছুটা বিরুপ ভঙ্গিতেই তাঁর কাছে আবার খাতা ফেরত নিতে গিয়েছি যখন, খাতা খুলে তখন দ্বিতীয়বার চমক লাগল আবার। লাল কালির নয়, এবার মন্তব্য কালো কালিতে; বিস্তারিত নয়, এবার মন্তব্য সংক্ষিপ্ত; প্রশ্নভঙ্গিমায় নয়, এবার মন্তব্য সূত্রভঙ্গিমায়। মনে আছে প্রায় গাণিতিক যাথার্থ্যে, অল্প কয়েকটি শব্দ সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি লেখার শেষে, সমীকরণের ধাঁচে, যা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ঝাপসা ভাবটা কেটে গেল অনেকখানি, মনে হল রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে যেন দেখতে পাচ্ছি দিব্য এক স্বচ্ছতায়।'

শিক্ষাগুরুর আর একটি বিশেষত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি- ' ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হবার সহজ কতকগুলি রাস্তা আছে, তার মধ্যে একটা হল তার অহ্ংকে তৃপ্ত রেখে কথা বলা, তার কোনো ত্রুটির কথা একেবারেই না-বলা। কিন্তু না-ই যদি বলা হবে, কীভাবে তবে শোধন হবে সেই ত্রুটির? তাই ছাত্রদের মঙ্গল যিনি চান, তিনি চান না কোনো সহজ জনপ্রিয়তা। আমাদের এই মাস্টারমশাইও তা চাননি। শোধন করতে চেয়েছিলেন তিনি, আর সেইজন্যে, কিছুদিন তাঁর প্রতি নিবিড় বিমুখ ছিলাম আমরা অনেকেই, আর –এক বার বোধোদয় হবার পর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর সান্নিধ্যের অপার উপযোগিতা এবং তাঁর সঙ্গে চিন্তা বিনিময়ের সুদূরপ্রসারী সুফল।'

যোগাযোগ তাই ছিন্ন হয়নি শিক্ষাগুরুর সঙ্গে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পড়ছেন কিংবা এম এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, তখনও অধ্যাপক দাসের কাছে যেতেন শঙ্খবাবু। এ-সময়ের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন শঙ্খবাবু তাঁর স্মৃতিচারণায়ঃ 'শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মস্ত একখানা ঘরের এক কোণে মাদুর বিছানো তাঁর আস্তানা, মেস করে থাকেন, অন্য কোণে অন্য আর–একজন। একজন অধ্যাপকের ঘর বলতে যে-সমস্ত সম্ভ্রান্ত ছবি কল্পনায় ভাসে ওঠে, তার চিহ্নমাত্র নেই সে-ঘরে। একপাশে একটা সুটকেস, গুটিয়ে রাখা বিছানা , এ-কোণ ও-কোণ দড়িতে ঝোলানো দু-একটা জামাকাপড়, আর শিয়রের কাছে রাখা এলোমেলো কয়েকখানা বই, সেইসঙ্গে একপ্রস্থ রবীন্দ্ররচনাবলী। কাছে গিয়ে মেঝের উপর বসলে যে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো সান্ত্বনা মিলত তা নয়, বরং তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতাম যে পরীক্ষা দেবার কোনো অধিকারই তৈরি হয়নি আমার। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অর্ধপত্রের জন্য ন্যূনতম পঞ্চাশটি উদ্ধৃতি মুখস্থ রাখতে হবে, অর্থাৎ সবশুদ্ধ আটশো, এ-রকম একটা ভয়ংকর বিধানের কথা জেনে উবে গেল আমার পরীক্ষা দেবার সব সাহস।'

অধ্যাপক দাস তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। যুক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুর বিচার করতেন। ছেঁদো কথা এবং বাঁধা বুলিতে তাঁর আস্থা ছিল না। সাহিত্যের ব্যাখ্যায় দেশ-কাল –মানুষকে গুরুত্ব দিতেন। মৌলিকতা তিনি পছন্দ করতেন। চিন্তায়-ভাবনায় নিজে যেমন মৌলিক ছিলেন, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা-ভাবনার মৌলিকতার ওপর তিনি জোর দিতেন। সহায়ক গ্রন্থ অপেক্ষা মূল গ্রন্থ পাঠের জন্যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতেন। নিয়মিত প্রশ্নোত্তর লিখে দেখাতে বলতেন। তাঁর মত ছিল, এতে লেখার অভ্যেস হয়, চিন্তা-ভাবনা পরিণত ও স্বচ্ছ হয়। প্রশ্নোত্তর সংশোধনে তাঁর অনীহা ছিল না।

শুধু তাই নয়, প্রশ্নোত্তর সংশোধন ও বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। নির্মমও বলা চলে। ছাত্রছাত্রীর মনের মধ্যে সমালোচক–সত্তাকে জাগিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কলেজ পরীক্ষায় তাঁর হাতে ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ছিল রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁর ধারণা ছিল, এতে ছাত্রছাত্রীর মনে দম্ভ জন্মাতে পারে, পড়াশোনার আগ্রহ কমে যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের সবজান্তা ভাবটাকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না। নৈয়ায়িক মন, মুক্তবুদ্ধি ও স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এই অধ্যাপক। ছিলেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণকুশল, গভীর রসবোধ আর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। যথার্থ এক জন দার্শনিকের উপলব্ধি ও প্রচার-সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

কর্মজীবনে বহু বিশিষ্ট সহকর্মী অধ্যাপকের সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি। সকলেই তাঁর পাণ্ডিত্য, মেধা, স্মৃতিশক্তি, রসবোধ, এবং সারল্যে মুগ্ধ হয়েছেন। কালীপদ সেন, জনার্দন চক্রবর্তীর মতো সহকর্মী অধ্যাপকের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। অন্যদিকে দেবীপদ ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী, ভবতোষ দত্তের মতো অনুজ সহকর্মী অধ্যাপকের শ্রদ্ধাভিষিক্ত হয়েছেন।

কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে তাঁর চলে যাওয়া পর অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেনঃ ‘আমি কৃষ্ণনগর কলেজে ১৯৬০ সালে যোগ দিয়েই সহকর্মীদের কাছে একটা শুনেছিলাম। বিভাগীয় রুটিন করবার সময় ক্ষুদিরামবাবু সহকর্মীদের নির্দেশ দিতেন, যেখানে ক্লাস বসাবার অসুবিধে হবে সেখানেই লিখবেন K.D; আর সিলেবাসে নিজেদের পছন্দমত বই নিয়ে যেসব বই পড়ে থাকবে দিয়ে দেবেন K.D. -র নামে। কোনো অসুবিধা নেই আমার।’

বিবাহ ও সন্তানাদি

দুই বিয়ে। প্রথম বিয়ে ১৯৪৪-এ। পত্নী প্রতিভারাণী। ১৯৪৯-এর নভেম্বরে তাঁর অকালমৃত্যু। দ্বিতীয় বিয়ে ১৯৫০-এ। স্ত্রী কাজল। প্রথম পক্ষে ২ কন্যা। দ্বিতীয় পক্ষে ৩ পুত্র ও ৫ কন্যা।

রচনাকর্ম

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতেন। কবিতায় তিনি রোমাণ্টিক। প্রেম সৌন্দর্য তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য। সেকালের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত

হতে দেখা যায়। প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত ১৯৪২ থেকে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রাবন্ধিক হিসাবেই। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-

১। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (১৯৫৩)

প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটির জন্য বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তিনি বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত ১৯৪৯-এর গ্রীষ্মাবকাশে, স্বগ্রাম বেলেতোড়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন কর্মরত। নভেম্বেরে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে গ্রন্থ-রচনায় ছেদ পড়ে। তিনি জানিয়েছেন। ' আমার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দুটো বছর আমি যেন একটা ভিন্ন রাজ্যে ছিলাম। এখানকার সবকিছু প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ....বিচরণ করতাম ভিন্ন জগতে। তারপর যে ভাবেই হোক, সেটা কেটে গেল এবং ওই কেটে যাওয়ার পর আমি দেখলাম যে আমার কাছে সাহিত্যিক বা দার্শনিক কোন তত্ত্বই যেন অবোধ্য নয়, তা যতই কঠিন হোক না কেন।' ১৯৫৩–তে মাস পাঁচেকের মধ্যে গ্রন্থ-রচনার কাজ শেষ হয়। প্রেস-কপি তৈরি করে দেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র শঙ্খ ঘোষ। ১৯৫৩-তে প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন প্রথমা পত্নীকে। গ্রন্থটির জন্য ১৯৬২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক দাস ডি লিট উপাধি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বাংলা থিসিস, যা ডি লিট ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে ডঃ দাস রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ বিকাশ ও পরিণামের ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্র কবিধর্মের বিশেষত্ব হল অন্তর্নিহিত গতিশীলতা। যা বহিরঙ্গ বৈচিত্র নিয়ে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর। স্বাধীন ও মুক্ত মন নিয়ে ডঃ দাস এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। পূর্বসুরি রবীন্দ্র-সমালোচকদের অনেকেরই লেখা তিনি পড়েননি। যেটুকু পড়েছিলেন তার কোনো সংস্কার তাঁকে আক্রমণ করেননি। তাঁর পূর্বসুরি আলোচকেরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন উপনিষদের অনুসারী religious mystic কবি হিসাবে। কিন্তু ডঃ দাস রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটক সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন যে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের এক মহৎ রোমাণ্টিক-মিস্টিক কবি। এ-ব্যাপারে সমালোচক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্য সমালোচনার সাহায্য নিয়েছেন। পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, রসবোধ ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে এ-গ্রন্থে। গ্রন্থটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে।

২ বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি (১৯৫৮)

উৎসর্গঃ বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ। মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় রূপরীতি অথাৎ কলাবিধির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ। গ্রন্থের তিনটি পর্যায়- (ক) প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা- সমালোচনা। তাঁর মতে- 'আমাদের ধারণায় রসবাদ এবং বক্রোক্তিবাদের আংশিক সমন্বয়ে অথবা নব্য পাশ্চাত্ত্য সমালোচনরীতিকে অলংকার ও বক্রোক্তির আলোকে শোধিত ও সম্পূর্ণ করে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব নয়'। (খ) বাংলা কাব্য-কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা। (গ) বাংলা কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত অলংকার সম্পর্কে আলোচনা।

কাব্যশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি কীভাবে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে তা প্রদর্শন। ছন্দ ও অলংকারের সঙ্গে কাব্যসৌন্দর্যের অভিন্নতা নির্দেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৩৮৫ পরিমার্জিত দে'জ প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৪।

৩ চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৯৬৬)

উৎকৃষ্ট কবিতা ও সংগীত সহায়তায় রবীন্দ্র-কবিতা ও গীতির নান্দনিক ব্যাখ্যাদান। কাব্য-সৌন্দর্যের মূল তত্ত্বগুলির সাহায্যে কবিত্ব-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ। রবীন্দ্র-কবিতায় চিত্র ও সংগীতের প্রভাবনির্দেশ। গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য - ' তিনি প্রথম প্রয়োগ করে দেখালেন যে আলঙ্কারিক পদ্ধতি আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বিশেষ করে চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণীতে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকেই এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠক যখন পড়েন তখন কাব্য-রসাস্বাদনে লেখকের সঙ্গে মগ্ন হয় যান- এটা কোনো ভিন্ন পদ্ধতি কিনা সেটা আর তাঁর মনেই আসে না। এতেই বোঝা যায় আধুনিক কাব্যলোচনাতেও এই পদ্ধতি কত স্বাভাবিক হতে পারে। ক্ষুদিরামবাবুর সমালোচনায় এটাই লক্ষ্য করতে হবে যে টোল-চতুস্পঠীর পণ্ডিতরা যেভাবে সংস্কৃত কাব্য পাঠে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন, তিনি সেভাবে করেন নি। পণ্ডিতী সমালোচনা পদে পদে বিশ্বনাথ কবিরাজের বিধান উঁচিয়ে তোলে। ক্ষুদিরামবাবুর সমালোচনা পাঠককে হাত ধরে সৌন্দর্যের নন্দনলোকে পৌঁছে দেয়। তাতে না আছে কৃত্রিমতা, না আছে চেষ্টাজাত ক্লান্তি। এর কারণ আলঙ্কারিক বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে অনন্যপরতন্ত্র ভাবোপলব্ধি।'

সর্বশেষ সংস্করণ- ১৪০১। উৎসর্গ- শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী।

৪ বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (১৯৭২)

উৎসর্গ- পিতৃ-স্মরণে

গ্রন্থটি রচনার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ দাস জানিয়েছেন- ' চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলির সুবিচার করে শ্রীচৈতন্য- জীবনের যে সমস্ত বিশেষ দিক এবং শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি পূর্বের লেখা গ্রন্থগুলিতে তেমন প্রামাণিকভাবে আলোচিত হয় নি, সেগুলিকে আমি গুরুত্ব দিয়েছি। যেমন বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে সূফী-প্রভাব কেউ দেখান নি, অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য ব্যাপার। আমার গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া পূর্বপ্রচলিত অযৌক্তিক কোনও কোনও অভিমতের খণ্ডনও করতে হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহে প্রবল আপত্তি, দ্রুত সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ প্রভৃতিও বোঝাতে হয়েছে। বৈষ্ণবপদগুলির রসপর্যায় বিভাগে যদিও মধ্যযুগের পদ-সংকলন গ্রন্থসমূহে করা হয়েছিল, তবুও একালে ঐ সমস্ত রসপর্যায় নিয়ে কেউ খুঁটিয়ে দেখেন নি। আমি দেখিয়েছি। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নির্ণয়, লৌকিক রসশাস্ত্রের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের পার্থক্য, রবীন্দ্র-ভাবুকতার সঙ্গে বৈষ্ণব-ভাবুকতার পার্থক্যও আলোচনা করতে হয়েছে। বলা যায়, এসব কারণেই আমাকে ঐ গ্রন্থটি লিখতে হয়েছে।'

দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৮৪। তৃতীয় সংস্করণ- ১৯৯৩।

৫ সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৩)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও রচনায় কতখানি সমাজ মনস্ক এ-গ্রন্থে তারই পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। গ্রাম পুনর্গঠনে তাঁর আগ্রহ, সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজনের উন্নয়ন প্রচেষ্টাদি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। লেখকের মতে, রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, যদিও সে-সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক আত্মকল্পনাবিলাসী কবি ছিলেন না, তিনি প্রগতিশীল সমাজ–ভাবনারও অধিকারী ছিলেন তা-ই এ-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৭৮। তৃতীয় সংস্করণ-১৯৯০।

উৎসর্গঃ সন্তোষকুমার বসু, অধ্যাপক বিশ্বভারতী।

৬ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (১৯৭৭)

উৎসর্গ- মাতৃস্মৃতি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের সম্পাদনা। বিশিষ্ট- ১) বহু পুথির সাহায্যে আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ বিশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুতকরণ। ২) সুদীর্ঘ ভূমিকায় মুকুন্দ ভাষাতাত্ত্বিক টীকা রচনা।

কাব্য-অনুসরণে কবির জন্মগ্রাম দামিন্যা থেকে ঘটালের নিকটবর্তী ব্রহ্মাণ্যভূমি বা আরড়া পর্যন্ত পদযাত্রা এবং কবির পলায়নপথের প্রামানিকতা যাচাই। দামিন্যা থেকে আরড়ার ব্যবধান ত্রিশ-চল্লিশ মাইল।

গ্রন্থটি তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত। অধ্যাপক দাসের মতে, মুকুন্দ চক্রবর্তী নিছক মধ্যযুগের এক জন বড়ো কবি নন, সমাজ ঐতিহাসিকও।

প্রথম দে’জ সংস্করণ- ১৯৯৩। দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৯৯।

৭ রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার (১৯৮৪)

গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-কবিতায় পরমাণু বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান ও নভোবিজ্ঞানের গভীর অনুষঙ্গ কীভাবে ও কতখানি সম্পৃক্ত তা প্রদর্শিত। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক ঔপনিষদিক বিশ্বভাবনায় আচ্ছন্ন নন, তাঁর মন ও মনন যে আধুনিক বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ, বিশ্বের সদা পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তিনি যে সচেতন তা প্রমাণ-সহ এ-গ্রন্থে উপস্থাপিত হল।

৮ বানান বানানোর বন্দরে (১৯৯৩)

চারটি পুস্তক-পুস্তিকা সামনে রেখে গ্রন্থকার বাংলা বানান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি হল- ১) বাংলা আকাদেমী থেকে প্রকাশিত- ‘বাংলা বানান সংস্কার- একটি ভিত্তিপত্র’ ২) সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত- ‘বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম’, ৩) আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত – ‘বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন’ এবং ৪) শিশু-সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত-‘হাসতে হাসতে বানান’।

৯ চোদ্দশ’ সাল ও চলমান রবি (১৯৯৪)

নারীকুল-রত্ন অতুলনীয়া বউমা ‘শিখা’র অকালমৃত্যুর বেদনাময় স্মৃতিতে উৎসর্গিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চব্বিশটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি হলঃ রবির চলার কক্ষপথে পালাবদল; রবীন্দ্র-কবিস্বভাব; যে পথে অনন্তলোক; রবীন্দ্র ভাবাদর্শে সমাজ ও স্বরাজ; রবীন্দ্র কাব্যসূত্র; নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ; নিসর্গ থেকে মানুষের দ্বারে; রবীন্দ্র-চিত্তে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া; প্রতিবাদী কবি

রবীন্দ্রনাথ; মানুষের সপক্ষে মহাকবি; কর্ণকুন্তী; মহাভারতে ও রবীন্দ্র-নির্মাণে; একটি কবিতার একক কবি; রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীসমাজ; সংগ্রামী জনজাগরণে কবির ভূমিকা; কবির বিজ্ঞানবরণ; রূপদর্শীর চোখে রবীন্দ্রনাথ; সাময়িক দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-কবিতা; গণচৈতন্যের জাগরণে রবীন্দ্রনাথ; আধুনিক বিজ্ঞানের ধারায় এক মহাকবির যোগদান; রবীন্দ্র-চিত্তে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ; প্রাণবিজ্ঞানে কবির দীক্ষা ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রবর্তন; যাদের করেছ অপমান; বৈদিক পুরুষসুক্তের 'পুরুষ' ও রবীন্দ্র-ধারণার 'নরদেবতা' ব্যাকারণ-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি।

গ্রন্থটির জন্যে অধ্যাপক দাস পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দস্মৃতি পুরস্কার' –এ সম্মানিত হন।

১০ দেশ কাল সাহিত্য (১৯৯৫)

উৎসর্গ- শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

পঁচিশটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধক্রম; কাল-প্রবাহে হিন্দু-মুসলমান; রাজনীতি, সমাজ ও শ্রীচৈতন্য; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ; বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার কথা; চৈতন্যাবির্ভাবে ও রবীন্দ্রাবির্ভাবে যুগধর্মপ্রসঙ্গ; সমাজ-সাহিত্যের সন্ধানে; কবিকঙ্কণের গ্রামত্যাগের কারণ ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল; বাঙলা ভাষায় সাঁওতালী উপাদান; গৃহদাহের স্মৃতি; ধারাবাহিক সমাজ ও শরৎচন্দ্র; কবি টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; মার্জিত দর্পণে আমাদের উনিশ শতক; আনন্দমঠের স্থপতির উদ্দেশ্য; বাঙলা ছন্দ, সুনীতিকুমার ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ; অথ সুকান্ত-কথা; সুকান্তের কাব্যশিল্প; উপন্যাস না ভূমিসংলগ্ন জীবনের উল্লেখ্য একটি দলিল; রসশাস্ত্র-বৈষ্ণব ও লৌকিক; লৌকিক বাঙলার সমর্থক বিদ্যাসাগর; কবিকঙ্কণের কাব্যের পাঠভেদ-চিন্তা; পলাতক কবির সন্ধানে; গাথাকাব্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা; রবীন্দ্রের গ্রাম-স্বরাজ ও বর্তমান পঞ্চায়েতি।

১১ সাঁওতালিবাংলা সমশব্দ অভিধান (১৯৯৮)

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নির্বাচিত সাঁওতালি শব্দের অভিধান। বাংলা ভাষায় এ ধরনের কাজ প্রথম।

১২ বাছাই প্রবন্ধ (২০০০)

উৎসর্গ- আমার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে চোদ্দোটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধক্রম- রাজা-প্রজা পরিস্থিতি-প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের বাঙলায়; কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ; মহাপ্রভুর বাউল-ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রীতি সংগতি; দেবমানব শ্রীচৈতন্য; শ্যামাসংগীত ও রামপ্রসাদ; শহর কলকাতায় আরবী-ফারসী উরদু-সংস্কৃত; বঙ্কিম-মনোধর্মের পটভূমিতে সীতারাম; বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সম্পর্ক; রবীন্দ্র পরিচায়িকা; রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য; অথ বিবেকানন্দ রবীন্দ্র-কথা; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিকৃতি; কবি টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; কথাকার মানিকের ইতিকথা।

১৩ প্রচলিত বাংলা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক অভিধান প্রকাশিতব্য।

এ ছাড়া ছাত্রপাঠ্য একাধিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। যেমন- বাঙলা সাহিত্যের আদ্য-মধ্য (১৯৮৬) এবং ব্যাকরণ (তিন খণ্ড)।

পাণ্ডিত্য

অধ্যাপক দাস ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এক কথায়, সর্বমান্য পণ্ডিত। ইংরাজি-বাংলা-সংস্কৃতে সমান স্বচ্ছন্ন। কী ভাষায়, কী সাহিত্যে ঈর্ষণীয় অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের কবিতা যে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন, তা রবীন্দ্র-কবিতায় আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। শেকসপিয়র পাঠের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচার-বিশ্লেষণে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিপ্রকৃতির কবিতার স্বরূপ নির্ধারণে তাঁর হার্ডি-মনস্কতার পরিচয় পাই। আবার আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচনাতত্ত্বের কিংবা বিজ্ঞানচিন্তার অথবা দর্শনের সঙ্গে তিনি যে পরিচিত ছিলেন তারও প্রমাণ তাঁর আলোচনাদি। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-পাঠে তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা অতুলীয়। আধুনিক সাহিত্যবিচারে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা এবং উপযোগিতা সম্পর্কেও তাঁর প্রত্যয় ছিল সুদৃঢ়। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতি-মাঘ- জয়দেব প্রমুখ কবির মূল রচনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রবন্ধটি ওই কাব্য সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয়বাহী। বৈষ্ণব তত্ত্ব, দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (১৯৭২)গ্রন্থ। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল সম্পাদনায় (১৯৭৬) মঙ্গলকাব্য, বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় প্রমাণ লভ্য। মৈমনসিংহ-গীতিকা কিংবা রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত বিষয়েও

তিনি নতুন কথা শুনিয়েছেন। বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (১৯৫৮) গ্রন্থে অনাধুনিক ও আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতার রূপরীতির আলোচনায় তাঁর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার যে-পরিচয় পাই তা বিস্ময়কর। বঙ্কিম-সাহিত্য-সমীক্ষাও মৌলিকতার নিদর্শন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর মনস্বিতা ও স্বতন্ত্রতা সর্বজনস্বীকৃত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্যতম এক জন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ তিনি। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, অলংকার এসমস্ত বিষয়েও তাঁর পারদর্শিতা চোখে পড়ে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনায় ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু সময়াভাবে হয়ে ওঠেনি। ভাষাতত্ত্বে জ্ঞান ছিল গভীর ও ব্যাপক। ভাষাতত্ত্ববিদ রূপে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন। সুনীতিকুমার তাঁর এই ছাত্রটিকে ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের জন্যে বিশেষ স্নেহ করতেন। ছন্দ-অলংকারে নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি গ্রন্থে। একাধিক অভিধান রচনাতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একটি প্রচলিত বাংলা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক অভিধান। অন্যটি সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফসল। তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই অভিধাটির জন্যেও ভাবীকাল তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ছন্দ-অলংকার-ব্যাকরণ-ভাষাতত্ত্বে-অভিধান-সাহিত্য অধ্যাপক দাসের অধিকারের এলাকাটি বিস্তৃত। কিন্তু তাই সব নয়। ইতিহাস-দর্শন-সমাজবিদ্যা ও বিজ্ঞানের পাঠও নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ভাবনায় ও রচনায় তার ছাপ সুস্পষ্ট। যথার্থই এক জন বড়ো মাপের পণ্ডিত ছিলেন তিনি। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।

সম্মাননা

বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ গ্রন্থের জন্যে পেয়েছেন ‘প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার’ (১৯৭৩)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ১৯৮৪-তে ‘বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার’ এবং ১৯৯৪-এ ‘রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার’ দিয়ে সম্মান জানান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮-তে পান ‘সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক’ আর ১৯৯৫ সালে পান নারায়ণ গাঙ্গুলী স্মারক পুরস্কার। ১৯৯৮ সালে পান সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত ‘রবির্তিথংকর’ উপাধি। ১৯৮৭ সালে পান হওড়া পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত ‘সাহিত্যরত্ন’ উপাধি। ১৯৯১ সালে কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত ‘রবীন্দ্রতত্ত্বচার্য’ উপাধি।

একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সদস্য ছিলেন। সদস্য ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, রবীন্দ্র-রচনাবলি সম্পাদনা সমিতির, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটির। সভাপতি ছিলেন বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের, বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি প্রসার সমিতির, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি পরিষদের।

অধ্যাপক দাসের আশি বছর পূর্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এ-উপলক্ষে প্রকাশিত হয় একটি সংবর্ধনা গ্রন্থ- পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস (জানুয়ারী ১৯৯৬)। তাতে অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, অরুণকুমার বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিশির কুমার দাশ, সুধীর চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, ভারতী দাস (বাগচী) প্রমুখের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। সংবর্ধনা গ্রন্থের উদ্‌বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু।

মানবিকতা

প্রবাদপ্রতিম তাঁর পাণ্ডিত্য। কিন্তু মানবিকতাবোধেও তিনি উজ্জ্বল ছিলেন। ‘পাণ্ডিত্য ও মনুষ্যত্বের মধ্যে কোন্‌টি আপনার মতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও কাম্য’- এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেনঃ ‘পাণ্ডিত্যের চেয়ে মনুষ্যত্বেই অধিকতর গৌরবের ও কাম্যতর। পাণ্ডিত্য দুর্লভ, কিন্তু মনুষত্ব সুদুর্লভ। পাণ্ডিত্য অর্জিত হতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্থাৎ স্নেহ, প্রীতি, দয়া, আদর্শ-ভাবনা, মানুষে মানুষে সমদৃষ্টি এসব স্বভাবের সঙ্গে গাঁথা, জন্মসূত্রে পাওয়া গুণ।’

তাঁর আত্মজা ভারতী দাস(বাগচী) স্মৃতিচারণায় এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে অধ্যাপক দাসের উদার মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দু একটি এ-স্থলে উদ্ধার করা যেতে পারেঃ

১ একবার এক যুবক দুপুরবেলায় এল তার কাছে টাকা সাহায্য চাইতে। দুঃখের বিষয় হাতে টাকা ছিল না। স্ত্রীর কাছে জানতে চাইল ‘চাল-টাল’ আছে কিনা। মাসের শেষের দিক- ১৫ কিলো মত চাল বাড়ীতে ছিল। ক্ষুদিরাম বেশ খানিকটা ঐ লোকটিকে দিতে বলল। এমন সময় ছেলেমেয়েরা তাকে জানাল, যুবকটি

চোর এবং জেলখানা থেকে সদ্যমুক্ত, অতএব তাকে সাহায্য না করাই উচিত। ক্ষুদিরাম তা না শুনে উত্তর দিয়েছে- এজন্যেই তার আরও সাহায্যের প্রয়োজন। সাহায্য পেলে হয়ত সে চুরি করা ছেড়ে দেবে। না হলে অনন্যোপায় হয়ে তাকে আবার চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে। এই হৃদয়বত্তা এবং দার্শনিক চিন্তা ব্যক্তিগত জীবনে আর কার আছে জানি না।

২ একবার একজন মজুর বাগানের কাজ করতে এসেছিল। তার নিজস্ব দা বা 'কাটারি' ছিল না। দিনের শেষে মজুরির সঙ্গে ক্ষুদিরাম দাটিও তাকে দিয়ে দিল।

প্রয়াণ

২০০২ এর ২৮ এপ্রিল রবিবার রাত্রে কৃষ্ণনগরের একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ আগেও তিনি কাগজ-কলম চেয়েছিলেন। কী লিখতে চেয়েছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

২৯ এপ্রিল লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। ১০ মে তাঁর বাসভবনে একটি স্মরণসভায় কৃষ্ণনগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১১ মে কৃষ্ণনগরের নদীয়া জেলা গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ২৬ মে বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আহূত একটি স্মরণসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হয়। ২৭ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের উদ্যোগে কলকাতার অবনীন্দ্র সভাগৃহে যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং স্মৃতিচারণ করেন সর্বশ্রী বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস, অরুণকুমার বসু, পবিত্র সরকার, আবিরলাল মুখোপাধ্যায় ও মানস মজুমদার। ৬ জুন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণ করেন শ্রী জ্যোতিভূষণ চাকী ও শ্রীমোহিত রায়। অধ্যাপক দাসের রচনাকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীমানস মজুমদার। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসকে নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮ জুন পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে যে- স্মরণসভায় আয়োজন হয় তাতে বহু বিশিষ্ট বক্তা অধ্যাপক দাসের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন।

এসমস্ত অনুষ্ঠান থেকে সারস্বত সমাজে ডঃ দাসের বিপুল প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জীবনের উপান্তে পৌঁছে তিনি জীবন থেকে ছুটি চেয়েছিলেন। মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, জীবনের সমস্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। না, মৃত্যুর জন্যে তাঁর কোনো খেদ ছিল না। বরং প্রসন্ন প্রতীক্ষা ছিল।

উল্লেখপঞ্জি- পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস।

(আকাদেমি পত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, মে ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

ডঃ দাসের অধীনে যারা গবেষণা করেছেন

ডঃ নমিতা মণ্ডল

ডঃ অমরেন্দ্র গণাই

ডঃ পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী

ডঃ মুসা কালিম

অভিজ্ঞতার আলোকে ডক্টর ক্ষুদিরাম দাসের জীবনকথা

ডঃ নমিতা মণ্ডল

১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' প্রাপ্ত লেখক ডক্টর ক্ষুদিরাম দাসের (এম এ, গোল্ড মেডালিষ্ট, ডি লিট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাব্যতীর্থ) কথা লিখতে গিয়ে প্রশ্ন জাগছে- ছোটখাট চেহারার এই 'পণ্ডিত মানুষটিকে' আমরা বেশী শ্রদ্ধা করি, না 'মানবদরদী মানুষটিকে' আমরা বেশী ভালবাসি। তাঁর অসাধারণ মণীষা আমাদের চমৎকৃত করে, না তাঁর চরিত্র মাধুর্য্য আমাদের মুগ্ধ করে?

ইং ১৯১৬ সালের ৯ই অক্টোবর, বাংলা ১৩২৩ সনের ২৩ শে আশ্বিন সোমবার কোজাগরী পুর্ণিমার দিন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে বাঁকুড়া জেলাস্থিত বেলিয়াতোড় গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্ষুদিরামের জন্ম। পিতা সতীশচন্দ্র দাস। মাতা কামিনীবালা। পিতামাতার জ্যেষ্ট পুত্র ক্ষুদিরাম।

বালক ক্ষুদিরামের লেখাপড়ার প্রথম শুরু বাবার কাছে। তারপর ১৯২৩ সালে ঠাকুমার হাত ধরে ফুলম্পাড় ধুতি পরে বগলে বই ও শ্লেট নিয়ে ভত্তি হ'ন বেলিয়াতোড় মধ্য ইংরাজী স্কুলে। স্কুলের বারান্দার রোদে বসে হাতের লেখা শেষ করে অশ্বত্থপাতার ড্রইং আঁকার প্রথম অভিজ্ঞতা সমগ্র জীবনের এক মধুর স্মৃতি। হেডমাস্টার ছিলেন স্মরণীয় চরিত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল। সেকেণ্ড মাস্টার

ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ শ্রীকপর্দীশ্বর রায়। সেকেণ্ড মাস্টারের কথা উল্লেখ করার কারণ, বর্ত্তমানে ভাষাসাহিত্যে পণ্ডিত, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ক্ষুদিরাম দাসের বাংলা ভাষার প্রতি প্রথম ভালবাসা জন্মিয়েছিলেন তিনিই। তিনিই প্রথম 'ক্ষুদে' ছাত্র ক্ষুদিরামকে বাংলা ভাষার অমৃতের স্বাদ দিয়েছিলেন তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরের স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ উচ্চারণে মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর সভায় অর্জুনের অগ্রসর হওয়ার সেই অপূর্ব বর্ণনাটি শুনিয়ে-

' দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।

ভাষা শুনতে যে এত ভাল লাগে তা তিনি ৬/৭ বছর বয়সেই সেকেণ্ড মাস্টারের মুখে শুনেছিলেন। সেদিন তাঁর সামনে ভাষা যেন সৌন্দর্যের মুক্তি ধরে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রথম মুগ্ধতার সে ঘোর আজকের অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৭০ বছর অতি্ক্রম করেও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

বালকের বয়স যখন ৯/১০ বছর তখন একদিন বেলিয়াতোড় গ্রামেরই এক টোলে এক বহিরাগত পণ্ডিতের মুখে সংস্কৃত বক্তৃতা শুনে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সে বয়সে সংস্কৃত বক্তৃতার কোন অর্থই তিনি বোঝেন নি- তবু একটা আকর্ষণ-শব্দের একটা মোহময়তা, কিংবা ধ্বনি মাধুর্যের ঝংকার, নয়ত মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিই বুঝি তাঁকে তখন থেকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হয়ত এসব কারণেই তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীর সংস্কৃত গীতাটা বের করে ভুল উচ্চারণ সহ উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে সকলকে শোনাতে চাইতেন। এরই ফাঁকে ছাত্রবৃত্তিতে পাওয়া 'সীতার বনবাস' বইটি পড়ে তিনি যেন বাংলা ভাষার অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান করতে চাইতেন। পাশাপাশি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল 'দাশুরায়ের পাঁচালি' এবং বাবার সংগৃহীত 'মতি রায়ের' যাত্রার কয়েকখানা বই। লোক সাহিত্যের প্রতি প্রীতির সেই হ'ল সূচনা। তাই ভাবতে অবাক লাগে, আজকের পণ্ডিত ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস পাণ্ডিত্যের শাণিত বানে বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক অভিধান ও কোষগ্রন্থ, রচনার ক্ষেত্রে যে মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা ভাবনার স্বাক্ষর রাখছেন তার মূল বুঝি রোপিত হয়েছিল সেই ৬০ বছর আগে একটি গ্রাম্যবালকের গ্রাম্যসাহিত্যের অনুরাগে।

এখনকার যুগ কঠোর বাস্তবমুখী। এ-যুগে গোপনীয়তা বলতে কিছুই নেই। ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রাম্য বা অশোভন ভাষা নিয়েও গবেষণা চলছে। কিন্তু তখনকার কালে তা ছিল না; ফলে মতি রায়ের যাত্রা বইয়ের রঙ্গরস

মেশানো অদ্‌ভুত গ্রাম্যভাষাগুলি তিনি যখন তাঁর মায়ের কাছে পড়ে শোনাতে চাইতেন তখন উৎসাহের পরিবর্ত্তে চপেটাঘাত লাভ করতেন। এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াই বুঝি বালককে বুঝিয়েছিল যে, শিক্ষা কেবল স্কুলগত শিক্ষা নয়। বাইরে যা দেখছি যা শুনছি তাতেও অনায়াস শিক্ষা করা যায়। যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা-কবিগান লোক-সংস্কৃতির এইসব উপকরণই তো শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। লোক-সংস্কৃতির প্রতি এই অকৃত্রিমবশতঃ তিনি বাঁকুড়া লোক-সংস্কৃতি পরিষদ ও পরিষদ সম্পাদকদের সঙ্গে এত গভীরভাবে যুক্ত।

স্মৃতি সতত সুখের। বিশেষতঃ সে স্মৃতি যদি হয় বাল্যস্মৃতি। গবেষণা কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মুখে শোনা এমনি কয়েকটি বাল্যস্মৃতি জন্মভূমি বেলেতোড় গাঁয়ের বনঢলের গায়ে খামার ও দীর্ঘ বৈঠকখানা। বাড়ীটা আজও তেমনি আছে কি-না জানি না। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর দুটো-বছর সেটাই ছিল পড়ুয়া ক্ষুদিরামদের পড়াশুনা কাম হৈ হৈ করবার একটা মস্ত আখড়া। 'লারনিং উইথ প্লেজের' যদি শিশু শিক্ষার মৌল নীতি হয়, তাহলে ওখানকার পরিবেশ সত্যিই তার সহায়ক হয়েছিল। কাঠের খুঁটি ও খড়ের চালার সেই লম্বা 'সান' বাঁধানো বারান্দা তারই একপাশে মাদুর বিছানো; তাতে পাশবালিশ নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বাতের রোগী 'রাম' দা। অত্যন্ত আমুদে ও শিশুপ্রিয় রসিক মানুষ। বৈঠকখানা আসরের প্রধান ব্যক্তি সেই সদা হাস্যময় রামদার কাছে ক্ষুদিরাম, নটবর, সারদা ও দুই অনঙ্গ এই পাঁচজন প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর হ্যারিকেনের আলোয় গোল হয়ে বসে পড়াশুনা করতেন। তবে বেশির ভাগ সময় ব্যয় হত পারস্পরিক 'খুনসুটি' করে। যেমন হ্যারিকনের ফুটোর পেন্সিলের ডগা ঢুকিয়ে তাই দিয়ে মনযোগী নটবরের উরুতে ছেঁকা দেওয়া ... ইত্যাদি। রামদা এসব খুব উপভোগ করতেন, আর মাঝে মাঝে বালক ক্ষুদিরামকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, এ্যাই, ক্ষুদে, সেই পা চাটা কুকুরটা কেমন করে হাঁটে দেখা তো'।

এখনকার সংস্কারমুক্ত ক্ষুদিরামের ছেলেবেলায় বিশ্বাস ছিল যে বটের পাতার তেল, সিঁদুর মাখিয়ে তাতে গিরগিটির মাংস ও শকুনের ডিম রেখে সূর্য্যের দিকে মুখ করে যা চাওয়া যাবে তাই পাওয়া যাবে। এই ধারণায় বশবর্ত্তী হয়ে একদিন সকলে বটপাতায় তেল সিঁদুর লাগিয়ে কেঁক্‌লাস মেরে তার মাংস দিয়ে সূর্য্যের দিকে মুখ করতে গিয়ে মনে হ'ল শকুনের ডিম? সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছুটল শুঁড়ি পুকুরের শিমুলগাছ লক্ষ্য করে। সে গাছে অনেক শকুনের বাসা বাউরিদের ছেলেকে ২/১ টা পয়সা দিলে নিশ্চয় শকুনের ডিম পেড়ে দেবেই-তারপর যা

ইচ্ছে চাইলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা গেল ডিম সংগ্রহ করা যত সহজ মনে হয়েছিল তা হ'ল না। গাছে উঠে, ঢিল ছুঁড়ে, চিৎকার করে গাছ থেকে শকুনদের তাড়ানো গেল ঠিকই, কিন্তু শকুনের বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছে ডিম আনা গেল না কোন মতেই। এদিকে বেলা একটা বেজে গেছে অগত্যা কেঁক্‌লাসের থেঁতো করা দেহ সহ তেল সিদুঁর মাখানো বটপাতা শুঁড়িপুকুরে বিসর্জন দিয়ে বিষণ্ন মনে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

এভাবেই সুখে-দুঃখে, নদী-গাছ-পুকুর-জঙ্গল-মাঠ প্রভৃতির মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে পাড়া প্রতিবেশীদের নালিশ শুনে, মাস্টারমশাইদের স্নেহ কুড়িয়ে ক্ষুদিরাম দাসের জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছিল স্বগ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুলের শেষ সোপানে। এরপর তাঁকে আসতে হয়েছিল গ্রাম ছেড়ে শহরে। শহর বাঁকুড়ায়। আর তখন থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর ক্ষত-বিক্ষত জীবন-সংগ্রাম- দারিদ্রের সঙ্গে সাহিত্য চর্চা ও আদর্শ রক্ষার আপোসহীন রক্তাক্ত অধ্যায়।

১৯২৯ সাল। বয়স ১২ বছর। বাঁকুড়া শহরে প্রথম এলেন বালক ক্ষুদিরাম 'বড় স্কুলে' পড়তে। সেই ষাট বছর আগেকার বাঁকুড়া। খুঁটির উপর কেরোসিনের চারকোনা আলো, খড়ের চালা। টানা রিক্‌শায় ঘামঝরা কঙ্কাল। বড় রাস্তায় গরুর গাড়ীর ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ আওয়াজ। সেই সঙ্গে শাঁখারি পাড়া, পোদ্দার পাড়া, ঘটকগলি ইত্যাদি গলিঘিঞ্জিতে বালিকা কণ্ঠের তুষু গান, ভাদু গান ইত্যাদি। বাঁকুড়ার এই গ্রামচিত্রের পাশাপাশি বৃটিশ প্রশাসনের স্থায়ী ঘাঁটি পাড়ার স্মারক হিসাবে কোর্ট, কাছারি, থানা, জিলা-স্কুল ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। জঙ্গলমহলের সবচেয়ে কাছের শহর বলেই আজ থেকেই ১৫০ বছর আগেই বৃটিশরা এ অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে। তার কিছুদিন পরে এসেছে অয়েশলিয়ান মিশনারিরা। প্রথমে তারা স্কুল খুঁলেছেন, পরে কলেজ, কুণ্ঠাশ্রম, চার্চ্চ, সেবাশ্রম ইত্যাদি।

গ্রাম-শহরে মাখামাখি বাঁকুড়ার জেলা স্কুলে চার বছর কাটানোর পর ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সমস্ত শিক্ষকদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে উত্তীর্ণ হলেন প্রথম বিভাগে- বাংলা ও সংস্কৃতে লেটার সহ। স্কুল জীবনে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় শিক্ষক হলেন পান্নালাল সেনগুপ্ত। বস্তুত তিনিই তাঁর জীবনের উপযুক্ত 'মেক-আপ-ম্যান'।

এবার তিনি এলেন স্কুল থেকে কলেজে। জেলা স্কুল ও ক্রীশ্চান কলেজ প্রায় সামনাসামনি, তাই স্কুলে পড়াকালীন কলেজের গ্যালারিগুলোর দিকে চেয়ে

চেয়ে তিনি ভাবতেন ওখানে কি তিনি ভাবতেন ওখানে কি তিনি কোনদিন পড়তে পারবেন? প্রধান অন্তরায় অর্থ। হঠাৎ পড়বার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। ছাত্রদরদী মহাপ্রাণ ব্রাউন সাহেব তাঁকে কলেজে বিনা বেতনে পড়বার এমনকি হোস্টেলে বিনা খরচে খাওয়ার অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সে সময় এই ব্রাউন সাহেব ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। প্রাণভত্তি স্ফুত্তি নিয়ে সংস্কৃতে অনার্স সহ তিনি ভর্ত্তি হলেন ক্রীশ্চান কলেজে। সালটা-১৯৩৩। খুব সম্ভব ঐ ১৯৩৩ সালেই বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজ সহশিক্ষা চালু হয়। আর ১৯৩৫ থেকে কলেজ 'ক্লাসিক্যাল বাঙলা' পড়ানো শুরু হয়। পড়াশুনা ও খাওয়ার অনিশ্চয়তা দূর হলেও থাকার একটা সমস্যা রয়ে গেল। প্রতিদিন তো বেলেতোড় থেকে যাতায়াত করা যায় না, কারণ তখন যাতাযাত ব্যবস্থা ছিল হাঁটা কিংবা সাইকেলে। সৌভাগ্যবশতঃ সে সমস্যারও সমাধান হল স্কুলডাঙ্গাবাসী স্বগীয় কবিরাজ রামব্রহ্ম সেনের ভেষজ উদ্যানবাটীতে থাকবার আমন্ত্রণে। কবিরাজ বংশধর রামব্রহ্ম সেন ও তাঁর ভাই এবং দুই বোদির গভীর স্নেহের মধ্য দিয়ে কেটেছিল কলেজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চারটে বছর। সংসারের চাহিদা যতই বাড়ুক, দারিদ্র্যের কশাঘাত যতই তীব্র হোক; কলেজ জীবনের মধুময় চারটে বছর ও কবিরাজ বাড়ীর অকৃত্রিম আনুকূল্য তাঁকে যেন কানায় কানায় ভরিয়ে রেখেছিল।

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' মন্ত্রটি সব যুগে, সবকালে ছাত্ররা শুনে আসছে; কিন্তু ঐ ছাত্রজীবনের সময়টাতেই সব ছাত্রই চায় একটু বন্ধুত্ব একটু আড্ডাবাজি। ক্ষুদিরাম দাসও ছিলেন দারুণ আড্ডাবাজ। একে তো পড়ার সব বই তাঁর ছিল না, তার উপর সকাল সন্ধ্যায় নিয়ম মত আড্ডা দেওয়াতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই দেখে অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ মহাশয় একদিন ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'পরীক্ষায় এক দাঁড়ি না হলে কলকাতায় পড়বে কি করে'? সে ভর্ৎসনা স্নেহের রূপ ধরে আড্ডাবাজ ক্ষুদিরামকে দ্রবীভূত করেছিল বলেই কলেজ শেষের বি এ অনার্স পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল সেই 'এক দাঁড়ি' তিনি পেয়েছেন। অর্থাৎ সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে তিনি প্রথম বিভাগে বি এ পাশ করেছেন। গর্বে ভরে উঠেছিল অধ্যাপক রামশরণবাবুর বুক। খুশী হয়েছিলেন ব্রাউন সাহেব। আর যুবক ক্ষুদিরাম তখন নিজ কৃতিত্বে গর্বিত না হয়ে বরং আরও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি এসে উঠলেন তাঁর আকাঙ্খিত কল্পরাজ্য কলিকাতায়।

১৯৩৭ সাল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জলের মাছকে ডাঙ্গায় ছেড়ে দিলে যেরকম আবস্থা হয়' – ক্ষুদিরামের অবস্থাও হ'ল সেরকম। চেহারা ও পোষাকে গ্রামীন হলেও পাণ্ডিত্য ও মণীষার সফিস্টিকেট সার্টিফিকেটের জোরেই তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় এম এ পড়তে শুরু করলেন। বেড়ে চললো জ্ঞানস্পৃহা।

এদিকে সংসার যেন চলতে চায় না। বড় ছেলে উপযুক্ত হয়েছে, সংসারের সুরাহা তো তাকেই করতে হবে-এটাই নিয়ম। অথচ এম এ পরীক্ষার দু'টো বছরই বাকী। ভাগ্যের সঙ্গে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। এল পরীক্ষার সময়। বকেয়া পাওনা ও পরীক্ষার ফি জমা দেবার জন্য বিক্রী করতে হ'ল অন্নপ্রাশনের পাওয়া সোনার তক্তি ও আংটি। তবু তিনি দমলেন না। বীর চিত্তে পরীক্ষায় বসলেন। সালটা ১৯৩৯। ফলাফলে দেখা গেল মানসিক ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়ার গৌরব তিনি লাভ করেছেন। ৭২.৬% নম্বর পেয়ে ছিনিয়ে নিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণকমল। সুতীক্ষ মেধা, অটুট প্রাণশক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনের কাছে হার মানল দারিদ্রের কশাঘাত ও বিরুদ্ধ মন্তব্যকারীরা।

এবার চলল জীবিকার অনুসন্ধান। ফাঁকতালে পড়ে ফেললেন বি টি। ১৯৪১ সালে পেয়ে গেলেন স্কুল সাবইন্সপেক্টরের কাজ। সেই ১৯৪১ থেকে আজও তিনি ঘুরছেন বিভিন্ন কর্মের চাকায়। কর্মবৈচিত্রের বহু ধারায় অভিসিক্ত হয়ে তিনি ক্লান্ত নন বরং বড় বেশী আনন্দিত। ১৯৪৩ সাল তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এবছরে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে কয়েক মাসের জন্য সিটি কলেজ ও উইমেনস্ কলেজও কাজ করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হয়ে আসেন ১৯৭৫ সালে। একটানা কাজ করেন ১০ বছর। মাঝে মাস দেড়েকের জন্য কোচবিহার বি এন শীল কলেজেও শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৫ সালে এসে যোগ দেন কৃষ্ণনগর গভরমেণ্ট কলেজে। এ সময়েই তিনি কৃষ্ণনগরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে বছর কয়েক কাজ করার পর তিনি আসেন মৌলানা আজাদ কলেজে ১৯৫৯ সালে। কাজ করেন ১৯৭৩ সাল পর্য্যন্ত। তারপর আবার পালা বদল। আসেন হুগলী মহসীন কলেজে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। থাকেন মাত্র ছ' মাস। এবার তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল। বিরুদ্ধপক্ষের শাণিত প্রশ্নবান, বহু তর্ক-বিতর্ক, উপহাস ও অবিচারকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি নির্বাচিত হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। এই চেয়ারের গৌরব

অর্জন করে তিনি যেমন যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জীবনে জয়লাভের আনন্দ পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমান তালে আদর্শ ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় বিশৃঙ্খলার সুষম সামঞ্জস্য করবার জন্য লড়তে হয়েছিল। সর্বাংশে সফল হয়ত হন নি, কিন্তু অন্যায় আর অসত্যের কাছে মাথা নত করেন নি।

এখনকার কাল সংস্কারমুক্ত । বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে নিশ্চয় কোন শিক্ষিতমণ্ডলী জাত-পাতের প্রশ্ন তুলে কাউকে আধাত করার মতো হীনমন্যতা প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে এরকম এক হীন চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছিল একাধিকবার। জীবনের প্রথম পদক্ষেপে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রধান বেলেতোড় গ্রামের মধ্য ইংরাজী স্কুলে পড়ার সময় অব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য উপেক্ষা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। আবার পরিণত বয়সে কর্মজীবনের সকল অধ্যায় ১৯৭৩ সালে বিশিষ্ট বিদ্বদ্‌মণ্ডলীর দ্বারা সেই জাত-পাতের আঘাত নূতন করে যন্ত্রণা দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার কৌলিন্য ক্ষুদিরাম বাবুর সে যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত করেছিল।

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মর্যাদাপূর্ণ রামতনু লাহিড়ী চেয়ারে আসীনকালে তিনি ১৯৮১ অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন ভাষায় তুলনামূলক অভিধান ও কোষগ্রন্থ প্রণয়ণের কাজে নিমগ্ন। এ কাজ যে কত কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য এবং এ কাজের জন্য যে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন তা তাঁর আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিভিন্ন অসুবিধাকে উপেক্ষা করে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি কক্ষে মাত্র দু'জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে অনাড়ম্বরভাবে করে চলেছেন এক মহৎ সাধনা।

ভাষাতাত্ত্বিক ক্ষুদিরাম দাস প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসাধক ও রবীন্দ্রকাব্যের একজন মর্মজ্ঞ। রবীন্দ্রপ্রতিভা ও কাব্যগীতি বিষয়কে নিয়ে এ পর্য্যন্ত তিনি চারখানা পূর্ণঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থটি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর। এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্ব এবং অভিনবত্বের জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় ডি-লিট প্রাপ্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। সম্প্রতি বইটি প্রকাশক ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

‘পাঁকে পদ্ম ফোটে’ –প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যা নয়। প্রমাণ ক্ষুদিরাম বাবু। কারণ রবীন্দ্র প্রতিভা রচনায় তিনি তাঁর প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছেন তা তথাকথিত আড়ম্বরপূর্ণ কোলকাতার ‘সফিসটিকেট লাইফে’ নয়, বরং প্রিয় জন্মভূমি বেলেতোড় গ্রামের মাটীর কোঠাবাড়ী ও পূবমূখী জানালায় ধারে বসে একাগ্রচিত্তে রবীন্দ্রসাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখে প্রস্ফুটিত করেছেন রবীন্দ্র প্রতিভার শতদল। গ্রামীন হলেও রবীন্দ্র প্রতিভা স্পর্শ করা যে সম্ভব হতে পারে গ্রন্থখানি পাঠ করলেই তা উপলব্ধি করা যাবে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি’। প্রকাশকাল ১৯৫৮। প্রকাশক ওরিয়েন্ট বুক কোং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই গ্রন্থখানি মধ্য ও আধুনিক যুগের কাব্য সাহিত্যের এক অমূল্য আকর গ্রন্থ। এতে তিনি বাংলা পদ্যরীতিকে ‘বক্রোক্তি’র কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থাপিত করে সুললিত সমালোচনার মাধ্যমে বৈষ্ণব কাব্যরসের বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তিনি সৌন্দর্যকে এক বিশেষ রীতিতে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের রূপ ও রীতিতে অলঙ্কার ও ছন্দশাস্ত্রের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা তিনি সমালোচনামূলক ব্যাখ্যার সংযোজনে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয় গ্রন্থ ‘চিত্র গীতিময়ী রবীন্দ্র বাণী’। প্রকাশকাল ১৯৬৬। প্রকাশক- বইপাড়া; কলেজ রো; কলিকাতা। গ্রন্থখানিতে লেখক রবীন্দ্রভাবনায় স্বর্গীয় চেতনার এক উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রকাশ করে রবীন্দ্র প্রতিভার অত্যুজ্বল দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। পাঠককে সাহায্য করেছেন চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণীর মূল্য নির্দ্ধারণ করতে।

চতুর্থ গ্রন্থ ‘বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ’। প্রকাশকাল ১৯৭০। প্রকাশক- বইপাড়া; কলেজ রো; কলিকাতা। মধ্যযুগীয় বিশেষতঃ চৈতন্যযুগের কাব্য, সমাজ ও সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থখানি এক মূল্যবান দলিল। গ্রন্থটি ৭টি অধ্যায় বিভক্ত। বিষয় বৈচিত্র ও জ্ঞানগভীরতার সম্ভার বিশিষ্ট গ্রন্থখানি যে সাহিত্যরসিক পাঠক মাত্রেরই ভাল লেগেছে তার প্রমাণ গ্রন্থটির অসাধারণ সংস্কারণাধিক্য।

পঞ্চম গ্রন্থ-সমাজঃ প্রগতিঃ ও রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশকাল- ১৯৭৮। প্রকাশক- উ এন ধর অ্যাণ্ড কোং; কলিকাতা। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথের এক বিশাল প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সময়কার গ্রামীন ব্যবস্থা, গ্রামীন সমস্যা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও অসহায় মানুষের বিশেষতঃ হিন্দু-

মুসলমান সম্প্রদায় এবং অনুন্নত শ্রেণী সমাজের নিজস্ব ক্ষমতা, শাসননীতি, গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎ পদ্ধতির গুরুত্বের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজসংস্কারক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি রচনা করে লেখক তাঁর গদ্য সাহিত্য রচনায় বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন।

ষষ্ঠ গ্রন্থ- 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'। প্রকাশকাল-১৯৭৬। প্রকাশক বি চন্দ্র এণ্ড সন্স; পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দের আবির্ভাবকালীন বাংলাদেশের সমাজস্থিতির জরীপ কার্যের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, মানসিংহের সুবাদারির প্রারম্ভে পলাতক হয়ে কবি কোন পথ ধরে কী অবস্থায় বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে আশ্রয় সন্ধান করেছিলেন এবং শেষ কালে জমিদার বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল যে লেখককবির যাত্রাপথের একটি সুন্দর মানচিত্র প্রদান করে তৎকালীন সমাজ পরিস্থিতি কবি ও কাব্যের বিচার বিশ্লেষণ করে নিজের ব্যাপকতর জ্ঞান ও উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

সপ্তম গ্রন্থ- 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার'। প্রকাশকাল ১৯৮৩। প্রকাশক-আনন্দ পাবলিসার্স ; বেনিয়াটোলা লেন; কলিকাতা। এই গ্রন্থটি বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিশেষতঃ নিউক্লিয়াস এবং পদার্থ বিদ্যার উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রগীতির বিশ্লেষণ। ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের মতে 'এটি রবীন্দ্র কাব্য সম্পর্কে তাঁর চতুর্থ পুস্তক এবং একেবারে অভিনব। এতে রবীন্দ্র কবিতায় প্রমাণু-বিজ্ঞান ও নভোবিজ্ঞানের গভীর অনুষঙ্গ কবিতা ধরে ধরে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়েছেন'। মহাকাশ বিজ্ঞান রবীন্দ্রের অন্তরে প্রবেশ করে তাঁর কল্পনাকে যে নিয়ন্ত্রিত করেছে তা ডঃ দাসই আমাদের প্রথম বোঝালেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করে তিনি বাঙ্লা সাহিত্যের দরবারে আদরণীয় হয়ে রইলেন। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছে।

অষ্টম গ্রন্থ হিসাবে তিনি মধ্যযুগের বাংলার রাজা-প্রজার সম্পর্ক নিয়ে একটি সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার ব্যস্ত রয়েছেন। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনার একটি রূপরেখা তিনি ইতিপূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি বক্তৃতামালায়' কয়েকটি বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে হয় এই

গ্রন্থখানিতে লেখকের পরিণত মননশীলতা ও বিশুদ্ধ সাহিত্য-দর্শনের সঙ্গে সমাজ-তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পাব।

লেখকের প্রণীত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাও কম নয়। তাছাড়া তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী বহু বক্তৃতা, আলোচনা প্রবন্ধাদিও প্রকাশ করেছেন। বাংলা বানান সমস্যা ও পরিভাষা নিয়ে তাঁর কিছু স্পষ্ট অথচ প্রঞ্জল প্রস্তাবকেও তিনি সুচিন্তিতভাবে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা-সংক্রান্ত জার্ণলগুলিতে এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে আসছেন।

শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভালবেসে তিনি যে পথে যাত্রা করেছেন তার শেষ কোথায় জানা নেই- কিন্তু অন্বেষণ তিনি অব্যাহত রেখেছেন।

যা কিছু ন্যায়সঙ্গত, যা কিছু প্রাণশীল সে সবের সঙ্গেই তাঁর প্রাণের যোগ। এদেশে সংস্কার আর জড়তার, অন্যায় আর অসত্যের প্রতি বারংবার তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই দুর্ভাগাদেশের অশিক্ষা ও ভুল শিক্ষা দূর করবার জন্য তিনি আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। লোক-শিক্ষা, লোক-সংস্কৃতি যে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে তা বোঝাবার জন্য, জানাবার জন্য লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি পরিষদের প্রাণপুরুষ শ্রীশৈলেন দাসের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর টান। এ পরিষদের দুজনেই কর্ণধার। তিনি শুধু নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত নন, তিনি জানেন এতে মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়, মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে আর ব্যক্তিগত দুঃখ শোক এমন একান্ত হয়ে উঠে যে তাকে অতিক্রম করে জীবনে সান্তনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি সুখ-দুঃখভরা সংসারকেই চরম সত্য বলে জেনে তার মধ্যেই পরমকে পাওয়া আনন্দ লাভ করেন। তাঁকে বলতে শুনেছি, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা দেখিয়ে চলতে পারলেই বেঁচে থাকা যায়।

গত কোজাগরী পূর্ণিমায় জীবনের ৭০ বছর অতিক্রান্ত করেও তিনি ক্লান্ত নন। আজও ইংরাজি, বাংলা, সাঁওতালী, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় পারঙ্গম হয়ে আজ তিনি সর্বভারতীয় ভাষার উপর একটি কঠিন কাজে ব্রতী হয়েছেন। এ কাজটি সম্পূর্ণ হলে দেশের মানুষ জানবে কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞান এই সাধারণ আটপোরে মানুষটির মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাঁর দেওয়া দ্যুতিই হয়ত একদিন ভাষাতত্ত্বের ঘরে নূতন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

আজকের এই অর্ধসভ্য সমাজে তিনি একজন সংস্কারক। ইংরেজিতে বলা যায়, He is brilliant phrase in a dull sentence. জীবনের নশ্বরতায় তিনি বিশ্বাসী নন,

জীবনের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এক ছেদহীন অখন্ড বিরাটকে যা মৃত্যুর তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করতে পারে। তবুও তো তিনি মানুষ। তাই সব পেয়েছির আসরে তাঁকে মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ন, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। অতীত কোন সুখস্মৃতি যখন তাঁকে উতলা করে তোলে তখন তিনি গড়গড়ায় সুখটান দেন, কিংবা অকারণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটাই হ'ল পণ্ডিতপ্রবর মানুষটির জীবনে মস্ত বড় ট্র্যাজেডি।

-০-

অনন্য ক্ষুদিরাম

ডঃ অমরেন্দ্র গণাই

বিখ্যাত লোকের সঙ্গে নিজের একটা সম্পর্ক রচনা করতে পারলে আমাদের ইগো অনেকটা পরিতৃপ্ত হয়; কেন না, বিখ্যাত জনের গৌরবচ্ছটায় আলোকিত হওয়ার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। সে কারণে , বিখ্যাত জনের পাশে, তাঁর গৌরবের দিনে অনেক মানুষের ভীড় হয়। বিখ্যাত মানুষটি যেন চারপাশে একটা আবরণ তৈরী করে নেন-গড়ে ওঠে এক অপরিচিত দ্বিতীয় সত্তা। ফলে, আমাদের দেখার মধ্যেই ভ্রান্তি থেকে যায়। যাদের কোন আবরণ পড়ে না- এমন মানুষের সংখ্যা কম এবং ক্ষুদিরাম সেই বিরল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। সে কারণে, তাঁকে নিয়ে লিখতে কোন সঙ্কোচ হয় না। সাফল্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি- কোন কিছুই মানুষ ক্ষুদিরামকে ঢেকে দেয়নি। ত্রিশ বছরের অধিক কাল ধরে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, নানা ভূমিকায় দেখেছি। তাঁকে পেয়েছি শিক্ষক হিসাবে, সহকর্মী হিসাবে, বিভাগীয় প্রধান হিসাবে, গবেষণার নির্দেশক হিসাবে। কিন্তু এসবের মধ্যে আমি মূলতঃ দেখেছি মানুষ ক্ষুদিরামকে- শ্রদ্ধা করেছি তাঁর অনুপম সারল্য দেখে, তাঁকে অন্তরঙ্গ মনে হয়েছে সমব্যথী হতে দেখে, তাঁর প্রতি ভালবাসা জেগেছে তাঁর শিশুসুলভ অসহায়তা , আত্মভোলা ভাব ও অবৈষয়িক বুদ্ধি দেখে।

১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের বাঙলা সম্মানিক শ্রেণীর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ক্ষুদিরামবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আমাদের বিভাগীয় প্রধান হয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর একখানি বই লিখেছেন- শুধু এই তথ্যটুকু জানি। দেখলাম তাঁকে- অতি সাধারণ; চেহারায় , পোশাকে কোন চটক নেই। পড়ানোর সময় কথার মোহিনী মায়ায় ইনি মুগ্ধ করতে পারেন না, নাটকীয় ভঙ্গী বা কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতায় কাউকে মুগ্ধ করতে পারেন না। জোরে কথা বলেন,

নিজের মত যুক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সমস্ত ভাবনা –চিন্তা সম্পূর্ণ তাঁরই। সে সময় কৃষ্ণনগর কলেজে যাঁরা বাঙলা বিভাগে ছিলেন তাঁরা সকলেই নামকরা, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও রসজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ক্ষুদিরামবাবুর পার্থক্যটা বুঝতে বিলম্ব হয়নি। তাঁর গলার জোর আসলে তাঁর চরিত্রেরই তেজ, তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ, তাঁর স্বকীয়তার দীপ্ত উচ্চারণ । এ যে কত বড় শক্তি, এখন আরও ভালো করে বুঝি। আজ কোনও বাঙলা অধ্যাপককে নিজের কথা বলতে শুনি না, পি এইচ ডি-র থিসিস পর্যন্ত লেখা হচ্ছে অপরের ভাবনা-চিন্তা অপহরণ করে।

তখন শিক্ষকের সংখ্যা ছিল কম। তার ওপরে ভূমিকা এত বিস্তৃত হত যে মূল বই শুরু করতে বছর ঘুরে যেত। তখন আর ছ' মাস বাকী; কিন্তু ১৫/১৬ খানা বই বাকী। বিভাগীয় প্রধানকে সমস্যাটা জানাতেই সহজ সমাধান করে দিলেন। একাই সব বই পড়াবার ভার নিজেই নিলেন। ছন্দ, অলংকার, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব যে দক্ষতায় তিনি পড়ালেন, প্রাচীন ও আধুনিক কালের সাহিত্যও সমান দক্ষতায় পড়ালেন। তাঁর পড়ানোর বিস্তার ও বাগাড়ম্বর ছিল না। বাগ্‌বাহুল্য তিনি পছন্দ করতেন না। পড়াতেন একটু দ্রুততালে। চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠত। মূল কথা তিনি সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতেন, কিন্তু ব্যাপক বিশ্লেষণ তিনি করতেন না। আমরা একালে প্রশ্নোত্তরের রীতিতে যেভাবে পড়াই তা যে ছাত্রদের ক্ষতি করে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষ করে তাঁর পঠন-রীতি আমার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সহায়ক হয়েছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও পারিবারিক দুর্দৈবে তখন আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এবং টিউশন করে পড়ার খরচ চালাতে হত। আমাদের সময় রেফারেন্স বই কম ছিল এবং কেনবারও সামর্থ্য ছিল না। ফলে ক্লাস করতাম মন দিয়ে। মূল বই পড়ে তাঁদের বক্তব্য মেলাবার চেষ্টা করতাম। এভাবে সাহিত্য বিচারের একটা যোগ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। এর পিছনে ক্ষুদিরামবাবুর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বড়।

বাঙলায় যেগুলো টেকনিক্যাল বিষয়- ছন্দ, অলংকার ও কাব্যতত্ত্ব – এগুলির পাঠ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম বলে ভিতটা তখন থেকেই পাকা। যোগ্য শিক্ষকের অভাবে এগুলো আজ উপেক্ষিত। অল্প বয়স থেকে কবিতা লিখতাম বলে ছন্দের একটা বেষ গড়ে উঠেছিল। স্যারের কাছে বসুমতী পত্রিকায় বিশেষজ্ঞের মতো ছন্দ নিয়ে গুরুগম্ভীর ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছি।

পত্রিকার সম্পাদক ঐ রচনাটির লেখকের বয়স ও যোগ্যতা জানলে রচনাগুলো অবশ্যই প্রকাশ করতেন না। এই দুঃসাহসের যোগান্দার কিন্তু স্যার।

পড়ার বাইরেও ছিল সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ড । পাঠচক্র বিভাগ , ক্রীড়া বিভাগের নানা অনুষ্ঠান, অভিনয়, নানা প্রতিযোগিতা , কলেজ পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি। তিনি ছিলেন সব বিষয়েই সমান উৎসাহী। সকল ব্যাপারেই তাঁকে জ্বালাতন করেছি এবং বরাবর তাঁর স্নেহ-প্রশ্রয় পেয়ে এসেছি। এর মধ্যেও অবাক হওয়ার কাণ্ড কিছু কিছু ঘটেছে এবং সেখানেই তাঁকে নোতুন করে চিনেছি। আমি তখন নামী-অনামী অসংখ্য পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা লিখছি। কলেজ পত্রিকারও ছাত্র সম্পাদক। নিজের লেখা সম্পর্কে সঙ্কোচ-বোধ ছিল বলে স্যারকে দেখাইনি; কিন্তু কলেজ পত্রিকার কবিতা সংশোধন করতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছি। তিনি হবো পঙ্‌তিটি পাল্টে দিয়েছেন। এটা কিন্তু পণ্ডিতের কাজ নয়, কবিরই কাজ। পরে অবশ্য তাঁর কবিতা আমি দেখেছি। লোক-দেখানো কবিতা লিখলেও তা যে সার্থক কবিতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই কবিতাটি আমার কাছে থাকলে তা উদ্ধার করে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারতাম। আসলে তাঁর মধ্যে একটি কবিমন লুকিয়ে আছে। তিনি যে আজ সার্থক সমালোচক, তার কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিশীলতা।

প্রাচীন গুরুর মতো তাঁর বাড়ীর দরজা ছিল সকলের কাছে উন্মুক্ত। তখন তিনি শক্তিনগরে একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন। সাইকেল করে প্রায়ই বিকাল বেলায় তাঁর বাড়ী যেতাম। গেলেই তিনি প্রথমে খাওয়াতেন। তখন বিকেলে খাওয়ার পয়সা আমার ছিল না। উনি কি সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন ? কোনদিন সে কথা জানতে পারব না- কিন্তু আমার যেন মনে হয়, তিনি বুঝতেন এই ছেলেটিকে শিক্ষাদান করার চেয়ে খাদ্যদান করা অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল। আজ বুঝি –কত সামান্য বেতন ছিল তাঁর –বড় সংসার, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, মা-বাবা দু' ভাই, আরো কিছু আত্মীয়স্বজন। এরই মধ্যে গরীব ছাত্রকে আশ্রয় ও আহার্য দিয়েছেন। চারিদিকের সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চলেছেন অবিচলিত।

তখন তিনি মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক। আমি তারই অধীনে কাজ করব ঠিক করলাম। অনেকে নিষেধ করলেন, ভয় দেখালেন। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। কেন না, আমি জানি, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ নেই। গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় তিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন, পরিবর্ত্তনের নির্দেশ দিয়েছেন, কখনো কখনো গোটা পরিচ্ছদটিকেই নোতুন করে

লিখিয়েছেন। এমনকি , বইটি যখন ছাপা হয়, তখন তিনি আদ্যন্ত এর প্রুফ দেখে দিয়েছেন। এমন গবেষণা নির্দেশক ক'জন পেয়েছেন জানি না।

বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ডি লিট্ উপাধি পান । সেদিন তাঁর সম্মানে মৌলানা আজাদ কলেজে যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়েছিল, সে অনুষ্ঠানে আমি যুক্ত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আজ আমি তাঁর সম্পর্কে আমার মনোভাব জানাতে পেরে ধন্য।

আসলে, এ সবই মানুষ হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। ওঁর মাঝখনে একটা চিরকালের শিশু আছে- যে বেহেসেবী, কৌতূহলী যার আপন-পর জ্ঞান কম এবং বাস্তব বুদ্ধি-বিবেচনা কম। এ যুগে এমন লোকের একজন অভিভাবক দরকার, ধমক দেওয়ার মতো কেউ থাকার দরকার। একালে সবাই কাজ গোছাতে আসে- উনি শত্রু-মিত্র বিবেচনা না করে কাজ করে দেন। যশের অংশ অন্যকে তুলে দিয়ে অপযশের ভাগী হন তিনি। বললে হাসেন- সমান নির্বিকার তিনি। তাই, তাঁর কাছ থেকে আমাদের যতখানি পাওয়ার কথা ছিল, ততখানি আমরা পেলাম না। আর এখানেই ক্ষুদিরাম অনন্য ।

-o-

এই লভিনু সঙ্গ তব

পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী

শ্রদ্ধেয় ড. ক্ষুদিরাম দাসের অধীনে গবেষণা করার সুযোগ পাওয়া যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই সুযোগ আমি পেয়েছিলাম ঘটনাচক্রে। একদিন আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু জয়ন্ত চক্রবর্তী আমাকে বললো,- 'চল না ড. ক্ষুদিরাম দাসকে দেখে আসি, অনেকদিন তাঁকে দেখিনি। আমি বন্ধুর সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলাম। কথা প্রসঙ্গে বড়ু বলে ফেলেছিলাম। তখন স্যার আমাকে বললেন তুমি এ কাব্য নিয়ে গবেষণা করো। তাঁর নির্দেশে আমি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিয়েই কাজ আরম্ভ করলাম। আমিও আমার বন্ধু জয়ন্ত দুজনেই কৃষ্ণনগর কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলাম।

আমি তাঁর অধীনে গবেষণা করার সময় তাঁর স্নেহ সান্নিধ্য পেয়েছি। এই সময় এই মহান মানুষটিকে কি রকম দেখেছিলাম, সেই সুখস্মৃতি শুধুমাত্র আজ এখানে স্মরণ করতে চাই।

আমি যখন গবেষণায় রত হলাম, তখন তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ ও বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিভাগের প্রধানের গুরুদায়িত্বে, সদ্যগঠিত উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) কাউন্সিলের নানা কর্তব্যভার নির্বাহ, স্নাতক স্তরের বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ্যক্রম (Syllabus) নির্মাণ, সভাসমিতিতে ভাষণ দান, মৌলিক গ্রন্থরচনা, নানা সামাজিক কর্তব্য পালন- ইত্যাদি নিয়ে তাঁর কর্মমুখর দীপ্তিময় জীবন।

আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের দুজন বিশিষ্ট মানুষ, স্যারের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছেন। একজন হলেন নদিয়া জেলার প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহনকালী বিশ্বাস। তাঁর বিষয়ছিল- চৈতন্য দর্শন ও আদর্শ চৈতন্য পরবর্তী যুগে কতখানি অনুসৃত হয়েছে- তার অনুসন্ধান। এই উদ্দেশ্যে মোহনকালী বাবু ভারতের বহু বৈষ্ণব আখড়ায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অন্যজন হলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (D.I. of Schools' Secondary) হরেন পাল। হরেনবাবু নির্ণয় করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যের শব্দগুলির প্রয়োগ কৌশল ও শব্দের পুনরাবৃত্তি। এঁরা দুজনেই আমার থেকে বয়সে বড় ছিলেন। এঁদের স্নেহ আমি পেয়েছি। এঁদের গবেষণাও সফল হয়েছে। দুখের বিষয় দুজনেই এখন প্রয়াত। কৃষ্ণনগরের বাইরের অনেকেই সেসময় তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছিলেন- আমি তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না।

অনেকটা জমির উপর স্যারের বাড়ি। প্রায় মধ্যস্থলে। চারিদিকে বাগান। বাড়িটি সাধারণ কিন্তু সুপরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিনন্দন। আশ্রমের পবিত্রতা। বাইরের বসার ঘরের সামনে বারান্দা। শীতকালে এখানে রোদে বসে খুব আরাম, গাছে ছায়াও আছে। আমরা শীতের সময় এই বারান্দায় বসেই কাজ করতাম, স্যারের কথা শুনতাম, গরমকালে স্যারের বসার প্রশস্ত ঘরে।

স্যারের ছিল দরদভিত্তিক নৈতিকতা। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি অসাধারণ ভালোবাসতেন। তাঁর অধীনস্থ গবেষকদের তিনি প্রাণপন সাহায্য করতেন। কিন্তু গবেষণা ঠিকমত না হওয়া পর্যন্ত তা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার ছাড়পত্র তিনি

দিতেন না। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এখানেই তাঁর নৈতিকতা, কোমলতা ও কঠোরতা অপূর্ব সমন্বয়।

রবিবার দিন সকাল থেকে তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়ি থাকতো ছাত্র-ছাত্রীতে ভরা। আমরা গবেষক-ছাত্ররা উপস্থিত হতাম তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে। আমরা এক একজন করে স্যারের সামনে উপস্থিত হতাম। তিনি প্রত্যেকের গবেষণার বিষয়কেই দরদ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে এবং সকল প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন। তিনি আবার আমাদের প্রশ্ন করে জেনে নিতেন আমরা কতটা গুরুত্ব দিয়ে কাজটি করছি, সত্যের অন্বষণ কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। তিনি অনেক বই পড়তে বলতেন, নিজেও তিনি বই সংগ্রহ করে দিতেন। বৎসরের পর বৎসর স্যার আমাদের জন্য এমন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই, বিরক্ত নেই এবং আনন্দ আছে।

কোনো কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সমীক্ষার প্রয়োজন হয়। মোহনকালীবাবুর, ও আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। মোহনকালীবাবুকে ভারতে বহু বৈষ্ণব মঠ-মন্দির-আখড়া ঘুরতে হয়েছিল, আমাকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-ছাতনা শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন গ্রামগুলিতে যেতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের মানুষের ভাষার কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, তার অনুসন্ধানের জন্য। স্যার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী মানিকলাল সিংহকে বলে বিষ্ণুপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (বেলুড়ের অধীনস্থ নয়) আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমি প্রায় একমাস সেখানে থেকে কাজ করেছি। একদিন শুশুনিয়া পাহাড়ের সন্নিহিত গ্রামগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ভাগ্যক্রমে বিষ্ণুপুরগামী একটা সারকাসের গাড়িতে চড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রমে ফিরতে পেরেছিলাম। মানিকবাবু এত রাতেও উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

একদিন আমার গবেষণার কাজ্য শেষ হলো। আমার গবেষণা পত্রটি স্যারের অনুমোদনের জন্য দিলাম। তিনি লাল কালি দিয়ে আমার লেখার কোন কোন অংশ সংশোধন করেছেন, আবার কোথাও কোথাও মন্তব্য লিখে নির্দেশ দিয়েছেন, আবার কোথাও কোথাও লিখে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমার জন্য কত পরিশ্রম করেছেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় হিসাবে তাঁর সংশোধন করা আমার ঐ লেখাগুলি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। আবার সংশোধন করে গবেশণাপত্রটি স্যারকে দিলাম। এবার আবার ভাল করে পড়ে আমাকে

বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার ছাড়পত্র সানন্দে লিখে দিলেন। স্যার এমন কঠোর পরিশ্রম করেন প্রত্যেক গবেষকের জন্যই।

আমার মৌখিক পরীক্ষা হয়েছিল ২২/০৩/১৯৮২ তে। পরীক্ষক ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। স্যারও উপস্থিত ছিলেন। ড. ভট্টচার্য আমার গবেষণায় সন্তুষ্ট হয়ে জানিয়ে দিলেন যে আমি এ দিন থেকেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. হলাম। এ সময় বোধ হয় আমার থেকেও স্যার বেশি খুশি হয়েছিলেন। গবেষণা শেষ হওয়ার পরও আমি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

স্যারের স্নেহ যে শুধু এ বঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরাই পেয়ছিলেন তা নয়, ওবঙ্গের শিক্ষার্থীরাও পেয়েছিলেন। বাংলা দেশের ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে পত্রযোগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতেন। তিনি সযত্নে সবিস্তারে তাঁদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়েছিলেন। পরমস্নেহে। তাঁর লেখা ঐ পত্রগুলি যদি সংগ্রহ করা যেত, তাহলে সেগুলিও মূল্যবান সম্পদ হতো। একবার দেখলাম সে দেশের এক দল ছাত্র-ছাত্রী এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা কোলকাতায় স্যারের সঙ্গে দেখা করেছেন, কৃষ্ণনগরে বাড়িতেও এসেছেন। কৃষ্ণনগরে দেখলাম তাঁরা খুব স্বচ্ছন্দেই সকলের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। স্যারের নানা ভঙ্গিমায় ফটো তুলছেন। মনে হলো এঁরা স্যারের কতকালের চেনা। অথচ এরা আগে স্যারের সঙ্গে কোনদিনই দেখা হয়নি, চিঠিতেই যা যোগাযোগ।

স্যারের বেশকিছু বই লেখার সময় আমাদের অনেকের তাঁর কাছে থাকার সুযোগ হয়েছিল। সে সময় দেখেছি কি নিষ্ঠার সঙ্গে বইগুলি লিখছেন। তাঁর বিখ্যাত বই রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই বইটির জন্য তিনি যখন ডি লিট পেলেন তখন আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের তাঁর ছাত্র। তাঁর এই গৌরবের জন্য কৃষ্ণনগর কলেজ যে সম্মাননা জানিয়েছিলেন তার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি এবার সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হবেন। আমার মনে হয় রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় বইটির সঙ্গে তাঁর পরবর্তীকালের লেখা বইগুলির লেখনি কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়- এ অল্প বাক্যে বেশীকথা বলা হয়েছে। যেন ক্ষীরটুকুই শুধু পরিবেশিত হয়েছে। এ ভাষা বিদ্বজ্জন সমাজে আদৃত হলেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হচ্ছে বুঝে তিনি তাঁর পরবর্তীকালের ভাষাকে অনেক সহজ করেছেন। ১৯৫৮ সালে বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি ১৯৬৬ সালে চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী

প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব রস শাস্ত্র বিষয়ক বৈষ্ণব-রস প্রকাশ গ্রন্থটি বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। তিনি এমন তাত্ত্বিক বিষয়কেও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে সুখপাঠ্য করেছেন। তাঁর বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। সেটি হতো শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতকে অবলম্বন করে। তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

স্যারের সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। এই সময় থেকেই স্যার কিভাবে লিখছেন তা দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। বইটির ভূমিকায় নানা বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে মুকুন্দরামের সমকালীন বাংলা অবস্থা ও কবির জন্মভূমি বর্ধমানের দামুন্যা গ্রাম থেকে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়েছে। স্যার সে যুগের জমি জরিপ ব্যবস্থা বোঝার জন্য আবুল ফজলের আইন-ই আকবরি পুঁথির সমগ্র অংশ তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন। আত্মজীবনীতে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এক জায়গায় লিখেছেন- ‘ মাপে কোণে দিয়া দড়া/ পনেরো কাঠায় কুড়া।’ অনেক সমালোচক মনে করেছিলেন কৃষকদের উপর অত্যাচার করে শাসক শ্রেণী (ডিহিদার) বেশি কর আদায় করতো। স্যার আইন-ই আকবরি পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশে তখন নতুন জরিপ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। দামুন্যা গ্রাম থেকে আড়রা গ্রামের যাত্রাপথও তিনি সরেজমিনে দেখে এসেছেন। এমন নিষ্ঠা নিয়েই তাঁকে বই লিখতে দেখেছি।

স্যার হয়তো মনে হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের পাঠ আরও বিশুদ্ধ করা দরকার। তাই আবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য জায়গা থেকে মুকুন্দরামের প্রচুর পুঁথি সংগ্রহ করে মুকুন্দরামের প্রকৃত ভাষা উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। কাজটি বেশ কিছুদূর এগোলেও তিনি শেষ করতে পারেন নি।

১৯৭৩ সালে তাঁর সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। এই বইটি রচনাকালে তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দুরূহ বিষয়গুলি আয়ত্ত করেছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরাও আসতেন তাঁর কাছে। তাঁদের সঙ্গেও তাঁর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

১৯৯৩ সালে চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি, ১৯৯৪ সালে বানান বানানোর বন্দরে, ১৯৯৫ সালে দেশ-কাল-সাহিত্য এবং ১৯৯৮ সালে সাঁওতালি বাংলা

সমশব্দ অভিধান বইগুলি প্রকাশিত হয়। তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন বহুকাল আগেই কিছু সাঁওতালি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। সেগুলিই আবার তৎসম শব্দরূপে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। কিছু সাঁওতালি প্রত্যয়ও সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করেছিল। তাঁর মতে বাংলা ভাষা এখন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন সংস্কৃত নিয়মনুসারে ইন্‌ভাগান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' – কার, ই-কার হয়ে যায়। জেন্ম-প্রতিযোগী>প্রতিযোগিতা। স্যার মনে করেন এই নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই।

১৯৮১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রকল্পিত Bengali Linguistic Dictionary for both Bengalees and non Bengalees নামে একটি সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ণের কাজে নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে তাঁর এই কাজটি দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই অভিধানটি রচনা করার জন্য বিভিন্ন ভাষা-জানা লোকের দরকার ছিল। কিন্তু স্যার কোনো ভাষায় লোক পাননি। একাই এই সুবৃহৎ কাজটি সমাপ্ত করে সকলকে বিস্মিত করেছেন। এর মধ্যেই তিনি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – 'বাঙলা সাহিত্যের আদ্য-মধ্য' রচনা করেছিলেন। এই বইটির মধ্যে 'বাঙালি জাতির উদ্ভব' অংশটি অসাধারণ।

তিনি তাঁর সব লেখাকেই গুরুত্ব দিতেন। এমনকি পূজা কমিটির প্রকাশিত ছোট ছোট পত্রিকাতেও এমন সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা সংগ্রহ করে রাখার মতো।

গবেষণা করার সময় তাঁর সঙ্গে কয়েকটি জায়গায় যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। গত শতকের সত্তর, আশির দশকে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিয়ে মায়াপুর ও নবদ্বীপের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। স্যার অনেকবারই এ বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য এই দুইটি স্থানেই গিয়েছিলেন। আমাকেও দু-একবার তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতেই বর্ণনা প্রসঙ্গে নবদ্বীপের পথঘাট, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত ভক্তদের বাসস্থান, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি এবং ভাগীরথীর প্রবাহপথ প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু আভাস পাওয়া যায়। নৈসর্গিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চালিত হয়েছে ভাগীরথী তীরবর্তী নবদ্বীপ। স্যার সব কিছু বিবেচনা করে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচিত

বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি- নবদ্বীপ (নদীয়া)' প্রবন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচশত বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ জি সি) অর্থানুকুল্যে ১৯৮৫ সালের ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মাজদিয়া সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সামাজিক দর্শন ও সমকালীন ভারতে তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল স্যারের উপরে ন্যস্ত। এই সেমিনারে বিদগ্ধ পণ্ডিতরা বক্তব্য রেখেছেন। স্যার তাঁর স্বকীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ মনোজ্ঞ বক্তব্য রেখে আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা সেই সেমিনারে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

আমরা তাঁর কাছে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর প্রচুর স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি। যদি স্যারের বাড়িতে যেতে কয়েকদিন দেরি হতো, তাহলে তিনি ভাবতেন আমরা অসুস্থ হয়েছি। তিনি তাঁর ছেলেদের পাঠাতেন আমাদের খোঁজ নিতে। শীতকালে তাঁর বাড়িতে পুকুর পাড়ে বনভোজনের কথা ভোলার নয়। গ্রাষ্মকালে তাঁর বাড়ির আম পাকলে আমাদের খাইয়ে তাঁর আনন্দ। নারকেলের নাড়ু করা থাকতে আর পিঠে স্যারের সঙ্গে বারোদোলের মেলা দেখার আনন্দই আলাদা। তাঁর প্রশ্রয়েই তাঁকে শাসন করার অধিকার আমাদের জন্মে গিয়েছিল। তিনি খুব সিগারেট খেতেন। আমরা তাঁকে বাধা দিতাম। একদিন তিনি তাঁর জামার পকেট থেকে একটা ছোট পকেট হুঁকো বার করে বললেন- এই হুঁকো খেলে কোন বিপদ হবে না। আমাদের খুশি করার জন্যই মনে হয় এই ব্যবস্থা। একদিন শুনলাম স্যার কৃষ্ণনগর স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে উঠছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কেন এমন কাজ করেছেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন,- চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা চলে যাবে তা কী সহ্য করা যায়!

দরিদ্র মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভালোবাসা। তিনি হোমিওপ্যাথি ভালোভাবে শিখেছিলেন তাদের সেবা করার জন্যই। বাড়িতে রেখেছিলেন হোমিওপ্যাথি ঔষধের বিরাট বাক্স। তাঁর চিকিৎসায় অনেকেই রোগমুক্ত হয়েছেন। তাঁর সুচিকিৎসার কথা শুনে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বাড়িতে ভিড় করতেন। এখানে চিকিৎসকের ফি নেই, ঔষধের দাম লাগে না। রোগীকে সুস্থ করেই তাঁর আনন্দ। প্রচার বিমুখ এই মানুষটি এভাবে অকাতরে নিজেকে দান করেছেন দরিদ্র আর্ত মানুষের সেবায়।

ঘূর্ণ দেশবন্ধু লাইব্রেরী (বর্তমানে নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার) গড়ে তোলার প্রথম পর্বে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন জিয়াদন নবী মোল্লা। এই গ্রন্থাগারের বই কেনার ব্যাপারে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর, অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আমাদের স্যারও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

ছোট-বড় কাউকে তিনি বিমুখ করতেন না। অনেক সময় অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা তাঁকে তাদের অনুষ্ঠান আমন্ত্রণ করতো। স্যার তাদের ফিরিয়ে দিতেন না। তারা যখন গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইতো তখন তিনি বাধা দিতেন। নিজেই ঠিক সময়ে তাদের অনুষ্ঠান স্থলে চলে যেতেন।

নারীজাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। পরে বুঝেছিলাম খবরের কাগজে নারী নির্যাতনের কথা পড়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি।

তিনি মানুষের উপরেই আস্থা রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে 'কৃষ্ণচৈতন্য' বলে বর্ণনা করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে মানুষই বড়। সংগ্রামী চৈতন্যের ভেদবুদ্ধিহীন মানব প্রেমকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীচৈতন্যের বিশ্বাস ছিলঃ চরিত্র-নীতিই লোকস্থিতির ধারক-বাহক। এই আদর্শে আস্থা রেখে কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি। তিনি সবধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বাড়িতে কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা নিষ্ঠার সঙ্গেই হতো। ঐ দিন আবার স্যারের জন্মদিনও।

সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে তাঁর উপস্থিতিতে পরিবেশটি আনন্দে ভরে উঠতো। তাঁর ছেলেমেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার নিমন্ত্রণ থাকতো। আমার দায়িত্ব ছিল তাঁর বন্ধু সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে নিয়ে আসা আবার তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। আমি দেখেছি কত আন্তরিকতায়, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় সকলকে অনুষ্ঠানে বরণ করে নিচ্ছেন। স্যার আমাদের পারিবারিক সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আনন্দ দিয়েছেন।

স্যার যে কেমন বিবেকবান মানুষ ছিলেন, তা একটি ছোট ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হবে। একদিন সকালে তাঁর বাড়িতে লোক নিয়ে এসেছেন। তাঁর বাড়িতে সামনের দিকে একটি নারকেল গাছ বেঁকে রাস্তার উপর দিয়ে একটি বাড়ির দিকে ঝুঁকে আছে। স্যার ঐ গাছটি কেটে ওই বাড়ির লোকদের বিপদমুক্ত করতে চান। যাদের রক্ষার জন্য গাছটি কাটার আয়োজন তারাই এসে কাতরভাবে

বলছেন- ফলন্ত গাছ কাটবেন না, আমাদের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু স্যার কারো কথাই শুনলেন না, গাছটি কেটে ফেলেন।

স্যার দেওয়ালির দিন পুকুরে কলার ভেলায় করে প্রজ্বলিত মাটির প্রদীপ ভাসিয়ে দিতেন। শুনেছি তিনি বাল্যকালে নদীতে প্রদীপ ভাসাতেন। কল্পনা করতেন হয়তো ঐ আলোর বর্তিকা আজানা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যাবে।

আমরা কয়েকজন মিলে ১৯৭৫ সালে ৩ বছর থেকে ৬ বছরের শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি-স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য 'শিশুমঙ্গল পর্ষৎ-নদীয়া' গড়ে তুলেছি। তিনি অনুগ্রহ করে এই পর্ষদের সহ-সভাপতি হয়ে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা শাসক।

তাঁর পশু-পাখির প্রতি দরদও অসাধারণ। নানা রকমের পাখি তাঁর বাগানের ফল খেলেও তিনি তাদের তাড়াতেন না। রাস্তার অসুস্থ কুকুরকে ধরে এনে সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তোলা তাঁর অন্যতম কাজ। বাছুরের মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকারের তিনি একজন জোরদার সমর্থক।

স্যার মানসিক শ্রমের সঙ্গে শারীরিক শ্রমও করতেন। আগে তাঁর বাড়ির চারিদিকে পাকা দেওয়াল ছিল না। তিনি নিজে তালপাতা, নারকেলের ডাল আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে খুব সুন্দর, মজবুত বেড়া দিতেন। তাঁর সঙ্গে হেঁটে পারা যেতো না।

স্যারের অতি সান্নিধ্যে এসেও তাঁর অগাধ জ্ঞানসমুদ্রের তল খুঁজতে যাই নি, সে দুঃসাহসও হয়নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে মানুষটাকে খুঁজে পেয়েছি। অসামান্য ছাত্রদরদী, মানব প্রেমিক, প্রকৃত ধার্মিক, আর্তের সেবক, পশুপাখী দরদী, বিবেকবান, সমাজ সেবায় সদা কর্মচঞ্চল, প্রচার বিমুখ, নিরহঙ্কার, বিরল পাণ্ডিত্যের অধিকারী একটি পরিপূর্ণ মানুষ। এই স্নেহ-সান্নিধ্যের কথা অনুভব করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শেষ করি-

আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,

হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সুন্দর, হে সুন্দর।।

-o-

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ

ড. মোহাঃ মুসা কালিম

অধ্যাপক ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে অতি পরিচিত নাম। বাঁকুড়া জেলায় আপনারা যে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমরা খুশী। দীর্ঘদিন নিকটে থেকে নানা সময়ে নানাভাবে তাঁর উদার অকৃত্রিম মানবিক গুণাবলীর যে পরিচয় লাভ করেছি তা সংক্ষিপ্তভাবে এই অবকাশে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি।

ষাটের দশকের শেষে ক্ষুদিরামবাবু মৌলানা আজাদ কলেজের বিভাগীয় প্রধান। ঐ কলেজে অধ্যাপকদের বসার ঘরে চা পানি সরবরাহকারী বয়স্ক বেয়ারা গণির মুখেই শুনেছি যে- রোজার মাসে গণির শুকনো মুখ দেখে ক্ষুদিরাম বাবু তার নিকট চা পানি না চেয়ে অধিকাংশ সময় বাইরে খেয়ে নিয়ে রোজাদার গণিকে বাঁচিয়ে দিতেন। যেদিন তিনি ঐ কলেজের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হাজির, সেদিনও ভিড়ের মাঝে ফল মিষ্টি চা বিস্কুট বিতরণকারীকে ডেকে নির্দেশ দিচ্ছেন গণির জন্য তা রাখা হয়েছে কি না। মানুষের প্রতি কতো সুগভীর মমত্ববোধ যে তাঁর অন্তরে নিহিত, তার পরিচয় নানা সময়ে নানা কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখেছি।

কৃষনগরের নতুন বাজারে মাছ তরকারি কেনার ফাঁকে এক মহিলার করুণ কান্নাভেজা চোখ ও চিন্তান্বিত শুকনো মুখ তাঁর নজরে পড়লো। সামান্য সহানুভূতির প্রশ্রয়ে, নিবেদন করল কান্নার কারণ-যথা বিয়ের পর কোলে বাচ্চা। মরদ বেপাত্তা। আবার অন্য কোথা নতুন ঘর বেধেঁছে। এখন সে বাপের বাড়ীতে বাচ্চা নিয়ে ..... । করবে কি? খাবে কি? কে দেবে? সে চায় 'দুটো ভাত আর একটু নুন'। এর জবাবে কৃষ্ণনগরের বিরাট বাড়িতে যেখানে কাজের সঙ্গে অকাজের লোক বেশী আছে, তবুও তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন। স্বামী-বিতাড়িত সেই মমতা গভীর মমত্বে অল্প সময়ে সকলকে আপন করে নিল। কিন্তু বিধির বিধান। কিছুদিন পর রোগে বিছানা গ্রহণে কাজে আসা বন্ধ করলো। তার এবং বাচ্চার জন্য বাড়ি থেকে খাদ্য, পথ্য, অর্থ পাঠালেন। এলোপ্যার্থী ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় মমতা অর্থাৎ মমতাজ কবরেই চলে যেতে হল। বহুবার স্যারকে তার মৃত্যুতে দুঃখ বেদনা প্রকাশ করতে দেখেছি। ' হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন'? কাজের মাধ্যমে তিনি ঐ প্রশ্নের জবাব বহুবার বহুভাবে দিয়েছেন।

মিথ্যা অসত্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাবরই আপোষহীন সংগ্রামীর ভূমিকায় তাঁকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরামের আত্মজীবনী বর্ণনার ব্যাখ্যায় দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যার জাল রচনা করে ব্যাখ্যাদানকারীরা আত্মতুষ্ট ছিলেন। ক্ষুদিরাম বাবু ভূগোল ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে পথে প্রান্তরে হেঁটে যুক্তির আলোকে ঐ মিথ্যার প্রতিবাদ করলেন। সুধীজন তা মেনে নিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মুসলমান কাজীর আসল সম্বন্ধ কেমন ছিল সে ইতিহাস লিখনে কথনে ও বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন।

সঙ্কীর্ণ জাতপাতের ভেদ-বিভেদের এবং স্বার্থমগ্ন লোভলালসার বহু উর্দ্ধে তিনি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবার বিষয়ে যখন দৈনিক সংবাদপত্রে তাঁর নাম বহুভাবে আলোচিত হচ্ছে তখনো ঐ পদমোহ তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটতে যে পারেনি, তা অনেকেই জানেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া বিদ্যাসাগর পুরস্কার পাবার পরও সেই একই অবস্থা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য সম্পন্ন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হয়েও জীবনযাত্রায় কোনোদিন বড়োমানুষই দেখান নি বলেই, সাধারণ মানুষ তাঁর অতি আপন জন হতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল রমণীকে কবিতাই ঠাঁই দিয়েছেন। সেই সাঁওতাল ভাইদের মুখের ভাষা কতদিক দিয়ে কিভাবে বাংলাভাষাকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে, সে বিষয়ে তিনি মাসিক বসুমতীর পাতায় প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সুধীজনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন।

ট্রেনে-ট্রামে-বাসে, পদযাত্রায়, মিছিল-মিটিং ও নানা সভাসমিতিতে খ্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে, এবং চপ-কাটলেট ভক্ষণের ফলে বায়ুপিত্তকফের নানাবিধ যন্ত্রণা কাঁধে নিয়ে, তেলনুনের বড় সংসারের ঘানির মাঝখানে বসে, তিনি রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা বিষয়ে পাণ্ডুলিপি রচনা করেন কিভাবে, তা ভাবতে অবাক লাগে। কারণ ঐ বিষয়ের আলোচনা শুনে বিজ্ঞানের বাঘাবাঘা অধ্যাপকদেরও মুখ হাঁ হয়ে যেতে দেখেছি। কোথায় মহাকাশ-বিজ্ঞান, কোথায় রবীন্দ্রনাথ আর কোথায় ক্ষুদিরাম দাস। এরই অপর নাম বোধ হয় প্রতিভা।

-০-

বিশ্ববিদ্যালয়ের তার ছাত্ররা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

হর্ষ দত্ত

মণিদীপা দাস

অশোককুমার মিশ্র

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসঃ স্মরণে শ্রদ্ধায়

তরুণ মুখোপাধ্যায়

তোমরা কি মনে করো রবীন্দ্রনাথ একজন ঠাকুর? তেল-সিদুঁর আর ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করতে হবে? তারপর আবার কুলঙ্গিতে রেখে দেবে? না-আ-আ!

ছোটখাটো রোগা শ্যামবর্ণ ধূতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটি চিৎকার করছিলেন ১৮-বি ক্লাসরুমে। উত্তেজনায় কালো মুখে লাল রক্তের আভা। ডায়াস ছেড়ে বারংবার নেমে আসছিলেন সারি সারি বেঞ্চের সামনে। ছাত্রছাত্রীরা নির্বাক। বক্তা তিনি। পড়াচ্ছেন, না ধমক দিচ্ছেন বোঝা দায়। তবে একটু মন দিয়ে শোনা গেলে বোঝা যাবে, এই মানুষটি পড়াচ্ছেন। প্রাণপণে তাঁর দীর্ঘ জীবনে চর্চিত ও অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিতে চাইছেন। যুক্তি ও বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাহিত্যকে বিচার করতে শিক্ষা দিচ্ছেন। ইনি অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে সাম্মানিক বাংলায় প্রথম হয়ে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হই, তখনই যেসব অধ্যাপকদের নামেও বই পড়ে জানতাম, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস। এম এ পার্ট ওয়ানে তিনি ক্লাস নিয়েছিলেন কিনা মনে নেই। তবে পার্ট-টুতে স্পেশাল পেপার ও জেনারেল পেপার পড়াতেন। তাঁর বিষয় ছিল

রবীন্দ্রসাহিত্য। চিত্রা কাব্য পড়াতেন জেনারেল ক্লাসে। স্পেশালে পড়াতেন শেষ সপ্তক। আধুনিক কাব্য কবিতা আমার বিশেষ পত্র হলেও, রবীন্দ্রকাব্য পুনশ্চ, শেষ সপ্তক পড়তে হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগেই কলেজে আমার স্যারদের কাছে শুনেছিলাম, ক্ষুদিরামবাবু খুব পণ্ডিত মানুষ। কিন্তু জাতি-বর্ণ-লালিত বঙ্গীয় সমাজ উচ্চবর্ণেরা নাকি তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। অন্তত দুজন কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অধ্যাপকের নাম শুনেছি, যাঁরা ক্ষুদিরামবাবুকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার অধিকার দিতে চাননি। ছাত্রবস্থায় ব্যাপারটা তেমন বিশ্বাস্য মনে হয়নি। যাঁর এত পড়াশুনা, ডিগ্রি, বইপত্র- তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাঁই পাবেন না? পরবর্তীকালে আমি যখন ছাত্র থেকে অধ্যাপক হলাম, চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি, তখন দেখলাম 'যোগতা' শব্দটি হাস্যকর। অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারে নয়, খুঁটির জোর, পদানত ও পদসেবার যোগ্যতা যার আছে সেই শীর্ষস্থানে যাবে। যে-ট্র্যডিশন আজও বহমান।

আমি যখন এম এ পড়ি, তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর কাছে পরে আমি পি এইচ ডি গবেষণা করি। আমাদের পাঠ শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে প্রধান বদল হলো। এলেন সেই ক্ষুদিরাম দাস- যাঁকে একদিন অস্পৃশ্য ভাবা হয়েছিল। বিভাগীয় প্রধান হয়ে ক্ষুদিরাম বাবু বিভাগে কিছু সংস্কার করতে উদ্যত হন। যাতে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিভাগের শিক্ষকেরা নিয়মিত ক্লাস করেন কিনা, কে কী বই পড়ান, বই শেষ করেন কিনা এবং ছাত্রছাত্রীরা সন্তুষ্ট হয় কিনা, ইত্যাকার প্রশ্নাবলী তৈরি করে তিনি ক্লাসে বিলি করেন। গোপন ব্যালটের মতো যা একটি সংবক্ষিত বক্সে জমা করতে বলা হয়। আগুনে ঘি পড়ায় মতো জ্বলে ওঠে ক্যাম্পাস। বিভাগীয় অধ্যাপকদের তীব্র আপত্তিতে প্রত্যাহার করা হয় আবেদন পত্র।

স্যারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে কয়েকজন অধ্যাপক আমাকে ভালোবাসতেন, তাঁদের মধ্যে ক্ষুদিরামবাবুও একজন। আমি কবিতা ভালোবাসি, লিখি, এটাই তাঁর আমাকে পছন্দ করার কারণ ছিল। যখনি কোথাও বক্তৃতা দিতে যেতেন, বলতেন। আমি হাজির হতাম, আমাদের বন্ধুরা যেতোনা। স্যারের ক্ষণে উত্তেজনা, ক্ষণে প্রশান্তি, তীব্রস্বরে কথা বলা তারা মানতে পারেনি। শুনেছি, শুধু ছাত্রেরা নয়, কোনো-কোনো শিক্ষক-ও বলতেন, ক্ষুদিরামবাবু পাগলাটে মানুষ। আসলে স্যার প্রথা মেনে পড়াতেন না, তাঁর ভাবনাও প্রথাভাঙ্গা। কাজেই এমন মানুষকে কুৎসার শিকার তো হতে হবে। 'চলো

নিয়মমতে' তিনি মানেননি। তাঁর ছাত্র হিসাবে ও আমিও মানি না। আমাকেও তাই নিন্দামন্দ আজও শুনতে হয়। এব্যাপারে প্রবীণ-নবীন সকলেই সহযোগী। বিশেষত আমি অনেক লিখি, এটা কেউ সহ্য করতে পারে না।

একালের সেমেস্টার পদ্ধতি আমরা পাইনি। পেতেও চাই না। এই ফাঁকিবাজি পড়ায় আমার সায় নেই। কুইজ জানা আর লেখাপড়া করা এক জিনিস নয়। তদুপরি, এখন পাইকারি হারে ফার্স্টক্লাস পায়। তবু অসন্তোষ মেটে না। আমাদের সময় একজন বা দু'জন ফার্স্টক্লাস পেতো। মনে হতো তারা দেবদূত। বিস্ময়ে সম্ভ্রমে দেখতাম। পড়ানো হতো ৮টি পেপার। সম্পূর্ণ বই-ই পড়তে হতো, বলে কিছুই ছিল না। একটা সাজেশন আমরা দশ বছরের প্রশ্ন ঘেঁটে তৈরি করতাম। স্যারেরা নিজেদের মতো পড়াতেন। তাও সব ক্লাস সবদিন হতো না, এটাও সত্য। ছাত্রদের উপস্থিতি নিয়েও কড়াকড়ি ছিল না। অনেকটা মুক্ত পরিবেশ। অন্যদিকে সমস্যাও ছিল। পরীক্ষায় কী আসবে ভেবে কূল পেতাম না। স্যারদের পড়ানোর ভাব ও মনোভাব বুঝে আমরা সম্ভাব্য প্রশ্ন জানতাম। কিছুটা লেগেও যেতো।

ক্ষুদিরামবাবু চিত্রা কাব্য পড়াবার সময় ওরিয়েণ্টালিজম নিয়ে মেতে উঠলেন। আর শেষ সপ্তক কাব্য পড়াতে গিয়ে কবির বিজ্ঞানচেতনা কী চমৎকার বারেবারে বলতেন। একবার দ্বারভাঙ্গা হলে রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে বক্তৃতাও দিলেন। এবিষয়ে তাঁর বইটি তখনও বেরোয়নি। সেই বক্তৃতা শুনে আমি কিছুটা নোট্ নিই। পরীক্ষায় খুব কাজে লেগেছিল। তবে এম এ রেজাল্ট বেরোবার পর দেখি স্যারের দেখা পেপারে আমি ৫০-এ ৩০ পেয়েছি। অথচ আমাদের বন্ধু অশোক পেয়েছে ৩২। স্যারকে বলতেই বললেন, তোমার লেখা চমৎকার। কিন্তু ছন্দ নিয়ে দু'লাইন বললে না কেন? ওটা অশোক লিখেছে। তাই ওকে দু'নম্বর বেশি দিয়েছি। অকপট স্বীকারোক্তি। পরে জেনেছিলাম, ছন্দ নিয়ে স্যারের আগ্রহ, দুর্বলতা ছিল। ইন্টারভিউ বোর্ডেও এবিষয়ে নাকি প্রশ্ন করতেন।

ছাত্র থেকে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা যখন করি, তখন প্রায়ই স্যারের সঙ্গে দেখা হতো কলেজ স্ট্রিটে এলে। উনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অভিধান নিয়ে কাজ করতেন। যেতেও বলেছিলেন। যাওয়া হয়নি। স্যারের রবীন্দ্রবিষয়ক বই, বৈষ্ণব সাহিত্য পড়েছিলাম। স্যারের পাণ্ডিত্য কত বিচিত্র তাও জেনেছি, ভাষা, ছন্দ, অভিধান, বানান ইত্যাদি নিয়ে কত কাজ করেছেন। জানি না, কজন এখন তা পড়েন? যাঁরা পড়েনি, তাঁরা হতভাগ্য মনে করি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এতদিন আমরা পড়েছি। এখন পড়লাম ক্ষুদিরাম বাবু সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল। কী চমৎকার ব্যাখ্যা, নানা নতুন তথ্য। যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর বৈষ্ণব রসপ্রকাশ পড়ে, স্যারের লেখা রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় এখনো সর্বজনপাঠ্য। তাঁর চলমান রবি সেভাবে প্রচারিত নয়। সাঁওতালি ভাষা নিয়ে, বানান নিয়ে চর্চা খুবই উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আমার আরেক স্যার অধ্যাপক মানস মজুজদার আমাকে ক্ষুদিরামবাবুর বাছাই প্রবন্ধ বইটি দেন। যার ভূমিকা তিনিই লেখেন। এই বইয়ে এত বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ আছে, যা পড়লে বোঝা যায়, স্যার বহুমুখী ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

স্যারের কথা ভাবলে আমার যা মনে হয়, তা হলো এই, তিনি একজন শিক্ষাবিদ, ছাত্রবৎসল মানুষ। বাইরে তাঁর কিছু আচরণ ও বাগ্‌ভঙ্গি হঠাৎ রূঢ় মনে হলেও আদতে তিনি তা নন। যখন আমি আর ছাত্র নই যখনি দেখা হয়েছে প্রণাম করেছি, উনি বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। কী পড়ছি, কী লিখছি জানতে চেয়েছেন। বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়েও তিনি যে কষ্টবিমুখ নন, তাও বলেছেন। নতুন নতুন কত পরিকল্পনা ও স্বপ্ন তাঁর। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর কিছু আভাস দিয়েছেন। আশ্চর্য এক তারুণ্যে তাঁর মন উজ্জীবিত হতে দেখেছি। জীবৎকালে তাঁর যত সম্মান ও পুরস্কার পাওয়া উচিত, তা পাননি। যা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তখন আমিও ক্ষোভ জানাতাম। এখন উপেক্ষা করি। বুঝি কোন বেদনা রবীন্দ্রনাথ 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানের পঙ্‌ক্তিটি মুছে দিতে চেয়েছিলেন। চারিদিকে অন্ধ, বিকলাঙ্গের ভিড় দেখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ আর অদ্‌ভুত আঁধারের আনা গোনার শঙ্কিত হয়েছিলেন। সেই আঁধার আজও ঘোচেনি। তবু আমরা অন্ধ বিশ্বাস হারাইনা। সূর্যে সূর্যে চলার চেষ্টা করি। ক্ষুদিরাম বাবুর মতো শিক্ষকেরা আমাদের চলার পথে সেই আলোকবর্তিকা। তাই স্যারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার

মন বলে, আমি চলিলাম,

রেখে যাই আমার প্রণাম

তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো

ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘোচালো।

('পথের শেষে'/ রবীন্দ্রনাথ)

দেখতে দেখতে আমিও তো ষাট বসন্ত পেরোতে চলেছি। স্যারের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই। আমার স্মৃতিলোকে তিনি চিরজীবী।

-০-

জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা

হর্ষ দত্ত

নাতিদীর্ঘ বললে যে-অবয়ব আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসকে দেখে তা মনে হত না। আবার খর্বকায় হিসাবে চিহ্নিত করলে অসত্য বলা হয়। তাঁর অবয়ব ছিল এই উচ্চ ও অনুচ্চের মাঝখানে। সারা জীবন তিনি যা পেয়েছেন, তা ওই মধ্যম স্থানের অনুসারী। অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল অনেক উচ্চতায়। কিন্তু বহু সম্ভাবনা সত্ত্বেও তা হয়নি। আমাদের নিস্পৃহতাই এর জন্যে দায়ী।

শুনেছি একেবারে স্কুলজীবন থেকেই তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। অভিজাত, এমনকি, কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারেও জন্মাননি। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রাম থেকে, জাতপাত অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে উঠে এসেছিলেন জ্যোতিষ্কের মতো। পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন নিরবচ্ছিন্ন স্বকীয় প্রতিভায়। সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা দিয়ে, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। সময় ১৯৩৯ সাল। এরপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে, সেই বেলিয়াতোড়ের অন্ধকারময় জীবনকাহিনির দিকে তাকাতে হয়নি। এখানে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখা যেতে পারে, বাঁকুড়ার ওই বেলিয়াতোড় অঞ্চলেই জন্মেছিলেন বাংলার অন্যতম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়।

আমরা যখন এম এ পড়তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম, অধ্যাপক দাস তখন সবচেয়ে সম্মানজনক 'রামতনু লাহিড়ী প্রফেসর' পদে ব্রত সেই সময় বাংলা বিভাগের প্রধান আর-এক দিকপাল অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে অধ্যাপক দাস বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজে এবং ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত টানা আঠাশ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজ, মৌলানা আজাদ কলেজসহ বিভিন্ন সরকারি কলেজে পড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ

ছিলেন ওঁর সমগ্রজীবনের প্রধান চর্চার বিষয়। অধ্যাপক দাসের রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রচর্চার প্রথম ডি লিট উপাধিতে ভূষিত গ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর চিত্তগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার প্রমুখ গ্রন্থ আজও প্রাসঙ্গিক ও অবশ্যপাঠ্য।

আমার যতদূর মনে আছে, 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হিসাবে ওঁর আলাদা একটা বসার ঘর ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে আসতেন। নীরবে ওই ঘরে বসে বই পড়তেন বা লিখতেন। আমাদের পড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ চিত্রা। কবির এই চিত্র-বিচিত্র, অপরূপ, জনপ্রিয়, বহুপঠিত কবিতাসম্ভারে পূর্ণ কাব্যগ্রন্থটি তাঁর পড়ানোর গুণে মনে হত এক অনবদ্য জগতের দরজা খুলে দিচ্ছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার নানা শ্রেষ্ঠফসল এই কাব্যগ্রন্থে আছে। যেমন 'এবার ফিরাও মোরে', 'উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'সিন্ধুপারে' 'দিনশেষে', 'জীবনদেবতা', 'বিজয়িনী', 'চিত্রা' প্রভৃতি দর্শনঋদ্ধ কবিতা। তেমনই আছে 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি জনমনোরঞ্জক পদ্য।

অধ্যাপক দাস স্বভাবতই এম এ ক্লাসের জন্যে রবীন্দ্র-ভাবনায় আকীর্ণ কবিতাগুলিকেই বেছে নিয়েছিলেন। আমাদের কবিতার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন-কাঠিন্যের প্রাচীর ভেঙ্গে, সহজ বোধ ও অনুভবের পথে। অধ্যাপনার উচ্চমানে 'বিজয়িণী' কবিতাটির অন্তর্লোকটিকে, ছবির মতো মনের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও যেন শুনতে পাই ওঁর অনুচ্চ সেই কণ্ঠস্বর – অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন/ নামিলা স্নানের তরে বসন্ত নবীন ....'। কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর অভিনিবিষ্ট ভাষণে। 'সিন্ধুপারে' কবিতায় শেষ স্তবকে এসে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যেঃ 'চকিত নয়নে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে-/ 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা।' কহিনু নয়নজলে। / সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধা-ভরা আঁখি- / চিরদিন মোরে হাসালে কাঁদালে, চিরদিন দিল ফাঁকি।"

চল্লিশ মিনিটের একটি ক্লাসে শেষ হয়নি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার অপূর্ব ব্যাখ্যা। কয়েকটি ক্লাস ব্যয়িত হয়েছিল। 'সংসার তীরে' ফিরে আসার জন্য কবিতা যে-তীব্র আকুতি, তা অধ্যাপক দাস যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই হলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি অকপটে বলতে পারেন, 'এ দৈন্য-মাঝারে, কবি, একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি .../ এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে/ হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলোয়ো না

সমীরে সমীরে/ তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।' রবীন্দ্রনাথ যে সকল মানুষের আত্মার আত্মীয়- এই সত্যটি প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কবিকে তিনি কাব্য-কল্পনার ঘন অরণ্য থেকে, জীবনবিযুক্ত বাণীবন্দনা থেকে, ফুলের সুবাস থেকে বের করে এনেছিলেন। অধ্যাপক দাসের ক্লাসে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম।

ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ কখনও গড়ে ওঠেনি। টেমার লেনে থাকতেন। একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট বাড়িতে। তখনও টেমার লেনে শতাধিক প্রকাশনা সংস্থার অফিস গড়ে ওঠেনি। একটি কি দু'টি স্বনামখ্যাত পুস্তক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ছিল টেমার লেন। ওই বাড়িটিতে অধ্যাপক দাস সম্ভবত ভাড়া থাকতেন। সাহস করে কখনও ওঁর কলকাতার আবাসে যেতে পারিনি। শুনেছিলাম, কৃষ্ণনগরেও তাঁর একটা বাড়ি আছে। সেই বাড়ি যখন তৈরি হচ্ছিল, সেই সময় সিমেণ্ট, ইট, লোহা ইত্যাদি চোরদের চৌর্যবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে, নির্মীয়মাণ বাড়ির গায়ে তিনি একটি বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে নাকি লেখা ছিলঃ দুঃস্থ শিক্ষক বাড়ি তৈরি করছেন। চুরিবিদ্যায় যাঁরা পারঙ্গম, তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এই শিক্ষককে দয়া করুন।

এ গল্পের সত্য-মিথ্যা আমি জানি না। তবে সর্বদা খাদির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরতে ওঁকে দেখেছি। বাহুল্যহীন পোশাক। ততোধিক চোখে না-পড়া একজন মানুষ। পাণ্ডিত্যের অহংকার ছিল না, তবে মনের মধ্যে কোথাও অভিমান ও ক্ষোভ ছিল- বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রাপ্য সম্মান পাননি, অন্তত যতটুকু ওঁর পাওয়া উচিত ছিল। আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, উনি বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বস্তির কথা এই যে, বাম বুদ্ধিজীবীদের প্রবল ভিড় ও ঈর্ষার আগুনে ওঁকে দগ্ধ হতে হয়নি। বাম আমলের আগে যেমন বহু পুরস্কার পেয়েছেন, তেমনই বাম আমলে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও রবীন্দ্র-পুরস্কার। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন প্রাপ্য সম্মান।

আমরা যখন স্নাতকোত্তর কোর্সের শেষ বছরে পৌছলাম, তখন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করলেন। বিভাগীয় প্রধানরূপে আসীন হলেন অধ্যাপক দাস। বাংলা বিভাগের আলাদা অস্তিত্ব থাকলেও, আদতে এটি ছিল একটি উপবিভাগ। কেননা তখন বাংলা ছিল অফিশিয়ালি ' ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' এর অধীনস্থ। আবার এই বিভাগের অধীনে বাংলার মতো ছিল উর্দু, ফারসি, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি উপবিভাগ। উর্দু উপবিভাগটি ছিল বাংলা ক্লাসরুম অঞ্চলের পাশেই। অন্যান্য উপবিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।

হিন্দি বিভাগটি সম্ভবত ছিল স্বতন্ত্র। অধ্যাপক দাস কীভাবে এত বড় বিভাগ পরিচালনা এবং দেখভাল করতেন জানি না। তবে সব উপবিভাগগুলির প্রধান হিসাবে ওঁর শান্ত, বিনম্র, নিভৃতচারিতাই ছিল শেষকথা।

আমাদের এম এ ফাইনাল পরীক্ষার সিট সে বছর-পড়েছিল বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষার দিন একটা দুঘটনা ঘটে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলে। কর্তৃপক্ষ ভাষাতত্ত্বের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ পত্রের প্রশ্ন। হইহই বাধিয়ে দিল পরীক্ষার্থীরা। বিভাগীয় প্রধান তখনও পরীক্ষাস্থলে এসে পৌঁছননি। এতে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। খবর পেয়েই তিনি ট্যাক্সি করে চলে এলেন। প্রধান ফটক পেরিয়ে অধ্যাপক দাস ঢুকতেই আমরা তো রাস্তাতেই ওঁকে ঘিরে ধরে চিৎকার- চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম ক্ষোভে ফেটে পড়ল সকলেই। ততক্ষণে অনেকটা সময়ও পার হয়ে গেছে। এদিকে, ত্রিপুরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-শাখাটি তখন ছিল, সেখানে বিলি হয়ে গেছে ভাষাতত্ত্বের প্রশ্নপত্র। সেখানকার পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে শুরুও করে দিয়েছে। তার মানে প্রশ্ন বাইরে প্রকাশিত হয়ে গেছে। অতএব ওই একই প্রশ্নে আর পরীক্ষা নেওয়া যায় না। শুধু এদিকে নয়, আইনেও আটকে গেল আমাদের পরীক্ষা।

ওই তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে দেখেছিলাম, অধ্যাপক দাসের মুখ থেকে প্রসন্নতা মুছে যায়নি। হাসিমুখে সমস্ত দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন। বলছেন, বিভাগীয় প্রধান হিসাবে এ আমারই দোষ। আমার দেখা উচিত ছিল। করণিকের ভুলের জন্যে তোমাদের যে অসুবিধে হ'ল, তার জন্য আমি শুধু দুঃখিত নই, কষ্ট পাচ্ছি। ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষার তারিখ আমি কালকেই জানিয়ে দেব। তারপর তোমাদের ছুটি। আমারও ছুটি।

স্পেশাল পেপারের দু'টি ভাগের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরদিনই, বিঘ্নিত পত্রটির পরীক্ষা নির্বিঘ্নে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। পরে জেনেছিলাম, আগের প্রশ্নপত্রটির সামান্য রূপান্তর ঘটেছিল মাত্র। এখনকার মতো যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকত, তা হলে ত্রিপুরার প্রশ্ন আমাদের হাতে চলে আসত এক লহমায়। আমরাও ভাল নম্বর পেতে পারতাম। কিন্তু সেই আশি সালে এমন সম্ভাবনার কোনও জন্মই হয়নি। ত্রিপুরায় দেওয়া প্রশ্ন কেউ জোগাড় করতে পেরেছিল বলেও শুনিনি। ঘটনাটির মধ্যে দুর্যোগ ও কৌতুক মিশে আছে। তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগের কথা, তাই আজও ভুলিনি।

অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক পরিস্থিতিকে কত শান্ত স্নিগ্ধ ও অপার ধৈর্যে শমিত করতে হয়, তা সেদিন ওঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বিস্মিত হয়েছিলাম ছাত্রবৎসল, যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটিকে দেখে। সম্ভবত ১৯৯৮ সালে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলেই ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। চিনতে পারেননি। পরিচয় দিতে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন শীর্ণকায় বৃদ্ধ অধ্যাপক। প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, চিত্রা কাব্যের ' মৃত্যুর পরে' শীর্ষক কবিতার সেই শব্দ দু'টি এখনও আপনাকে ঘিরে আছে- 'জ্যোতির্ময় উজ্বলতা'।

-o-

আচার্য-কাহিনী

মণিদীপা দাশ

বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হ'য়ে একদল সদ্যতরুণী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়তে গেছিলাম। দিদিমণিদের কাছে পড়েছিলাম এযাবৎ- তাঁদের শাসন ও আদর কপালে জুটেছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ। তাঁরা ছিলেন অনেক কাছের মানুষ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ান- তাঁরা একটু দূরবর্তী।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস কিন্তু আলাদা। কারণ উনি ছিলেন আমাদের বেথুনে অধ্যাপিকা, প্রিয় বাণী মঞ্জরীদি-র শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব। এটাকে ঠিক পরিচিতিসূত্র বলা যায় না, তবু এভাবেই আমরা মাস্টারমশায়ের কথা জানতাম তাঁর লেখা অনেক বই, যেমন, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, বৈষ্ণব রসপ্রকাশ, আমরা লাইব্রেরি থেকে তুলতাম, এবং লব্ধজ্ঞান পরীক্ষার খাতায় উগ্‌রে দিতাম। অতএব মাস্টারমশায় বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা আমাদের ছিলই। স্নাতকোত্তর ক্লাসে যখন হাজির হ'লাম, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রা কাব্যগ্রন্থটি পঠন পাঠনের মাধ্যমে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমাদের প্রথমবার প্রত্যক্ষ ইণ্টার-অ্যাকশন ঘটল।

উনি কিন্তু ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়াতেন না। জীবনদেবতাতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে, সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত পংক্তিটি- 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী'- উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন-

" কে এই সুন্দরী, যে কবিকে নিয়ে যাচ্ছে? এ কি পুলিশ?

নিজস্ব আড্ডায় আমরা এই ধরনের প্রশ্ন করতাম পরস্পরকে- কিন্তু এত সহজে স্যারের মুখে একই কথা শুনতে পাবো- এটা ভাবিনি। অথচ উনি এই সহজ পথ ধরেই কঠিনে নিয়ে গেলেন ছাত্রছাত্রীদের- এবং খুব যুক্তিসিদ্ধভাবে বোঝালেন তাঁর ধারণায় জীবনদেবতার স্বরূপ। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবার জন্য, অপর এক উদাহরণ উদ্‌ধৃত করেছিলেন গীতাঞ্জলি থেকে-

'নিশার মত নীরব ওহে

সবার দিঠি এড়াতে এলে'-

এবং তার পরে অনিবার্য প্রশ্ন ছিল-

'এ-ই বা কে? এ কি চোর?

এখন ভাবলে অবাক লাগে, যে, প্রশ্নগুলো মাস্টারমশায় নিজেই উত্থাপন করতেন এবং নিজেই ব্যাখ্যাময় উত্তর দিতেন। প্রথাবদ্ধতা মোড়কের বাইরে গিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যে, জীবনদেবতা কেমন বিনা আড়ম্বরে কবির জীবনে আবির্ভূত হ'ন এবং কী ভাবে তাঁর সাহিত্যিক মননকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নেন। তখন তিনি যা বলান, কবি তাই-ই বলেন- 'তুমি যা বলাও- আমি বলি তাই। পরবর্তী জীবনে জীবনদেবতাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক কিছু পড়েছি- কিন্তু ঐ প্রথমবারের বুঝতে পারাটাই মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

ক্লাসরুমের বাইরের কথা যখন ভাবি, তখন মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছোটোখাটো চেহারার সদাচঞ্চল মাস্টারমশায়কে। শতকরা একশোভাগ জীবনীশক্তিতে ভরা ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শত শত প্রশ্ন এবং তার কাছ থেকে সহস্র প্রকার উত্তরপ্রাপ্তি- এ আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। 'রামতনু লাহিড়ী-র নামাঙ্কিত অধ্যাপক পদে তিনি অবস্থান করতেন-আমরা, ছাত্রছাত্রীরা ভাবতাম, যে, এ নিশ্চয় সাধারণ অধ্যাপকদের চেয়ে খানিকটা উঁচু পোস্ট-ই হবে। মাস্টারমশায় কিন্তু এই উচ্চ-অবস্থান এবং তজ্জাত দূরত্বকে ততটা মান্যতা দিতেন বলে মনে হয়না।

যে সময়ে উনি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে খুব সহজেই বলা যে, যে, সিলেবাসের কোন কোন অংশ তখনও পড়ানোই হয়নি, অথবা, কোন অংশগুলি পড়ানো হলেও আমরা ঠিকমত বুঝতে পারিনি।

হয়তো, এইসব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উনি একবার সব ছাত্রছাত্রীকে একটি ফিড্‌ব্যাক ফর্ম পূরণ করতে দিয়েছিলেন- যাতে অধ্যাপকদের পাঠদান বিষয়ে তারা মতদান করল। প্রথাটি অবশ্য, কোনো অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। তবে, আজকে, শিক্ষকতার জগতে বহুদিন কাটাবার পর বুঝি, যে আমাদেরও মূল্যায়ন প্রয়োজন-আমাদের খাম্‌তি আমাদেরও জানা দরকার। বর্তমানে, সমস্ত কলেজেই এখন ছাত্রছাত্রীরা এ জাতীয় ফিড্‌ব্যাক ফর্ম পূরণ করে আর ওর দ্বারাই 'শিক্ষাদান' প্রক্রিয়াটা, তাদেরও আর একপ্রকার অংশগ্রহণ ঘটে। শিক্ষক পড়াচ্ছেন- ছাত্ররা কিছু বুঝতে পারছে না, এবং সেকথা মুখ ফুটে বলতেও পারছে না- এমন পরিস্থিতি বহুদিন যাবৎ বজায় ছিল। আমাদের মাস্টারমশায় সেই অচলায়তনের মধ্যে মুক্তধারা আনতে চেয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনার কথাও বলতে চাই। আমাদের ছাত্রাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষাগুলি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পায় দু'বছর পিছিয়ে গেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে তা এগিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৭৯ সালে, যে এম এ -র ক্লাস শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালের একেবারে শেষের দিকে। কর্তৃপক্ষ চাইলেন এই ব্যাচটি পরীক্ষা ১৯৮০ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হ'য়ে যাক, ছাত্রছাত্রীর সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ল- কারণ, তাদের সময় অত্যন্ত কমে গেল। তখন আমরা, বাংলা বিভাগের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মাস্টারমশায়ের (অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধানের) কাছে দরবার করলাম পরীক্ষা পিছোনোর জন্য- এবং ব্যর্থ হ'লাম। হঠাৎ এক ছাত্র বলে বসলো-

"তাহ'লে আমরা আপনাকে ঘেরাও করবো স্যার।"

উনি নির্বিকার গলায় বললেন- "করো।"

আমরা সবাই ওঁকে ঘিরে মাটিতে বসে পড়লাম। উনি নিরুদ্বেগে নিজের কাজ করেই যেতে লাগলেন। সময় বয়ে যেতে লাগলো। ঘণ্টাখানেক বাদে সকলের মনে হ'ল যে, অকারণে সময় নষ্ট হচ্ছে। অফিসিয়ালি ঘেরাও তুলতে গেলে কি কি করতে হয়-কারুর জানা নেই। সবাই উসখুস করতে লাগল। শেষকালে এক ছাত্রী করুণ গলায় বলল-

"ও স্যার আমাদের অবস্থাটা একটু বুঝুন না"

ওই তো –উনি বলেছেন 'দেখছি'- তাহ'লে কিছু একটা হবেই- ঘেরাও পার্টি টপাটপ উঠে পড়ল। ঘেরাও শেষ। অতঃপর, কয়েক দিনের মধ্যে নোটিশ এল,

যে বাংলা এম এ প্রথম পত্রের পরীক্ষা ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে। এ বিষয়ে নিশ্চয় কণ্ট্রোলার অফ এক্জমিনেশনের প্রধান ভূমিকা ছিল- কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে মাস্টারমশায় আমাদের কথা ভেবেই এটা করেছিলেন।

শিক্ষকদিবস আগতপ্রায়। প্রথাগতভাবে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দিন। সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁদের প্রতি আমরা সদাই শ্রদ্ধাবনত- আমাদের জীবনবোধ গড়ে দিয়েছেন তাঁরা। এই অনুষঙ্গে মাস্টারমশায়ের কথা খুব মনে পড়ে। নিজেও শিক্ষকতা করছি বহুদিন। ওঁর মত শিক্ষক হ'য়ে ওঠবার পথে হাঁটতে পেরেছি কি না, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা –অসুবিধার খবর রাখতে পেরেছি কি না, - জানি না, আসলে এ যেন এক শাশ্বত সারস্বত পরম্পরা- বড়দের কাছে শিখতে হয় এবং ছোটোদের শেখাতে হয়। ভাবতে ভালো লাগে, যে, আমরা সকলে সেই পরম্পরায় বাঁধা পড়ে গেছি।

-o-

স্যারের সঙ্গে কয়েকদিনের অমলিন স্মৃতির ক-টি পাতা

অশোককুমার মিশ্র

গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছি কোলকাতায় বিশ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা স্নাতকোত্তরে পাঠ নিতে। ঘরে বিজলিবাতি নেই, অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের যে ঘাটাল কলেজে পড়েছি সেখানেও তখন বিদ্যুৎ থাকতো ছাদের উপরে বর্ষার আকাশে। ফ্রাঙ্কলিনের কায়দায় সুতোয় করে সে বিদ্যুৎ ধরা যায় কিনা সে ভাবনায় অধীর থাকতো ক্লাস থ্রি ফোরের ছাত্রছাত্রীরা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠে পা দিয়ে গ্রামের ছেলে বলে দুরুদুরু বুকে যখন বিভাগীয় গ্রন্থাগারের এক কোণে বসে অন্তরাল খুঁজছি সে সময় ঝড়ের বেগে এক বেঁটেখাটো চেহারার ধুতি পাঞ্জাবি পড়া মানুষ ঢুকলেন। অসাধারণ প্রাণবন্ত, গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। জানলাম ইনিই ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র গবেষণায় বাংলা আলোচনা সাহিত্যের জগতে নতুন রক্ত এনেছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়ে। নানামুখী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে রাঙামাটির দেশ বাঁকুড়ার বেলেতোড় থেকে উঠে এসেছেন বিদ্যার এই পবিত্র-তীর্থে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হয়ে।

গ্রন্থাগারিক সুকুমারবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'শুনলাম তোমাদের মধ্যে কেউ নাকি ঘাটাল থেকে এসেছ? আমি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনলাম তোমার কথা। একটু বাইরে এসো তো কথা আছে।' বাইরে বেরোতেই তিনি সরাসরি জানতে চাইলেন 'যেতে পারবে তুমি আমার সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য?' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই তিনি হালকা স্বরে বললেন 'জানতে চাইলে না তো কোথায় যাবো?' আপনার মতো এক মানুষ যখন যাচ্ছেন তখন নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। স্যার খুশি হয়ে জানিয়ে দিলেন তিনি যাবেন মুকুন্দের দামিন্যা থেকে তাঁর পলায়ন পথের সন্ধানে ব্রাহ্মণভূমি আরড়া গ্রামে। পাশের ঘরে ডাকলেন আমার দেখি আমার পূর্ব পরিচিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রণব রায় বসে, তাঁর সঙ্গে এসেছেন ফটোগ্রাফার বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের যাত্রা হলো শুরু, কর্ণধার ডঃ দাস সে সময় (১৯৭৭) বাসে ট্রেনে যাতায়াত করতে হতো স্যারের মতো বিখ্যাত পণ্ডিত মানুষকেও, গাড়ি-ট্যাক্সির চল ছিল তখন বড়লোকদের পাড়ায়, বড় মানুষদের পাড়ায় নয়। স্যার আগেভাগে একটা খসড়া করে নিয়েছিলেন। সে পরিকল্পনা মতোই আমরা চললাম ট্রেনে, হাওড়া থেকে তারকেশ্বরে পৌঁছলাম দুপুরে। পাইস হোটেলে চারজন ভাত খেয়ে রওনা দিলাম তারকেশ্বর-আরামবাগ বাসে। নামলাম চাঁপাডাঙা পেরিয়ে। স্যারের বড় টান মিষ্টির প্রতি। শুনেছিলাম ওখানের মুগের জিলিপি নাকি বিখ্যাত। বললেন 'যাত্রা করার মুখে মিষ্টিমুখ ভালো কি বলো?

জিলিপি খেয়ে কিছুটা রিক্সায় কিছুটা হেঁটে আমরা পৌঁছলাম দামিন্যার সীমানায় ভেলিয়া গ্রামে। সারদামণিকে নিয়ে শতবর্ষ প্রাচীন বিখ্যাত গল্প আছে এই গ্রাম ও তার মাঠ তেলোভেলোর মাঠকে ঘিরে। এখনো রয়েছে সেই কালীমন্দির, সেই আটচালা, চারপাশ অন্ধকার-করা ডালপালা মেলা বটগাছ। যাদের বাড়িতে উঠে দাওয়ায় বসেছিলাম তারা এককালে নাকি ডাকাত ছিল। সারদামায়ের ছোঁয়ায় বদলে গেছে তারা। ভেলিয়া গ্রামের চৌহদ্দি ঘুরে স্যার কিছু নোট নিলেন। আমরাও নিলাম। বাসদেবপুর চণ্ডীবাটী গ্রাম পেরিয়ে আসার সময় কয়েকজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। জাওয়া-আসার পথে প্রায় জলহীন মুড়াই নদী আর নারায়ণ নদীর উপর দিয়ে এলাম। বাসে করে এলাম আরামবাগে, সেখান থেকে দ্বারকেশ্বর নদী পেরিয়ে গেলাম কামারপুকুরে সেখানেই প্রথমদিনের যাত্রা বিরতি।

প্রথমদিনের যাত্রায় মুকুন্দ বর্ণিত দামিন্যা, ভেলিয়া, চণ্ডীবাটী, পাতুল, গুচুড়ে গ্রামগুলিকে স্পর্শ করা গেল। কিছু পরিবর্তন হলেও গ্রামগুলো তখনো তাদের গ্রামীণ চরিত্র হারায়নি।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণমিশনে জিনিসপত্র রেখে স্যার বললেন 'চলো অশোক, কিছু কাজ আছে।' আমি আর স্যার বেরোলাম কামারপুকুর বাজারে।

স্যার টেলিফোন বুথ থেকে একটা ফোন করে বেরিয়ে এসে যেন শিশুর মতো নির্মল প্রাণখোলা হাসলেন। বললেন 'কাল ভোর পাঁচটায় বেরোবো, এখানের শুকনো বোঁদের নাকি খুব নাম'। বিস্মিত হয়ে আমি বললাম 'এসময় বোঁদে খাবেন স্যার?' প্রণববাবুরাও এসে গেছেন সবাই মিলে অগোছালো মিষ্টির দোকানে বসে মৌমাছির দলের না-আক্রমণ করার ব্যাপারে দোকানির আশ্বাসে গুছিয়ে বোঁদে খেলাম। স্যার মজা করতে ভালোবাসতেন খুব, সে মজায় থাকতো শিশুর সারল্য। যেমন কৃষ্ণনগরে একদিন মাছ কিনছেন, আমিও আছি সঙ্গে। মেছুনি মাছের দাম দশ পয়সাও কমাবে না, স্যার জানতেন তা- তবু দর করেই গেলেন। পয়সা দেবার সময় দশ পয়সা কম দিয়ে হাঁটা শুরু করে দিলেন। মেছনি পেছু পেছু ছুটে এলো। স্যার হাসতে হাসতে তাকে একটা সিকি দিয়ে এগিয়ে গেলেন, সে বলল বাবু ফেরৎটা। স্যার হেসে বললেন তুই নে।

কাজ না থাকলেও সাতটা থেকে প্রায় একঘণ্টা এদিকসেদিক ঘুরলেন। তারপর বললেন এবার ফিরে গেলেই হবে। মিশনে ফিরেই বুঝলাম কিছুটা। দারোয়ান স্যারকে জানালো কিছুক্ষণ আগে মহারাজ নিজে স্যারের খোঁজ নিতে এসেছিলেন, তাকে নাকি বিশেষ নির্দেশ দিয়ে গেছেন স্যারকে দেখতে, রাতে তিনি যতক্ষণ খুশি আলো জ্বেলে কাজ করতে পারেন। শুধু তাই নয় খাবার সময় পাশে খেতে বসলেন। এমন কি ভোর পাঁচটায় তিনি স্যারকে বিদায় জানাতে এলেন। মহারাজ আমার খোলা মনের স্যারকে বোধ হয় সেভাবে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেননি, বাসে চেপে যে মাস্টার আসে সে আবার-। বুঝলাম ফোন করে স্যার তাঁর ছত্র বি কে রায়কে মিশনে আসার কথা জানিয়েছেন, মহারাজও জেনে গেছেন যিনি তার গৃহে এসেছেন তিনি বিশেষ অতিথি।

কামারপুকুর থেকে বি কে রায়ের পাঠানো জিপে মাঠের ভেতর দিয়ে চললাম। ধান কাটা শুকনো নাড়াভর্তি জমির আলকেটে গরুরগাড়ি যাবার রাস্তা, প্রায় নৃত্যরত হয়ে চললাম। শুকনো নারায়ণ নদী পেরিয়ে পাতুলকে বাঁ দিকে রেখে আমরা উঠলাম রামজীবনপুরের বাজারের কাছে। একটা ছোট মিষ্টির

দোকান দেখে স্যার গাড়ি থামালেন। বললেন 'এখনকার আমুয়া ছানার রসগোল্লা নাকি বেশ'। অতএব শুরু প্রাতরাশ, টাটকা রসগোল্লা দিয়ে। কলেজ স্ট্রীটে হলে স্যারের ব্রেকফাস্ট কচুরি আর জিলিপির দিকে পাল্লা ভারী হত।

রামজীবনপুর থেকে রওনা দিলাম, গাড়ি চললো শ্রীনগর, বামারিয়া হয়ে ক্ষীরপাই হালদার দীঘি। এখান থেকে আমাদের গতিমুখ ডানদিকে বাঁক নেবে কিন্তু এ জায়গাটা আর একটি কারণে বিখ্যাত তা হলো এখানে বাবরসা নামে এক সুস্বাদু মিষ্টি তৈরি হয়। তাই থামতে হল। আমার বাবা শ্যামরেণু মিশ্র আমাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করছিলেন স্যারকে সেরা দোকানের বাবরসা খাওয়াবেন বলে। স্যার সে দোকানেই খেলেন কিন্তু বাবার শত অনুরোধেও তাঁকে দাম দিতে দিলেন না।

আমাদের নিয়ে গাড়ি ছুটলো আবার। ক্ষীরপাই মনসাতলার চাতাল, বাঁকা, জয়ন্তীপুর, চন্দ্রকোনা টাউন, গাছশীতলা মোড়, হয়ে গাড়ি চললো গোদাপিয়াশাল পেরিয়ে চন্দ্রকোনা রোড, স্টেশন পেরিয়ে গড়বেতার রাস্তাকে ডানদিকে রেখে আমরা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে চললাম শালবনীর দিকে। এই যাত্রাপথে আমরা পেরিয়ে এলাম আমোদর নদ, পরাশর নদী, শিলাই নদী। এরপর কুবাই নদী পেরিয়ে প্রধান শিক্ষক কামনা সরকারের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ইতোমধ্যে ওই এলাকায় শ্রী রাধারমণ সিংহ, কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী প্রমুখ আরো কিছু গুণী মানুষ আমাদের সঙ্গে এসে পৌঁছলেন এই বাড়িতে। শালবনী থেকে কয়েক মাইক জঙ্গল পথে গেলে ব্রাহ্মণভূমি আরড়া গ্রামে যাওয়া যায়। সে সময় ঘরে ঘরে এত নিজস্বগাড়ি কিংবা ভাড়া গাড়ির প্রাচুর্য ছিল না। কামনাবাবু স্যারের কথা ভেবে তাঁর জন্য রিক্সা আর আমাদের জন্য কয়েকটা সাইকেলের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। একথা জানামাত্র স্যার তো রেগে আগুন। জোর করে আমার হাত থেকে সাইকেল কেড়ে নিয়ে চড়ে বসলেন তাতে। কামনাবাবু হতভম্বের মতো চললেন সাইকেলে তাঁর সঙ্গে, অনুসরণ করলাম্ আমরা। আমি আর রাধারমণবাবু সাইকেলহীন হওয়ায় অগত্যা রিক্সায় উঠে চললাম। স্যার গম্ভীরমুখে আগে আগে পেছনে আমরা অপরাধীমুখে। একটা ছোট শুখনো খাল পেরোতেই দেখি আবার সেই সদাহাস্যময় স্যারকে। হাসতে হাসতে বললেন 'কী ব্যাপার এত চুপচাপ কেন।' 'চুপচাপ আবার কেন আমি বছর বাইশের যুবক চলেছি রিক্সায় আর এই লালধুলোর পথে অনভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ষাটের প্রিয় অধ্যাপক চলেছেন সাইকেলে।' ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ফেরার পথে তাই আমাদের মুখরক্ষা করেছিলেন রিক্সায় উঠে।

প্রায় আধঘণ্টা রাঙামাটির পথে ধূলিধুসর হবার পর আমরা এক বিশাল পুকুরের পাড়ে গিয়ে থামলাম। জানা গেল এটাই সেই পুকুর যেখানে স্নান সেরে কবি মুকুন্দ শালুকপোড়া নৈবেদ্য দিয়ে চণ্ডীপূজা করেছিলেন। দেখলাম এক প্রাচীন বটগাছের নীচে চণ্ডীর দেউল, দেবী কবিকে কাব্য রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ দেন এখানে। কিন্তু অনেকদিনপর তাঁর ছাত্র রঘুনাথের আশ্রয়ে থেকে তার কথায় চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন মুকুন্দ।

প্রায় দিঘিতুল্য পুকুরের ওপারে আঙুল দেখিয়ে সঙ্গী বললেন, 'স্যার, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বর্ণিত কুঁয়াপুর গ্রাম ওটা।' তার বর্ণনা শুনছেন স্যার আর তাঁর চোখ শিশুর আগ্রহ-পুলকে তাকিয়েছিল দিঘির কাকচক্ষু জলের দিকে। বললেন, 'যদি একটা গামছা নিয়ে আসতাম মনে সুখে চান করে নিতে পারতাম।' তাঁর সে ইচ্ছাপূরণ হলোনা।

স্থানীয় একব্যক্তি আমাদের নিয়ে গেলেন কাল্কেতুর গড়ে। মাটির উঁচু স্তুপ দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গা, খোলামকুচিতে ভরা। এটাই কালকেতুর গড়। চারপাশে ছোট ছোট বুনো ঝোপ, কাঁটাবাঁশের ঝাড়। দূরে কেটেকেটে প্রায় সাফ হয়ে যাওয়া শালজঙ্গল। স্যার সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ফটো তুললেন। ডায়েরিতে কিছু লিখে নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

লালমাটির দেশে সূর্য বসলো পাটে আমারা ফিরে এলাম মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে। সেখানে সারা সন্ধ্যাজুড়ে স্যারের সংস্কৃত সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে আলোচনায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম।

ফিরে এলাম পরের দিন ভোরে। সঙ্গে সে যাত্রাপথের স্মৃতি। স্যারের চাপা হাসি চোখ না বুজিয়ে আজো দেখতে পাই। বহুদিন স্যার আমাকে নিয়ে গিয়েছেন এমন অনেক জায়গায় গ্রামের ছেলে আমি এই নির্বান্ধব শহরে তিনি হাত না ধরলে কোনোদিনই সেখানে যেতে পারতাম না।

-o-

মহাবিদ্যালয়ে তার ছাত্ররা

বাসুদেব সাহা
পবিত্রকুমার সরকার

প্রণামঃ আচার্য ক্ষুদিরাম দাস

বাসুদেব সাহা

আচার্য ডঃ ক্ষুদিরাম দাস একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। বহু বিখ্যাত অধ্যাপকের ছাত্র হওয়ায় আমি গর্বিত। অধ্যাপক সুকুমার সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, রথীন্দ্রনাথ রায়, ধীরানন্দ ঠাকুর, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি কৃতী অধ্যাপকদের ছাত্র হওয়ায় যেমন নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়, তেমনি ক্ষুদিরাম দাসের ছাত্র হয়েও আমি যেমন আনন্দিত তেমনি সৌভাগ্যবান এই সব বিখ্যাত অধ্যাপকদের কারও কারও কাছের মানুষ বা ছাত্র হতে পেরেছিলাম। খুশিভরা মন নিয়ে বলতে পারি অধ্যাপক দাসের অত্যন্ত কাছের মানুষ হতে পেরেছিলাম।

তাঁকে ঘিরে আমি এবং আমার বেশ কিছুদিন এক অনাবিল আনন্দে আলোকিত হয়ে আছে। একদিন সকালের দিকে বাড়ি থেকে বের হচ্ছি। বারুইপাড়া লেন থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণনগর স্টেশন মুখো যাচ্ছি কী একটা কাজে। হঠাৎই একটা রিক্সা থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল-ওরে আমার শরীর ভালো নেই। গলা শুনেই বুঝেছি, দেখলামও। কথাগুলো বললেন আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই। আমার প্রিয়জন, বিখ্যাত মানুষ ডঃ ক্ষুদিরাম দাস। পরে গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে । দেখা হয়েছিল। কথাও হয়েছিল।

প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই কাটাতেন এই অসাধারণ মানুষটি। ওঁরা তিনভাই। মধ্যভ্রাতা রামেন্দ্রকুমার দাস ছিলেন শক্তিনগর

উচ্চবিদ্যালয়ের ইংরাজি শিক্ষক। মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পরবর্তী কালে। তাঁকে নিয়ে চিন্তা ছিল ডঃ দাসের। ছোটো ভাই রামকুমার আমার দাদার সহপাঠী। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল। তিনিও ছিলেন অসুস্থ। মানসিক অসুস্থ। তাঁকে নিয়েও চিন্তা ছিল মাস্টারমশায়ের। কতদিন কত কথা বলেছেন আমাদের সঙ্গে, রামকুমারকে নিয়ে। কখনো সখনো তাঁর খোঁজ নিতে এসেছেন আমাদের রথতলার বাড়িতে।

অতিবড়ো মাপের মানুষ। শিক্ষায় আঙিনায় আলোকিত করে যাঁর অবস্থান ছিল উজ্জ্বল, তিনিও সাধারণ মানুষের মতোই এই সাংসারিক যন্ত্রণাকে নিজের করে নিয়ে কর্তব্য কর্মে ব্রত থাকতেন। আবার সভা সমিতি, সেমিনার ইত্যাদিতেও আন্তরিক ভাবে অংশ নিতেন বিশিষ্ট ভূমিকায়। তাঁর বক্তব্য হত পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সহৃদয় এবং মধুর। বহু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে উপভোগ করেছি তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। ধন্য হয়েছি তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে পেরে। দুবারের দুটো অনুষ্ঠানের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে সম্ভবত এই কারণে যে সেদুটোতে আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম অতিথিরূপে। আমন্ত্রণ পত্রে আমার নামও ছাপা হয়েছিল। একী কম সৌভাগ্যের, কম আনন্দের কথা।

নবদ্বীপে শিশুদের এক সভায়, সম্ভবত প্যাক কোম্পানিও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সে অনুষ্ঠানের সঙ্গে, মঞ্চে বসেছিলাম তাঁর পাশে, বিশিষ্ট অতিথি রূপে। কেন যেন ডঃ দাসকে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল নবদ্বীপ ভারত সেবাশ্রমের একটি ঘরে। আমাকেও যেতে হয়েছিল সেখানে। অনেকক্ষণ ছিলাম তাঁর পাশে। কত কথাই না শুনেছিলাম তাঁর কাছে। ধর্মবিষয়ক আলোচনা যা শুনেছিলাম তার মাত্রাও ছিল পৃথক। প্রসঙ্গত ভারত সেবাশ্রমের কথাও উঠেছিল। তিনি ওঁদের ভূমিকা সম্পর্কেও যে সচেতন ছিলেন তা তাঁর ব্যঞ্জনাময় কথাবার্তাতেই ফুটে উঠেছেল। কৃষ্ণনগরে রথতলায় এক রবীন্দ্রমূর্তি স্থাপন অনুষ্ঠানেও ক্ষুদিরাম বাবু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সভাপতি রূপে। আমাকেও যেতে হয়েছিল অতিথি রূপে। তাঁর সঙ্গে থাকায় আমার যে আনন্দ হয়েছিল এবং আমার যে গরিমাবৃদ্ধি হয়েছিল, সাধারণ মানুষরূপে বা লোভী মানুষের মন নিয়ে সে সব জানানোর জন্যই এসব লিখছি।

মানুষ হিসাবে তিনি যে মহান তা বলতেই বলি- তিনি থাকতেন কখনও কোলকাতায়, কখনও কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরে চৌধুরী পাড়ায় বাড়ি করেছিলেন। বাড়ি নয় যেন ছোট খাটো একটি আশ্রয়। যিনি না দেখেছেন তিনি কল্পনা করতে পারবেন না। গাছপালা, পুকুর সবই আছে সে বাড়ির। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শান্ত সুন্দর, মধুর সে বাড়ি।

ডঃ দাস কৃষ্ণনগরে এলে মাঝে মাঝেই যেতাম। যখন কৃষ্ণনগর কলেজেই অধ্যাপনা করতেন কখনও মাঝে মাঝে যেতাম নানা কাজে। পাড়ার পূজো বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর কাছে যাওয়া হত কিছু সাহায্য লাভের আশায়। আমরা যারা যেতাম, তাদের বসতে বলতেন নিজের ঘরে। সে ঘরে একটি চেয়ার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশেষ ছবি খুব বড়ো নয় কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরে আর যেত হত না, তিনি নিজেই পাঠিয়ে দিতেন অথবা নিজেই দিয়ে আসতেন সেই চাঁদা বা সাহায্য।

পরবর্তী কালে যখন কলকাতাতেই বেশি থাকতেন। আমরাও শিক্ষকতা করছি। তিনি খোঁজ রাখতেন আমাদের। আমার ছাত্রজীবনেও যেমন আমার মতো সাধারণ ছাত্র তাঁর মতো বিশিষ্ট অধ্যাপকের বিশেষ নজরের মধ্যেই থাকতো, পরবর্তী কালে তেমনি আমার কর্মময় জীবনেরও খোঁজ রাখতেন তিনি।

আমার ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার কথা বলি। সুহৃদ সংঘ গ্রন্থাগার গঠন পর্বে আমিও ছিলাম ঐ প্রতিষ্ঠানের কজন অতি সাধারণ কর্মী। সাধারণ কর্মী হলেও আমাদের উৎসাহ ছিল অসাধারণ।এক সময় ঐ গ্রন্থাগারের কাজ চলতো রথতলা নতুন বাজার অঞ্চলে শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক অর্ধেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি বাড়িতে। ওঁদের বাড়ির দেওয়ালে কৃষ্ণনগর কলেজে ছাত্র আমি লিখছি ঐ গ্রন্থাগারের নাম। মোটামুটি বড়ো অক্ষরে, সাইনবোর্ড লেখার মতো করে। তখন ক্ষুদিরাম বাবু যাচ্ছেন বাজার করতে। বাজারে যাওয়ার জন্য বিশেষ পোশাক পরে সেজেগুজে বাজারে যেতে কোনোদিন দেখিনি। বাড়িতে থাকতেন যে পোশাকে, সেই পোশাকেই যেতেন বাজারে। গেঞ্জির পরে একটা জামা পরতেন শুধু। দু'একদিন গেঞ্জি পরেও দেখে থাকতে পারি। আর পরতেন ধুতি, লিঙির মতো করে অথবা লুঙি। নিতান্তই সাধারণ।

যা বলছিলাম, লিখছি সুহৃদ সংঘ গ্রন্থাগারের নাম। বাজারে যাওয়ার পথে অধ্যাপক দাস আমার কাছে এসে বললেন- ভালো, একাজ করছো এটা খুব ভালো, লেখাপড়াটাও এমনি আন্তিরকতা নিয়ে কোরো। ওকে দেখে উঁচু টুল থেকে নামতে গিয়েছে, উনি চলে গেলেন বাজারে। বলে গেলেন- কাজটাই বড়ো। দুঃখ হল প্রণামটাও করতে পারলাম না। দিলেনও না।

বাজারের কথা এল যখন, তখন একটা ঘটনার কথা না বলে পারছিনা। তখন আমিও একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছি, এই শহরেই। একদিন বাজারে গিয়ে দেখি এক মৎস্য বিক্রেতা অধ্যাপক দাসকে যেভাবে কোনো কথা বলছেন তা অসভ্যতারই নামান্তর। সম্ভবত মাছ নিয়েই কিছু হয়েছে। সে সব

কথার বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে মৎস্য বিক্রেতার কথা ভঙ্গিটার বিষয়ে বললাম- কার সঙ্গে ও ভাবে কথা বলছেন তা কি জানেন। আমাদের দেশে ঐ মানুষকে এক ডাকে প্রায় সবাই চেনে। সম্মান করে। ভালোও বাসে। বলে ওঁর একটু পরিচয় দিলাম যখন তখন তিনি সেই মৎস্য বিক্রেতা ক্ষমা চাইলেন তার কাছে। মাস্টার মশাই আমার দিকে একবার তাকিয়েই চলে গেলেন।

তিনি কৃষ্ণনগরে থাকলে মাঝে মাঝেই দেখা হত পথে। সাইকেল থেকে নামতাম প্রণাম করতাম। বলতেন ওভাবে নেমো না পথে, বিপদ ঘটতে পারে ওঁর সঙ্গে পথেও কথা হত। হাঁটতে হাঁটতেই কথা। লেখাপড়ার বিষয়েই বেশি কথা। সব কথা লেখার সুযোগ যেমন এখানে নেই, তেমনি ঠিক ভাবে লেখার ক্ষমতাও আমার নেই। তবু দুএকটা কথা লিখি। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম – স্যার, আকাদেমির বাংলা বানান বিধিতে সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত শব্দটিকে দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত বাংলা শব্দ ঘরে নিয়ে সমাস হলে ও তার দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না, তাই আগামীকাল, পরবর্তীকাল, মন্ত্রীসভা, শশীভূষণ রূপেরই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার মত কী তিনি বিষটি সমর্থন করলেন। বললেন-সংস্কৃত মূল 'শশিন' কে বাংলায় 'শশী' রূপে আমরা ব্যবহার করি। সমাস কালেও তা সংস্কৃত নিয়ম বাদ দিয়ে বাঙলা মূল শব্দটি শশী ধরে নিয়ে 'শশীভূষণ' কথাটি এই বানানেই লেখা হবে। তিনি তাঁর ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লেখা ব্যাকরণিকা গ্রন্থের (এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা লি প্রকাশিত) নবমপাঠে 'পুরুষ নির্ণয়' প্রসঙ্গ প্রতিযোগিতা বানানটিকে প্রতিযোগিতা বানানেই লিখেছেন। সেখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে ফুট নোটে আধুনিক বানানের নিয়মে অনুরূপ গুণীগণ, রথীবৃন্দ মনস্বীতা প্রভৃতি লিখেছেন।

ওঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম- 'সুপ্তোত্থিত' সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য-সুপ্তি থেকে উত্থিত না হয়ে আগে সুপ্ত পরে উত্থিত হল কেন? তিনি বললেন – সুপ্ত অবস্থা থেকে ওঠার কথা বোঝাতেই এমন করা হয়েছে। 'ঘুম' থেকে নয় ঘুমন্ত অবস্থা থেকে ওঠার কথা বোঝানো হয়েছে তাই। (সাধারণ ভাবে লোকে অবশ্য ঘুমন্ত অবস্থা বোঝাতে 'ঘুম' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে) এমন করে কেউ আমাদের ক্লাশে বুঝিয়েছেন বলে তো মনে পড়ে না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম – সমাসের ক্ষেত্রে 'পঙ্কজ' শব্দটিকে (পঙ্ক-জন + ড কর্তৃ) উপপদ তৎপুরুষ বলা হয়। তবু শব্দটি কি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়? এর অর্থ তো পদ্ম কর্দমজাত হয়। বললেন বহুব্রীহি হতে পারে কিন্তু যেহেতু উপপদ তৎপুরুষের নিয়মেও পড়ে যাচ্ছে, তাই তাকে উপপদ তৎপুরুষই বলা হয়। অবশ্য এসব আলোচনা আমাদের ভাষায় তেমন হল কই।

সুনীতিবাবু সুকুমার বাবুরাই করে গেলেন না। করলে ভালো হত। বললাম- স্যার আপনি? বললেন –আমার সে বলে যোগ্যতা কোথায়। আর কিছু বলতে সাহস পাইনি।

তিনি অবশ্য কিছু স্কুল পাঠ্য ব্যাকরণ বই প্রকাশকদের অনুরোধে লিখে দিয়েছিলেন। সেখানে এজাতীয় আলোচনার অবকাশ ছিল না। ছিল না কোনো গবেষণামূলক কিছু লেখার সুযোগ।

কোনো প্রকাশকের অনুরোধে তাঁর ঐ সব ব্যাকরণ বইতে কোনো সহ লেখকের নাম রাখার কথা ভাবা হয়। সে নামটি অবশ্যই কোনো স্কুল শিক্ষক মশায়ের হওয়া চাই। মাস্টারমশাই আমাকে তাঁর কোনো ব্যাকরণ গ্রন্থের সহ লেখক হতে বলেছিলেন। শুনে খুশি হলেও আমার সে সাহস হয়নি।

তিনি বলেছিলেন তুমিও কিছু কিছু লেখো সে বইতে। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, কেননা আগে থেকেই কোনো কোনো ব্যাকরণ গ্রন্থের সহ লেখক বা লেখক হতে হয়েছিল। দুঃখ হয়েছিল তাঁর কথায় সম্মত হতে না পেরে। পরে তাঁর অভিধান সম্পাদনার কাজে টুকটাক কাজ করে দেবার জন্যও ডেকেছিলেন। প্রথমে যেতে সাহস হয়নি। কারণ সে শক্তি আমার ছিল না। পরে আবার ও ডাক পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। বলেছিলাম, অভিধান রচনায় আপনাকে টুকটাক যা করে দিতে বলবেন, তা করার চেষ্টা করবো। নচেৎ তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে সহায়তা করার কথা বলার যোগ্যতা কোথায় আমার? সে সাধ্য দেখাবোই বা কেমন করে! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কিছুকাল পরে। অভিধান বিষয়ে তাঁর আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারা হয়নি আমার।

তিনি চলে গেছেন। তবুও আমরা তাঁকে যেন হারাইনি, তিনি আছেন আমাদের অন্তরে, আমাদের কাজের মধ্যে। তাঁর কাছেই তো শেখা – ঐ কাজ আমিই করতে পারি নয়, ঐ কাজ আমিও করতে পারি। কথাতেই চরিত্র বৈশিষ্ট্য কেমন করে ফুটে ওঠে তা তো তাঁর কাছেই শিখেছি।

কী স্নেহই না করতেন আমাদের। ছেলেবেলায় হাতে লেখা পত্রিকা 'অনির্বাণ' প্রকাশ করা হ'ত সুহৃদ সংঘ থেকে। একবার ওঁর কাছে লেখা চাইতে গেলে তিনি তাঁর লেখার একটি ভূমিকার পাতা থেকে তখনি খানিকটা কপি করে দিয়েছিলেন। লেখাটি তখনও ছাপা হয়নি কোথায়ও। সেদিন উপেক্ষা করেননি হাতে লেখা একটি সাধারণ পত্রিকাকে। রথতলায় আমাদের পৈতৃক বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছেন। এটাও আমার আশাতীত ছিল, আবার তাঁর বাড়ির আরও কাছে বারুইপাড়া বাইলেনে যখন এলাম বাস করতে তখন তিনি

নিজে থেকেই একদিন এলেন। বললেন বাড়ি করেছ, কেমনই বা আছ- দেখতে এলাম। যদিও এর আগে প্রথম প্রথম সাহস করে ওঁকে বলতে পারিনি আমাদের বাড়িতে আসতে। নূতন বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর একদিন বলেছিলাম সাহসে ভর করে- স্যার আমাদের বাড়িতে যদি একবার আসেন। আসবেন বলেও আসতে পারেন নি। সম্ভবত সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। তাই। তারপর একদিন নিজেই এলেন। আমি, আমার স্ত্রী ওঁকে পেয়ে কী খুশিই না হয়েছিলাম সেদিন। মিষ্টি খেতে দিলে তিনি বলেছিলেন, তখন সাধারণত মিষ্টি বিশেষ খান না। তবুও দু'একটা খেলেন। বললেন-তোমাদের দেওয়া মিষ্টি অবহেলা করি কেমন করে?

একটু খেয়ালিও যে ছিলেন না এমন নয়। তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্পও শোনা যায়। তার সত্যতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি- তখন জিনিসের দাম বাড়তে থাকায় বাজারে কোনো কোনো বিক্রেতা সবজির দাম বলতেন শ-এর দামে। এমনি একটি ঘটনা নাকি ক্ষুদিরাম বাবুর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। স্যার এক এক ঢ্যাঁড়শ বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন- ঢ্যাঁড়শের দাম কী? বিক্রেতা বললেন- ২ টাকা শ। মাস্টার মশাই নাকি ঢ্যাঁড়শ গুণতে শুরু করলেন- এক, দুই। বিক্রেতা- একী? – কেন, ২ টাকা শ, তাই একশ গুণছি। বিক্রেতা- ধ্যাৎ। হাসলেন মাস্টারমশাই। এমনি অনেক গল্প কথা।

এসবের সত্যতা নিয়ে খোঁজ নেবার চেষ্টা করিনি। শোনা কথা, শোনা কথাই থাক। আমাদের মাস্টারমশাইকে আমরা ভালো করেই চিনি।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ডঃ ক্ষুদিরাম দাসই। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় নিয়ে গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যেটুকু পড়েছি নিজে উপকৃত হয়েছি। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল তাঁর। বাংলা অনার্সের ক্লাশে যে ক্ষুদিরাম বাবুকে পেতাম তা বিস্ময়কর ও আনন্দ জনক। কী শিক্ষাদান কৌশল। কী বিশ্লেষণী শক্তি। কী অসীম জ্ঞান।

এমন শিক্ষক খুব কমই পাওয়া যায়। একবার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি গ্রন্থ নিয়ে, যা সচরাচর আলোচিত হয় না, তাঁকে কলেজেই ক্লাসের বাইরে করিডরে কিছু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলতে শুরু করলেন সেই বিষয়ে। এক হাত পকেটে গুঁজে, অন্য হাতে খাতা নিয়ে বলতে বলতে গেলেন সেই বিষয়ে। খাতাটি ছিল কোনো ক্লাসের রোল কলের।

ভাবতে পারি না, হঠাৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে কোনো রেয়ার বিষয়েও এমন সহজ সুন্দর ভাবে বলতে পারেন কোনো অধ্যাপক। সাধারণত অনেকেই বলেন বিষয়টি দেখে ভালো করে পরে বলা যাবে। ক্ষুদিরামবাবুকে তেমন সময় নিতে হত না সাধারণত অনেক সময়ই। কী দিয়ে তুলনা করবো তাঁর এই গভীর জ্ঞানের অগাধ পাণ্ডিত্যের!

একবার আমরা কয়েক জন ধরলাম তাঁকে, অনুরোধ করলাম- স্যার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে যদি একদিন আমাদের একটা ক্লাশ নেন। একদিন নিলেনও একটা ক্লাশ, সে ক্লাশে যা পড়ালেন তা আজও প্রায় মনে আছে আমার। এম. এ. পড়ার কালেও তাঁর সে পড়ানো আমাকে সহায়তা দিয়েছে অনেক। আজও হয়তো সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে চেষ্টা করলে দুচার কথা বলতে পারি সেই পড়ানো থেকেই। এমনি মহাশিক্ষক তিনি।

মাস্টারমশায়ের গবেষণা কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে নানা কারণে যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। এজন্য কখনও কখনও একটা অভিমান যেন তাঁর কথাবার্তায় ফুটে উঠত। পরে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট উপাধি দিয়ে যোগ্য সম্মানই দিয়েছিলেন। এটা ঘটার পর আমার মতো তাঁর অনেক ছাত্ররই মনের ক্ষোভ দূর হয়েছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকও হয়েছিলেন। শুনেছিলাম তাঁকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্মানও দেওয়া হবে। কিন্তু কেন যে তা হল না, তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বলতে ভুলে গেছি, স্যারের হাতের লেখাটিও ছিল সুন্দর, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট। বর্ণগুলি ছিল ঋজু, জড়ানোও নয়, বক্রও নয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতের লেখাও ছিল এমন। ক্ষুদিরাম বাবুর হাতের লেখা তাঁর হাতের লেখাকেও মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষকতার কাজে ঢোকার পর আমাদের আর এক বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্যের সঙ্গে একবার দেখা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রণাম করতেই তিনি বললেন-গবেষণা কর। কথাটি মনে ধরেছিল। কিন্তু সাহস পাইনি। বাবাও বলতেন, সাহসে কুলোয় নি। তবুও একদিন নতুন বাজারে বাজার করার সময় ডঃ দাসের সঙ্গে দেখা। প্রণাম করে বললাম গবেষণা করার ইচ্ছার কথা। ব্ললেন-গবেষণা করো। বর্তমানের উঠতি লেখক কবিদের সন্ধান করে তাঁদের কাজ নিয়ে কাজ করো। ভাবলাম, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। শেষে ছেলেদের ও কোনো কোনো ছাত্রের কথায় একদিন গবেষণার কাজে সত্যিই হাত দিলাম। বন্ধু অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশক। তাঁরই

পরামর্শে জীবনানন্দ ও লোক সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছি। কিছুটা কাজ এগিয়েছে। এ অবস্থায় ক্ষুদিরামবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন- কাজ করছো ভালো, শেষ করতে হবে কিন্তু। ভাবলাম, তিনি জানলেন কেমন করে! আমি ডিগ্রিটা পেলেও তিনি খুশি হয়েছিলেন, বলেছিলেন আরও কাজ করো।

ক্ষুদিরামবাবুর মৃত্যু খবর পেলাম সম্ভবত একজন শিক্ষক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের ফোনে। সত্যনারায়ণ আমার ছাত্র। জানে, আমি ক্ষুদিরামবাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমার দুর্ভাগ্য, আমি সেদিন কলকাতায় তাই আসা হয়নি তাঁর অন্তিম যাত্রায়। বড়ো দুঃখ রয়ে গেছে সেজন্য।

শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা বা কাজ যা করি তাতেই অনুভব করি ক্ষুদিরামবাবুকে। আমি তো তাঁরই তৈরি। তাঁর বড়ো মেয়ে আমাদের প্রিয়, অধ্যাপিকা ভারতী দাস বাগচী যখন তাঁর (ক্ষুদিরাম বাবুর)শতবর্ষে তারই স্মৃতি রক্ষা কমিটিতে থাকার কথা বললেন, তখন বলেছিলাম কী যোগ্যতা আছে আমার? আমি কি সেই পর্যায়ের লোক? তবে একটা পরিচয় আছে আমার, আমি তাঁর একজন ছাত্র, অত্যন্ত সাধারণ ছাত্র। সেটাই আমার অহংকার। সেটাই আমার বড়ো পরিচয়। ভারতী বললেন- সেই পরিচয়েই থাকুন।

আচার্য ডঃ দাসের অগণিত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর শতবর্ষে তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। যতদিন বেঁচে থাকবো, তাঁকে মনে রাখবো। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আনত থাকবো চিরকাল।

-o-

স্যারের জীবনের এক অদ্‌ভুত ট্র্যাজেডি

পবিত্রকুমার সরকার

অদ্‌ভুতভাবে স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। চুয়ান্ন বছর আগেকার কথা। স্মৃতির নেগেটিভ যে দিকটার ছবি আজও ধরা আছে। ১৯৬২ সালে আমি মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। ছোট্ট কলেজ। ছশ বা সাড়েছশ ছাত্র। সুন্দর পরিবেশ। সে সময় আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ভূপেশ মুখোপাধ্যায়। কলেজে একাধিক নামী শিক্ষক ছিলেন- ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান কবি বিষ্ণু দে, অর্থনীতির ধীরেশ

ভট্টাচার্য, বাংলায় ড. ক্ষুদিরাম দাস। ড. দাসের নামটি তখন শিক্ষক ও ছাত্র মহলে ঘোরাফেরা করছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডি লিট্ পেয়েছেন অল্প কিছু দিন আগে। তার আগে আর কেউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমালোচনা সাহিত্যে ডি লিট পাননি। যে বইটির জন্য তাঁর এই সম্মান সেটির নাম রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়।

এহেন কৃতবিদ্য শিক্ষক আমাদের বাংলা পাস ক্লাস নিতে এলেন। ক্লাস ভর্তি ছাত্র। ছোট্ট খাট্ট চেহারা ধুতি পাঞ্জাবি পরা মানুষটি দ্রুত পায়ে ঢুকলেন। ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি বা তার একটু বেশি লম্বা। আমরা যারা ব্যাকবেঞ্চের তাঁকে ভাল করে ঠাওর করতে অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি নীরস গদ্য সাহিত্য পড়াতে শুরু করলেন। একেবারে পেছনে বসে কয়েকটি ছাত্র জুতোয় খেলনা ব্যাঙ রেখে কর্কশ শব্দ করছিল। খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন স্যার। আর আমরা মজা নিচ্ছিলাম। হঠাৎ স্যার দ্রুত এসে আমাকে সামনে পেয়ে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন, আর জোরে ধমক দিলেন। বিনা দোষে শাস্তি ভোগ করলাম যা আমি জীবনে বেশ কয়েকবার করেছি। আমি সেদিন বিনা বাক্যব্যয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনে এসে বসে রইলাম। আমি সে বছর ছাত্র সংসদের নির্বাচিত কর্মকর্তা। অল্প দিনেই কলেজের একজন ছাত্রনেতা হিসাবে নাম করেছিলাম। তখন কিন্তু ইউনিয়ন নেতারা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করত- আজকের দিনের তাদের সঙ্গে মারমুখি অশোভনচিত তর্ক-বিতর্ক করত না। সময়টা কেমন যেন বদলে গেল কৌশলী রাজনীতির দাপটে।

পরে কলেজেই স্যারের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমি কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলাম। বাংলা লেখাগুলো তিনি দেখে দেন। আমার প্রকাশিত কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। পরে নানা কারণে স্যারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কিছুটা আলগা হয়ে গিয়েছিল।

আমি দীর্ঘদিন মধ্যকলকাতার নীলরতন সরকার হসপিটাল সংলগ্ন পাড়ায় থাকতাম, স্যার থাকতেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের কাছাকাছি ৫৪ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ভাড়া বাড়িতে- দুইয়ের দূরত্ব বড় জোর এক কিলোমিটার। অধ্যাপনার সুবিধার জন্য তিনি এই অঞ্চলে থাকতেন। কিন্তু নিজের বসতবাড়ি ও সংসার ছিল কৃষ্ণনগরের চোধুরীপাড়ায়। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থেকে এখানে এসেই পাকাপাকি বাস করেন এবং ২০০২-এ এবাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গভীর পুকুর-সহ শ্যামল ছায়াঘেরা এই বাড়িতে একটা স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ছিল যা এখন কিছুটা নষ্ট হয়েছে।

এই বাড়ির কাছেই আমার পিসিমার বাড়ি। আমার দুই পিসতুতো দাদা নির্বাণ (বর্তমানে প্রয়াত) ও বিধান বিশ্বাস স্যারের পরিবারকে ভাল করে চিনতেন। সেই সূত্রে আমার বাবা প্রদ্যোতকুমারের সঙ্গে ড দাসের গোটা পরিবারের সঙ্গে প্রায় পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্যারের কন্যারা ভারতী, বাণী, লীলামঞ্জরী পুত্র প্রদীপ এ-বাড়ীতে আসা যাওয়াআসা করতেন। এমন কি ওরা কেউ কেউ কুরি লেনে আমাদের ভাড়া বাড়িতেও বেশ কয়েকবার এসেছেন। আমিও স্যারের শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় ও কৃষ্ণনগরের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছি। আমার স্ত্রী সবিতাও গিয়েছেন। এই সব ব্যক্তিগত কথা বলার উদ্দেশ্য স্যারকে কতটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি তা তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করতে চাই আমার এই সত্তরোর্ধ্ব জীবনে আমি স্যারের মতো এমন আরও কয়েকজন পণ্ডিত বা বিদগ্ধ মানুষের ঘন সান্নিধ্যে এসেছি- হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী, সুকুমার সেন, কথা সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরি ঘটক, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন ও অমিতাভ দাশগুপ্ত, মহিলা নেত্রী ও লেখিকা কনক মুখোপাধ্যায় ও গীতা মুখোপাধ্যায়, গবেষক অমর দত্ত, একুশের গানের কথাকার আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী (বাঙলাদেশ) শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্কুলজীবনে আমাকে লেখালেখিতে সক্রিয় সাহায্য করেছেন রস সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। এঁদের কাছ থেকে আমার সংগ্রহের ভাণ্ডার কম নয়। এদের সঙ্গে স্যারের একটা পার্থক্য আমার চোখে পড়েছিল। তিনি ছিলেন Unassuming একেবারেই মাটির মানুষ। পাণ্ডিত্যের বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। নতুন কথা ভাবতেন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা বুদ্ধিজীবীদের এক উজ্জ্বল ও সবল প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। আমার সঙ্গে একাধিক ঘরোয়া আলোচনায় তিনি প্রগতিশীলতার দাবিদারদের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন জাতপাতভেদ নিহিত আছে তা সক্ষোভে উল্লেখ করেছিলেন।

১৯৬৬র ৭ অক্টোবর দৈনিক কালান্তরের শুরু থেকেই সাংবাদিক হয়ে যোগ দিই। বাইরের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় আমন্ত্রণমূলক লেখাও লিখতে থাকি। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম এম-এ চালু করে। কাগজে কাজের অভিজ্ঞতায় আমি প্রথম ব্যাচেই সেই কোর্সে ভর্তি হলাম। ১৯৭০ সালে ছ' মাস গুরুতর অসুস্থ থাকায় কোর্স শেষ করতে পারব কিনা সংশয়ে ছিল। তখন শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য। ১৯৭১ –এর এম এ পরীক্ষা ১৯৭৩-এ হল। আমি দ্বিতীয় স্থান পেলাম দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয়। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে স্যারের আবার যোগাযোগ ফিরে এসেছে। এম-এ

পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে শুনে উনি আমাকে পি এইচ ডি করতে প্রস্তাব দিলেন। জার্নালিজম ছেড়ে বাংলা সাহিত্যে গবেষণা করব? গড়িমসি ও দ্বিধা ছিল। আমার পি এইচ ডি করাই হল না। পরে অবশ্য বিদেশে ছ মাসের একটা স্নাতকোত্তর কোর্সে ডিপ্লোমা করেছি।

স্যারের কাছে আমি সুযোগ পেলেই যেতাম। নানান বিষয়ে কথা হত। ১৯৭০-এর ২৫ জানুয়ারী মধুসূদনের সার্ধশত জন্ম-বর্ষে মধ্য কলকাতার একটি স্কুলে একটা বড় আলোচনা সভার আয়োজন করি। স্যার ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি বললেন, মধুসূধন কবিতায় কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলেও তার পরে এমন ধ্বন্যাত্মক শব্দ বসিয়েছেন যে পাঠকরা চেষ্টা করলে বুঝে যেতে পারেন। তিনি এমনভাবে দৃষ্টান্ত দিলেন যে বিষয়টি পরিষ্কার হল। আমরা অনেকে মিলে সেদিন সকালেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের কবরখানায় গিয়ে মাইকেলের স্মৃতিবেদিতে মালা দিলাম। স্যার ছিলেন এর পুরোধা। এরপর আমাদের মধুমেলা নামক সংগঠন গড়ে ওঠে অধীর কুমারের নেতৃত্বে।

১৯৭৩-এ স্যারের আরেকটি গ্রন্থ সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত হয়। তিনি নিজে বইটি আমাকে উপহার দেন ও কালান্তরে সমালোচনার জন্য আরেকটি কপি দেন। আমি খুঁটিয়ে পড়ি ও বছরকার একটি রবিবারের কাগজের পুরো পাতা জুড়ে সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশ করি। বইটি রবীন্দ্রনাথের প্রগতি ভাবনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু গ্রন্থের দু-একটি তাত্ত্বিক ফর্মুলেশানে আমি দ্বিমত পোষণ করেছিলাম। পরে স্যারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি রচনাটির প্রশংসা করেন- সবচেয়ে প্রশংসা করেন দ্বিমতের জায়গাগুলি। এমনভাবে তিনি সমালোচনাকে গ্রহণ করতে পারতেন। আবার তিনি স্পষ্ট বক্তা ছিলেন, কৌশলী বুদ্ধির বেসাতি করতেন না। স্যার ১৯৮১ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। কিন্তু তারপরেও বহু ছাত্রছাত্রীকে গবেষণা কাজে সাহায্য করতেন। দুই বাংলাতে তাঁর প্রচুর ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। নানা বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করতেন। হোমিওপ্যথি চিকিৎসা নিয়ে চর্চা করেছেন। এই শাস্ত্রে তিনি একজন চিকিৎসকের মতো জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অবসরজীবনেও তিনি জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক কর্মে সমানভাবে ব্যস্ত ছিলেন। কয়েকটি বইও লিখে ফেলেন। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তাঁকে Bengali Linguistic Dictionary for both Bengali and non-Bengali নামে বৃহৎ অভিধান রচনার ভার দেন। কঠিন পরিশ্রম করে কয়েকবছরের চেষ্টায় এই অসাধারণ কাজটি শেষ করেন। আমি দেখেছি, প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ঘরে বসে দু-একজন সহকারী নিয়ে প্রতিদিন অভিধান তৈরির কাজ করছেন। এই কাজ করার সময়

কিছু দিন তার পুরানো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তিনি কলেজ স্ট্রিটের ১৮ সি টেমার লেনে দুকামরার বাড়ি ভাড়া নেন। সেখানে বসে কয়েকবার এই অভিধান প্রণয়ন পর্বের কথা শুনেছিও জেনেছি। বাংলাভাষায় কীভাবে দেশজ শব্দগুলো আত্মস্থ হয়েছে তার তিনি উৎসসন্ধান করছিলেন। একে তিনি সাঁঅ-বাংলা বলতেন। অর্থাৎ সাঁওতালি শব্দগুলির বঙ্গীকরণ। প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই বয়েসে তার এই অনুসন্ধিৎসা আমাকে অবাক করছিল। প্রকৃত জ্ঞানী বোধ হয় এমনই হন। এই অভিধান ১৯৯৬ সাল থেকে মুদ্রণের জন্য সরকারী দপ্তরে পড়ে আছে। এটি আমার মতে স্যারের জীবনে শ্রেষ্ঠ কাজ।

এই অভিধান ছিল তার জ্ঞান সাধনার ফসল- এক বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের মত। স্যারের স্বপ্ন প্রকল্প। অভিধান প্রকাশে পূর্বতন বামফ্রণ্ট সরকারের গড়িমসি স্যারকে দুঃখ দিয়েছিল, অথচ তিনি ওই সরকারকে সমর্থন করতেন। জানি না ওই অভিধান আদৌ আর আলোর মুখ দেখবে কিনা। এ এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি।

-o-

যারা কাছ থেকে দেখেছেন

শতঞ্জীব রাহা
চিত্তরঞ্জন লাহা
প্রকাশ চক্রবর্তী

যেমন দেখেছি, যেভাবে পেয়েছি

শতঞ্জীব রাহা

রবীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী বিপুল সাহিত্যরচনার মৌল উপাদান দু'টি– নিসর্গ এবং মানব-সমাজ। তাঁর মননধর্মী রচনার অর্থাৎ সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-রাষ্ট্র-বিষয়ক চিন্তার উপাদান একটিমাত্র-ঐ মানব-সমাজ। নৈসর্গিক উপাদান মোটামুটি স্থির, অথচ মানব-সমাজ সদাচঞ্চল, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তমান। সামাজিক মানুষ রবীন্দ্রনাথও অনুভব, ধারনা, মত নিয়ে কালে কালে পরিবর্তিত। তাঁর পক্ষে বিশেষ এই যে, তিনি নিসর্গের মধ্যেও পরিবর্তন-প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন, ঋতুর পালাবদলের মধ্যে নবীনের অশ্রান্ত পদক্ষেপ, নিজ বিকাশের মধ্যেও রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তর। নিসর্গই হোক, মানুষই হোক আর আত্মনিরীক্ষাই হোক, কবির সবিস্ময় অনুভব তাঁর প্রৌঢ় রচনায় একটিমাত্র ভাবকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত, তা হ'ল অনিবার্য চলায় নিত্যনব পথের যাত্রী মানুষ, নিসর্গসহ। এভাবেই 'সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পূর্বচিন্তায় ক্ষুদিরাম দাস আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বলা, তথাপি পূর্বচিন্তার ওই সুর ক্ষুদিরাম দাসের আত্মবীক্ষণও বটে। তাঁর যাবতীয় কর্ম, সাহিত্যালোচনা ও সারস্বতসাধনারও ওই একটিমাত্র পালা- মানুষ, মানুষ এবং মানুষ। মানুষসমাজ।

যূথতা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রাণীজগতের যূথতা জীবতন্ত্রজ অভ্যাসের দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। তা নিসর্গের দিকে ধাবিত, নিসর্গের দানে পুষ্ট, নিসর্গের বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে শুধু কৃতজ্ঞতায় গৃহীত অঞ্জলি। ফলত যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে অভ্যাসের অনুবর্তনেই জীবচক্র আবর্তিত। অপরদিকে মানুষের যূথতার কেন্দ্রে আছে তার প্রতিদিনের সৃজন, প্রতিদিনের সামাজিকতা।

এই সৃজনশীল সামাজিক অস্তিত্ব সব মানুষের জীবনে সমানভাবে প্রতিফলিত হয় না। গড়-মানুষের সাধারণ অভ্যাস জীবতন্ত্রার্জিত দৈনন্দিনতাকে অবলম্বন করে চলে। অপরদিকে নিজের বিচার, বুদ্ধি, নির্বাচন, চয়ন, ব্যক্তিত্ব, যাপনের ধরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাঁরা বুনে

তোলেন নিজস্ব প্যাটার্ন, নিজ চৈতন্যকে প্রয়োগ করেন জীবনে-তাঁরাই জীবতন্ত্রকে অতিক্রম করে মানবতন্ত্রে উত্তীর্ণ হন।

ক্ষুদিরাম দাস সেই বিরল ধরনের মানুষ, যাঁর বেঁচে থাকার, নিজেকে প্রকাশ করবার ছিল নিজস্ব ধরণ- যাকে আমরা বলি স্টাইল। জীবৎকালে তাঁর জীবনযাপন নিয়ে, তাঁর খেয়াল নিয়ে, তাঁর বাসভূমি কৃষ্ণনগর শহর যে এতো শ্রুতি ছড়িয়েছিল- তার কারণ ওই স্টাইল।

কৃষ্ণনগর শহরে অনেকটা জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা তাঁর বাড়িটি অদ্‌ভুত। রাস্তার উপর বাড়ির গেট, কিন্তু বাড়িটি অনেক ভেতরে, পেছনের সীমানায়। গাছ-গাছালির মধ্যে একতলা বাড়ি। নারকেলসহ নানা ফলের গাছ, একটি ছোট পুকুর। ঠিক শহরে বাড়ির মতো ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গল নয়, অথচ শহরের মধ্যে-সর্বাথেই স্বতন্ত্র। সারা জীবন, প্রতিটি পর্যায়ে, প্রচণ্ড সংগ্রাম করে ক্ষুদিরাম তাঁর নিজ জীবন গড়ে তুলেছিলেন, নিছক উচ্চকাঙ্ক্ষী ও সাফল্যকামীদের মতো অঙ্ক কষে, পরিকল্পনামাফিক নয় -জীবনকে উপভোগ করতে করতেই। সমস্ত পর্যায়েই তাঁর জীবনে প্রতিস্বিকতার সমুজ্জল প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রতিস্বিকতার মূলে ছিল নিজ কর্মোদ্যমের উপর আস্থা ও মানবতন্ত্রের উপর অবিনাশী আশা। তাঁর অধ্যাপনা কর্ম, বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের আলোচনাই হোক অথবা রবীন্দ্রালোচনা-সবই সেই জীবনচর্যা এই আলোতেই বিচার্য।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস যখন কর্যোপলক্ষে কলকাতায় টেমার লেনের বাসায় থাকতেন, তখন নিশ্চয়ই কলকাতার কংক্রিট তাঁকে ক্লান্ত করে তুলতো; কৃষ্ণনগরে গাছপালার মধ্যে সৃজিত বাড়ির ছায়া-সুনিবিড় বারান্দায় তাঁর পাঠগম্ভীর একান্ত মুর্তিটি জেগে থাকতো ধ্যানের উচ্চতায়। চারপাশে ছেলেমেয়েদের কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, আমাদের মতো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তাদের গল্পগুজব- কোনোকিছুই তাঁর পাঠমগ্ন সম্মিত একান্তিতে এতটুকু চিড় ধরাতে পারতো না। এমন কতদিন হয়েছে বাড়িতে ঢোকার সময় কথা বলে গিয়েছি, তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দের যে হাট ছিল ঐ তপোবনসদৃশ বাড়িতে, সেই আনন্দের হাটে কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে বেরোবার মুখে চোখে পড়ে গেলে ভারী আশ্চর্য হয়ে বলেছে, ' একি শতঞ্জীব! কখন এলে? চলে যাচ্ছে নাকি? এখনই!

একাদিক্রমে তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার সুবাদে তাঁর ঐ পাঠরত মূর্তি, তাঁর জ্ঞানালোচনার উদ্দীপন, তাঁর সারল্য আর অবরিত স্নেহের স্বাদ কতবার যে চকিতে ছুঁয়ে গিয়েছে আমাকে।

আশির দশকে আমরা, আমি-কৃষ্ণনগরে যে অঞ্চলে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বাড়ি ঐ অঞ্চলের কিছু ছেলেমেয়ে, তাঁর ছেলেমেয়েরা মিলে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা তৈরি করতাম। আমাদের ইচ্ছা-নিরীক্ষামূলক সুস্থসংস্কৃতির চর্চায় দলটি দক্ষতার ছাপ রাখুক, সংগঠন হোক খুব দৃঢ় আর সুশৃঙ্খল। সভাপতি কে হবেন? তিনি হবেন। কিন্তু বলবে কে? শেষ পর্যন্ত আমি, আমাদের সংস্থা (মিলিতকণ্ঠ) –র তদানীন্তন সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা (পরে গণনাট্য সঙেঘর নদীয়া জেলা সম্পাদক) এবং তাঁর কনিষ্ঠপুত্র, আমাদের সংস্থার উৎসাহী সংগঠক ও আমার বন্ধু অপূর্ব (কবি ও শিল্পী) – তিনজনে তাঁর কাছে গিয়ে আরজি জানালাম। কী আশ্চর্য! আপত্তি তো দূরের কথা, আমাদের মতো নিতান্ত বালখিল্যদের কথায় তিনি রাজি হলেন।

আমাদের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন, অংশ নিয়েছেন। কৃষ্ণনগরে এলে, দেখা হলে, আমাদের কর্মধারা নিয়ে খোঁজখবরও করেছেন। তাঁর বিরাট খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের জায়গা থেকে আমাদের নিতান্ত ছোটো বলে ভাবেননি।

তাঁর নিরহংকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যেত পড়াশুনার কোনো আলোচনা উঠে পড়লে। দেখা হলে অবশ্যই তাঁর জিজ্ঞাসার একটা বিষয় থাকতো- কী পড়ছি, কী লিখছি, সে-বিষয়ে। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ঘরে চলছিল তাঁর তুলনামূলক অভিধান প্রকল্পের কাজ। আমার শিক্ষক ও গবেষণা নির্দেশক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ আমাকে নিয়ে গেছেন তাঁর সাক্ষাৎ করতে। অবিলম্বের অধ্যাপক দাস মেতে গিয়েছেন বাংলা ভাষার উৎসসূত্র সাঁওতালি ভাষার ভূমিকা নিয়ে আলোচনায়। প্রকল্পটি অকালে বন্ধ হয়ে গেলে কষ্ট পেয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আমায় ডেকে পাঠিয়ে বলেওছিলেন সে-কথা ।

আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠগ্রহণকালে আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ। তাঁর অপরিসীম উৎসাহে মূল্যবান সব আলোচনাসভায় একাধিকবার অধ্যাপক দাসের সর্বার্থে মৌলিক ও অসামান্য সব বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বক্তৃতা-অন্তে বা পরে তিনি আলোচনা ও নিজ বক্তৃতার প্রসঙ্গ তুলে আলোচনায় মেতে যেতেন, আমার মতো তুচ্ছ এক ছাত্রের অজ্ঞতাকে গ্রাহ্যই করতেন না। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সেমিনারেও অধ্যাপক ডক্টর ঘোষের সঙ্গে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সহজ আর সরলতার তিনি স্বয়ং উদাহরণ ছিলেন। জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টের পাহাড় ঠেলেছেন, কিন্তু কখনও সরসতা হারাননি। কৃষ্ণনগরের বাড়ির গেটের সামনের করমচা গাছে তস্কর মহোদয়দের প্রতি দরিদ্র শিক্ষকের বাড়িতে তস্করবৃত্তি না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া কিংবা কাব্যরোগগ্রস্ত যুবককে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে দেওয়া, অথবা রসিকতা করে খোলা গলায় হেসে ওঠা- এসব শ্রুতিই তাঁর ভেতরের আর বাইরের মানুষের একত্বকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

আমরা সকলেই জানি ব্যক্তিজীবনে ক্ষুদিরাম ছিলেন একজন আত্মনির্মিত মানুষ বা সেলফমেড ম্যান। প্রাকৃত-জীবন থেকে কৃতী অধ্যাপক ও বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রণী আলোচক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে এই পথ-পরিক্রমায় প্রতিদিন নিজেকে প্রমাণ করে এগতে হয়েছে। ক্ষুদিরাম প্রাকৃত জনকে দেখেছেন খুব কাছাকাছি থেকে, জেনেছেন নিচের-থাকে পড়ে-থাকা মানুষকে অন্তরঙ্গভাবে। অধ্যায়নের জগতে ডুবে থাকা ক্ষুদিরাম যখন সভার পর সভায় মাতৃভাষার পক্ষে বক্তৃতা দেন বা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তখন তা কখনই অলঙ্কার হয়ে ওঠে না, বরং তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের সঙ্গে তা বেশ মানানসই বলে মনে হয়। কেননা, স্পষ্টতাই তাঁর জীবন, চরিত্র এবং যাবতীয় লেখালেখির মূল অভিজ্ঞান। সেজন্যই চৈতন্যদেব তাঁর কাছে আদৌ ধর্মগুরু নন। মানধর্ম-নিঃসৃত বৈপ্লবিক সত্তারূপেই চৈতন্যের ভূমিকা আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে ফলপ্রসূ-এ তাঁর স্পষ্ট অভিমত। নানা আলাপচারিতায় বাংলা বানান-বিষয়ে

শুকনো বিতর্ক ও সংকীর্ণ পণ্ডীতীকে ক্ষুদিরাম জোরালো সম্মার্জনী প্রহার করেছেন, বাংলা বানান ব্যবহার তাঁর মত উদার-সরলীকরণের পক্ষে।

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা ক্ষুদিরামকে প্রাচীনত্বের দিকে, মানসিক জরার দিকে ঠেলে দেয়নি। সাঁওতালি ভাষা-সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ অনুধ্যান ও গবেষণাকে নিছক জ্ঞানচর্চার বিষয় বলে মনে করলে ভুল হবে। জ্ঞানচর্চাকারী হিসাবে তাঁর নিলিপ্তি শিক্ষণীয় হলেও, ক্ষুদিরামের গতীশীল সন্ধিৎসার সঙ্গে এখানেও জড়িয়ে আছে মানবতন্ত্র। সাঁওতালি ভাষার কাছে আমাদের পদে পদে ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিচ্যুৎ-মানবিতিহাসের প্রতি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার করায় জন্য বুদ্ধিজীবীর দায়কে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

বস্তুত ক্ষুদিরাম যা বলেছেন, যা করেছেন–বেশ জোরের সঙ্গেই করেছেন। চিত্তের জড়তা, নিছক স্বার্থের দাসত্ব, স্বকীয়তাবোধের গোপনীয়তা, যুক্তিশীলতার উচ্ছেদ-এসব প্ররোচনাকে তিনি অবহেলায় পেরিয়ে গিয়েছেন। অবলীলাক্রমে পেরিয়ে গিয়েছেন পোশাকে-আশাকে, কর্থায়-বার্তায় বুদ্ধিজীবীসুলভ ভান-ভঙ্গির প্রচলিত আবিলতাকে। বিদ্যাচর্চায় সংকীণতা, মতামতের অনুদারতা, যান্ত্রিক মতবাদের আনুগত্যকেও তিনি পরিহার্য বলেই মনে করতেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মধ্যবিত্তের অপঘাত তাঁকে আহত করেছে কিন্তু স্পর্শ করতে পারেনি। মধ্যবিত্ত হয়েও তিনি শিক্ষণীয়রূপে মানবতন্ত্রী।

খুব ভেতরের অভিজ্ঞতা থেকেই এই জ্ঞানতাপসকে অনুধাবন করা সম্ভব। সেবার অসুস্থ হয়ে আমার মা জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। হাসপাতালের কাছেই তাঁর বাড়ির অবস্থান। আমাদের বাড়ি শহরের আরেক প্রান্তে। আমার বাড়ী যাওয়ার সুযোগ নেই। অপূর্ব হাসপাতালের ঝামেলার দিনগুলিতে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নাওয়া-খাওয়া সবই ওই বাড়িতেই। যতদিন এমন চলেছে তিনি দুপুরে-রাতে আমায় নিয়ে খেতে বসেছেন, কন্যাদের নির্দেশ দিয়েছেন অসুস্থ মা-কে নিয়ে তাপিত আমাকে যত্ন করার।

'মাটির মানুষ' কাকে বলে? পুত্রের বন্ধুকে মানসিক শুশ্রূষা দিকেও তাঁর নজর। প্রকৃতির নীরব উপাসনা বাসভবনের চারদিকে ছড়ানো আর মানুষের জন্য অপরিমেয় দরদ।

বাষ্পচ্ছন্ন হৃদয়ে আজ তাঁকে প্রণাম।

(গণশক্তি ১৬ই জুন, ২০০২)

-০-

কাছের মানুষ ক্ষুদিরামদা

ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস একটি সুখ্যাত নাম। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনলস গবেষক, নিষ্ঠাবান পাঠক, বিদগ্ধ সমালোচক। তাঁর রচিত রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি ,

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী, বৈষ্ণব রসপ্রকাশ , রবীন্দ্র কাব্যে বিজ্ঞানের অধিকার ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তাঁর অসামান্য মণীষার ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার অসংশয়িত অভিজ্ঞান। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি- এই তিনটি ভাষাতেই তাঁর সমান দক্ষতা এবং বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে । তিনি বাংলা সাহিত্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি, লিট্। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি-না, থাক , এসব জ্ঞাত তথ্য এবং এগুলি সম্পর্কে বলার লোকের অভাব হবে না বলেই আশা করি। আমি অধ্যাপক দাসের পরিচয় দিতে বসিনি, সে স্পর্ধাও আমার নেই ; বসেছি কাছের মানুষ ক্ষুদিরামদার কথা বলতে।

ক্ষুদিরামদার সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে সুখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ একটি সাহিত্য সভায়। তাঁরা সেই সভার যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ; আমি (অ) – বিশিষ্ট বক্তা। প্রথম সাক্ষাতেই এটা জেনে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছিলাম যে, ক্ষুদিরামদার মধ্যে পাণ্ডিত্যের ধার এবং ভার যেমন আছে, সৌজন্য ও সহৃদয়তা সেই পরিমাণেই আছে। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তেই অনুভব করলাম সেই বিখ্যাত উক্তিটির বিশিষ্ট অর্থটি – " It is nice to be important but it is more important to be nice." অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, অনুরূপ অনুভব ও অভিজ্ঞতা লাভ করার সৌভাগ্য আমার আরো কয়েকটি মানুষের ক্ষেত্রে হয়েছে।

ক্ষুদিরামদার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো গুণ তাঁর সারল্য। সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা তাঁর আশ্রিত –বাৎসল্য । নাগরিক দৃষ্টির কল্যাণে গ্রাম্য বিশ্লেষণটির কিঞ্চিৎ অর্থাবনতি ঘটেছে তবে সেই অর্থাবনতিতে আমার আস্থা নেই বলে এবং আমি নিজেও গ্রামের মানুষ বলে একথা কুণ্ঠাহীনভাবেই বলতে চাই যে, এই গ্রাম্য সরলতাটুকু ক্ষুদিরামদার চরিত্রের সর্বাধিক মধুর ও মনোহর দিক। প্রাণখোলা ঘরোয়া মানুষ তিনি। আড়ম্বর নেই, অহঙ্কার নেই, স্নবারির লেশ মাত্র নেই। রেগে গেলে তিনি আগুন, আবার রাগ পড়লেই জল। তবে সর্ব অবস্থাতেই তিনি শিশুর মতো সহজ, সরল ও অকপট।

ক্ষুদিরামদার চরিত্রের দ্বিতীয় যে প্রধান গুণ (অথবা ভারতচন্দ্রের অনুসরণে বলা যায় 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল কালের কলায়') তা হ'ল তাঁর স্পষ্টবাদিতা। যা তিনি বিশ্বাস করেন অথবা বিশ্বাস করার মতো সঙ্গত কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন তা তিনি সরবে ও সজোরে উচ্চারণ করেন। তাঁর

বুক এবং মুখের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য যে, বুকের সঙ্গে মুখের অমিলটাই আধুনিক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ এবং আধুনিক লোকাচারের রীতিসিদ্ধ নিয়ম। নিজের বিশ্বাস ও বিচারকে নির্ভয়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই থাকে। ক্ষুদিরামদা সেই অতি অল্পের অন্যতম।

ক্ষুদিরামদার চরিত্রের আর একটি দিক অবশ্য উল্লেখের দাবী রাখে এবং তা হ'ল তাঁর মানবিকতা। জন্মসূত্রে তিনি বাঁকুড়া নাগরিক হলেও স্বভাবে তিনি বিশ্বনাগরিক । তাঁর কাছে আত্মপর বিচার নেই, জাতি ধর্মের বিভেদ নেই। মানুষকে তিনি মানুষরূপেই জানেন , চেনেন ও গ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ির দরজা সকলের জন্যই উন্মুক্ত,তাঁর রান্নাঘরে সকলের সাদর আমন্ত্রণ। অর্থ-কৌলীন্য তাঁর নেই কিন্তু মেজাজে তিনি বাদশাহ, স্বভাবে রাজচক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণনাগরিক, (বর্ত্তমানে তিনি কৃষ্ণনগরের বসতি নির্মাণ করেছেন) বলেই কি না জানি না ক্ষুদিরামদার মধ্যে রস-রসিকতার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে। তবে দূর থেকে এই ভাণ্ডারটি দৃষ্টিগোচর হয় না। গম্ভীর মুখের দীপ্ত দৃষ্টিতে প্রবল পরিহাসের সকৌতুক খেলা ও লীলা দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা আমার উক্তিটির অর্থ অনুধাবন করলেন।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, ক্ষুদিরামদা শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'ডক্টর' নন, তিনি হোমিওপ্যাথিরও ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমি জানতাম যে, 'যার নাই অন্য গতি/ সেই করে হোমিওপ্যার্থি'। তখন প্রবাদটির এই অর্থটাই জানা ছিল যে, জীবনের কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের যোগ্যতা যার নেই , সেই হোমিওপ্যাথিকে অবলম্বন করে রুজি-রোজগারের চেষ্টা করে। ক্ষুদিরামদার সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রবাদটির অর্থ আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বুঝেছি কোন চিকিৎসায় যে রোগ সারে না, 'হোমিওপ্যাথিই ' তার শ্রেষ্ঠ নিদান- অগতির গতি। তবে অনধিকারীর নিকট নিদান নিলে হবে না, ক্ষুদিরামদার মতো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

একজন সুপণ্ডিত, সুহৃদয়, আমুদে ও আলাপী মানুষের সম্পর্কে কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি এবং এই উপলক্ষে তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রবন্ধের ইতি টানছি।

-o-

আমার দৃষ্টিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস

প্রকাশ চক্রবর্তী

অফিস বসে ফোন পেলাম। 'কে? প্রকাশ? আরে তোমার দেখা সাক্ষাৎ নেই কেন? সেই গত মাসে তোমাকে দেখেছিলাম। তারপর থেকে হাওয়া। আজ তোমাকে ফোনে না পেলে লালবাজার মিসিং স্কোয়াডে ছুটতে হত।'

কাজের বিপাকে আমি কেবল গত সপ্তাহে তাঁর কাছে যেতে পারিনি। তার এই রকমফের। অত বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিত মানুষের ভিতরের খবরটা অনেকের জানা নেই। অকপট সরল মানুষ। বন্ধুসঙ্গের জন্য সতত উদ্‌গ্রীব। হীন স্বর্থপরতা চক্রান্ত ও কূটনীতির দল থেকে সরে থাকেন।

রেখে ঢেকে রং পালিশ দিয়ে কথা বলতে জানেন না। স্পষ্টবাদিতার জন্য দুর্ভোগেও পড়েন, আবার যাকে পছন্দ করেন না তার ছায়াও মাড়ান না। Back door policy-কে, ধরাধরি ঘোরাঘুরি করে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন। আবার পত্রিকার জন্য বইয়ের জন্য কেউ কিছু লেখা চাইলে, সার্টিফিকেট চাইলে যোগ্য মনে হলে তাকে সাহায্যও করেন। কলকাতায় তাঁর আশ্রয়ে থেকে বহু ছাত্রই মানুষ হয়ে বেরিয়ে গেছে- এ তথ্য হয়ত অনেকেরই জানা। বারো বৎসর তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আমি একদিনও তাঁকে মনমরা ও বিষণ্ন দেখতে পাইনি। সদা হাস্যময় মুখ, আর রঙ্গব্যঙ্গে ভরা কথাবার্তা।

কলকাতার বাইরে- বাঁকুড়া মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণে আমি কয়েকবারই তাঁর সঙ্গী হয়েছি। দেখেছি গ্রামের মানুষের দিকে তাঁর কী অপরিসীম টান এবং আত্মীয়ের মত ব্যবহার। বেলেতোড় গ্রামে গিয়ে তাঁর পুরানো ভিটা দেখে আসার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। অবাক হয়েছি যে এই খড়ের চালের সামান্য কোঠাবাড়ী এমনতর সন্তানের পালন পোষণ করেছে। তাঁর সঙ্গী একটা দলের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। আমি কিছু শিল্পের কাজ করি। আমার ইন্‌টারেস্ট ছিল টেরাকোটায়। ডঃ দাস আগাগোড়া সব মন্দির দেখলেন ও দেখালেন এবং টেরাকোটায় ছবিতে লিপিবদ্ধ পৌরাণিক বিষয় ও মধ্যযুগের সমাজ প্রশাসন প্রভৃতির রূপ নির্মাণের ব্যাপার অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিলেন। আর যেখানে গেছি তাঁর উৎসাহে ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে পথের

ও ঘোরার ক্লেশ গেছি ভুলে। দেখেছি আমাদের থেকেও বেশি পথ হাঁটতে পারেন ও সহজে ক্লান্ত হন না।

তাঁর জীবনযাত্রা, অশনবসন অতীব সরল, আবার স্পষ্টবাদিতার গুণে বা দোষে তিনি কারো প্রিয়, কারো বা অপ্রিয়। কিন্তু হাসিতামাসা ও বন্ধুসহ আড্ডা দেওয়ার আগ্রহ তাঁর জুড়ি নেই। ব্রিজ খেলতে ভালবাসতেন। প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর লেখালেখিতে মন হতেই তাস খেলা প্রায় ছেড়েই দেন। তাঁর প্রথমা গৃহিণী নাকি খুবই ভালো গান করতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হারমোনিয়ামটি নিয়ে অধ্যাপক দাস কিছুদিন গানও অভ্যাস করে ছিলেন। তাঁর কন্যা বলে, আমাদের হারমোনিয়াম নিয়ে গানের রেওয়াজও প্রারম্ভ বাবার কাছে। অধ্যাপক দাস এই সেদিন বলছিলেন- আর কলকাতায় নয় প্রকাশ। লোক-দেখানো কপট সভাসমিতি, ভাষণের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া। পত্রপত্রিকার জন্য লিখে দেওয়া এসব আর পারছি না। বাকি দিনগুলো বনবাসে কৃষ্ণনগরেই কাটাব। আর হারমোনিয়াম নিয়ে মনের মত গানে মন দেব। কলকাতায় সাহিত্যিক আবহাওয়া এখন কপট, কৃত্রিম, কলুষিত। তাঁর রঙ্গপ্রিয়তার একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। তাঁকে নানান শহরে ও গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। সে সব জায়গার বিখ্যাত মিষ্টদ্রব্যের স্বাদ তিনি নিতেন এবং সেখান থেকে সঙ্গে কিছু নিয়েও আসতেন। খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালবাসেন। বাঁকুড়ায় নিজ গ্রামের ম্যাচা সন্দেশ, বর্ধমানের মিহিদানা, বহরমপুরের ছানাবড়া, ক্ষীরপাইয়ের বারবকশাহী, দেওঘরের প্যাঁড়া, হাসনাবাদের মাখা সন্দেশ, শান্তিপুরের নিখুতি এই সব। আমাকে মাঝে মাঝে মালদহ যেতে হয়। সেখান থেকে দু' একবার কানসাটের চমচম এনে তাঁকে খাওয়াই। আমি কাছে গেলে একথা সেকথার পর মজা সৃষ্টি করার জন্য হঠাৎ বলে উঠতেন – কানসাটের চমচম খাব প্রকাশ। একবার পুরুলিয়া গিয়েছিলেন, ট্রেনে ফিরছেন। কামরায় শুনেছেন দুই বন্ধুতে নানান বিষয়ে আলাপ করতে করতে বলছে- সেই বাঞ্ছারামের কালোজাম তোর মনে আছে, সে এখন আর পাওয়া যায় কিনা কে জানে। ঐ যে ট্রেনে শোনা সেটা মনে রেখেছেন। একদিন আমি হাজির হয়ে আলাপ করছি, বলে উঠলেন- বাঞ্ছারামের কালোজাম খাব, প্রকাশ। এর পর যখন আসবে বাঞ্ছারামের কালোজাম নিয়ে আসবে। তারপর সুর লাগিয়ে বলতে লাগলেন, আ-হা! বা-ঞ্ছা-রামের কা-লো-জাম। কী মধুর! কী অপূর্ব! একদিন খাওয়াও না প্রকাশ। আবার একদিন সুর তুললেন- বাঞ্ছারামের কালোজাম! ভাবলাম সত্যি না তামাসা-একদিন খোঁজ করে দেখাই যাক না কেন? বেহালায় এস্‌প্ল্যানেডে এখানে ওখানে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। একদিন একজন বললেন- একবার গড়িয়াহাটটা দেখুন তো।

কী করি, সময় পেলে সবই তো দেখি, গড়িয়াহাটটাও দেখা যাক। আমাকেও যেন সুরের নেশায় ধরলে-বাঞ্ছারামের কা-লো-জাম। গড়িয়াহাট বাজারে কি রাস্তায় সব দোকানগুলো দেখলাম। বললে কালোজাম আছে, কিন্তু বাঞ্ছারামের কালোজাম কী জিনিস জানি না। ঘুরতে ঘুরতে শুনলাম বাঞ্ছারাম বলে একটা লোকের খাবারের দোকান আছে বটে। সেখানে গিয়ে দেখি সেটা তেলেভাজার দোকান। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা আটটা বাজে। ভাবলাম, কালোজাম পেলেই কিছু সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে যাব, জিয়ে আমিও মজা করে বলব- এই পাওয়া গেছে বাঞ্ছারামের কালোজাম। একদিন নিলামও। হাতে প্যাকেট নিয়ে হাজির হতেই উনি খুলে ব্ললেন-আরে, এ তো লেডিকেনি। আমি তামাসা করে একটা মজার নাম শোনালাম, আর তুমি সেটাই সত্য মনে করে লেডিকেনি নিয়ে এসে ঠকাচ্ছ? তারপর আমাদের দুই জনের সে কী উচ্চস্বরে হাসি!

-0-

সংগঠনে সম্পাদকদের চোখে সভাপতিকে দেখা

ইন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়

জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়

ধনপতি সামান্ত

রসালো মনের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আমাদের ক্ষুদিরামদা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস আর নেই। ডাকাবুকো, প্রাণবন্ত, রসালো মনের এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটলো। যাঁর জীবনে অবসর মূহুর্ত দেখাই যেত না, তিনি চির অবসর নিলেন দুনিয়া থেকে।

তিনি আমাদের সকলের কাছেই ছিলেন ক্ষুদিরামদা। কারোর কাছে স্যার বা মাস্টার মশাই। অরিজিৎ মিত্র বলছিলেন- উনি আমাদের খুব প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। স্যারের কাছ থেকেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে বুঝতে পেরেছিলাম। ‘দাস’ উপাধির জন্যে শিক্ষাজগতে নিজের উচ্চ আসন অধিকার খুব সহজে হয়নি। রথী-মহারথী উচ্চবর্ণীয় বশিষ্টদের অজস্র বাধা, শ্লেষ, ঘৃণা জয় করে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হয়েছিলেন এসব আমরা জানতাম। তবু, মনের কোণে কোথাও সেই স্মৃতি নড়াচড়া করেনি এমন নয়। আর সে কারণেই বোধহয় অর্জন করেছিলেন জেদী, তেজী, প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ভাষায় ‘যারা দিয়ে গেল সবকিছু, পেল না কিছুই’ সেই দলিত, অপমানিত মানুষদের জন্যে মমত্ব ও অনুরাগবোধ। এই আদর্শ এবং চরিত্রের জন্যেই দেশের বামপন্থী ধারার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া সম্ভব হয়েছিল ক্ষুদিরামদার।

নানান চরিত্রের নানান কাজের সঙ্ঘ-সংস্থার সঙ্গে খুব সক্রিয় যোগাযোগ ছিল, এমনকি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গেও। এ-নিয়ে আমরা কম ঠাট্টা তামাশা করিনি। উনি বলতেন, ওতে বামপন্থার হানি ঘটবে না। ওটাই আমার

আসল ঘাঁটি। কথা বলতেন খুব জোর দিয়ে, স্পষ্টভাবে, কখনও রসালো ভঙ্গিতে চিমটি কাটা হাসির সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটলো বামফ্রন্ট সরকার আসার পরপরই। প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই একমাত্র বাহন করার বিরুদ্ধে তখন শিক্ষা-সাহিত্য জগতের একদল কুলীন বশিষ্ঠ রাস্তায় নেমে পড়েছেন। বৃহৎ মিডিয়া তাঁদের পক্ষে খাড়া। বিপরীত পক্ষে শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের অংশটি যুক্তিতে ভারী হলেও মিডিয়ার অসীম কার্পণ্যতায় লোকেদের কাছে নামী নন। অথচ দিক্‌পাল তাঁরা একঝাঁক শিক্ষক, বৃদ্ধিজীবী বামফ্রন্টের পক্ষে। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এই নীতির পক্ষে তেমন সব মানুষের জড়ো করে কলকাতা ছাড়িয়ে নানা জেলায় প্রচারাভিযান শুরু করেছি। তখন আমাদের সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী, ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের পেয়েছিলাম প্রচার ময়দানে। বড় আশ্রয় তখন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর। নারায়ণদা, ক্ষুদিরামদা, নেপাল মজুমদার ছিলেন উত্তেজক স্পষ্টভাষী। কুলীন বশিষ্টদের ছেড়ে কথা বলতেন না।

স্বাস্থের কারণে সভাপতি নারায়ণ চৌধুরী অবসর নিতে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস হলেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর সভাপতি। টেমার লেনে সেই একফালি ঘর, ছোট চৌকি, ঠাসা বই পত্তর- সেখানেই প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে না করেননি।

নানাধরণের সঙঘ-সংস্থায় থাকার ফলে ওঁর মধ্যে সংগঠনিক একটা বোধ ছিল। নিস্ক্রিয় সভাপতি ছিলেন না মোটেই। প্রায় নিয়মিত সংগঠন সভায় আসতেন। নিজের মত ব্যক্ত করতেন সজোরে। খুব বিশেষ কারণ না থাকলে সংঘের কর্মসূচীতে দস্তুর মতো থাকতেন। নিয়ম মেনে যথাসম্ভব সম্মেলনে থাকতেন। টেমার লেনে তাঁর সঙ্গী থাকতো নতুন পুরানো ছাত্র-ছাত্রীরা। তাঁরাই সিংহভাগ দেখাশোনা করতেন। পরিবার বিরাট হলেও তাঁরা তো বেশিরভাগ থাকতো কৃষ্ণনগরে। মাঝে মাঝে উনিও যেতেন, থাকতেন কিছুদিন। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বোধ ছিল অসীম। আমাকে বলতেন, এতো যে জেলা জেলা দৌড়ে বেড়াচ্ছো, পরে টের পাবে আমার মতো।

একবার হঠাৎ আমরা শুনলাম পুকুরে চান করতে গিয়ে বুকের পাঁজরে আঘাত লেগেছে। কৃষ্ণনগরে গেলুম দেখতে। অসুস্থতা চিহ্নমাত্র নেই। কুঁচো মাছের ঝোল খাওয়ালেন। কল্যাণ ছিল সঙ্গে। ওঁর বাড়িতে যাঁরা গিয়েছেন, যেন

তপোবনের মধ্যে অনাড়ম্বর বড় বাড়ি। অনেক লোকজন। একটা গাছগাছালির ছায়া ঢাকা পুকুর। উনি ওই বয়সে যৌবনের তেজ নিয়ে পুকুর পাড় থেকে মেরেছেন ঝাঁপ। জানতেন না ডালপালা নিয়ে একটা মরাগাছ ওৎ পেতে আছে। তাতেই আঘাত। এ ঘটনা নিয়ে অনেক মজা করেছি আমরা। উনি হেসে বলতেন- বয়স বলছ? ঝাঁপ তো দিলুম। তোমরা পারবে?

একদিন বললেন- সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর আমার অনেক দিনের ইচ্ছে মেনে বাংলা-হিন্দি-সাঁওতালী ভাষার অভিধান করার কাজ মঞ্জুর করেছে। খুব জরুরী কিছু না থাকলে সবেতে ডেকোনা। এক একসময় খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ঢুকতেন। বামফন্টের ইচ্ছে থাকলে কি হবে, কিছু আমলা চৌপাট করে দেবে। আরে এই সিরিয়াস একটা কাজ করতে যা যা দরকার বলি, গয়ংগচ্ছ ভাব, যেন আমার মাথাব্যথা দৌড়ও রাইটার্স। সত্যসাধনকে এবার বলে দেব যথেষ্ট হয়েছে, ছেড়ে দাও ভাই। তারপর আবার কাজে ডুবে যাওয়া। আসলে, ক্ষুদিরামদার মধ্যে অতি বয়সেও ঈর্ষণীয় গতিময়তা ছিল। সে গতি শরীরের যেমন, মন আর মস্তিষ্কেরও। কাপড়ের কোঁচাটা পকেটে গুঁজে হন হন করে চলার সেই গতিভঙ্গি চোখে ভাসছে। মারপিট অশান্তির কথা শুনলে সংগঠন-ঘরে চলে আসতেন মিটিং না থাকলেও। একটু নিচু গলায় বলতেন-আমার ওষুধ হচ্ছে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা। তোমরা তো তা শুনবে না।

এখনও মনে আছে কলকাতায় বাংলা সাহিত্য সম্মেলন সফল হবার পর আমরা মালদহ জেলা কমিটির সহযোগিতায় সংগঠনের রাজ্য সংসদ সভা করলুম ১৯৯৬-এর জানুয়ারিতে মালদহ শহরে। সাহিত্য সভা, আলোচনাও ছিল। শেষদিনে বেলা ১ টায় শেষ। গাড়ি সেই রাত্তিরে। প্রয়াত সুবোধ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় এবং শৈলেন সরকার, জীবন মৈত্র, রণজিৎ চক্রবর্তী, পুষ্পজিৎ রায়ের সহযোগিতায় দুটো বাসে করে একদা বাংলার রাজধানী গৌড় দর্শন। হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর সমন্বয়। হঠাৎ এক সুরঙ্গ পথ থেকে উঠে এলেন ক্ষুদিরামদা। কাছে ডেকে বললেন, কি সব দেখছো? একটু কান পাতো, ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না? সেই প্রাণোচ্ছল ভঙ্গি রসিক যৌবনের পক্ষেই সম্ভব।

ফোনে ওঁর মেয়ে ভারতী বললেন- রবীন্দ্রনাথ বাবার অণু-পরমাণু পড়া ছিল। যেকোনো প্রশ্নের তক্ষুণি জবাব দিতেন, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যেকোনো লেখা লিখতে পারতেন। সাহিত্যের অলিগলি ওঁর হাতের মুঠোয় ছিল।

এমন মানুষ চলে গেলে বিরাট শূন্যতা তো তৈরি হবেই। একদিকে বৈদগ্ধের শিরোমণি, অন্যদিকে সমাজ অশুভ অন্যায়কারী শক্তির বিরুদ্ধে সাহসী অকপট যোদ্ধা- এমন মানুষের সংখ্যা খুবই বিরল যে আজ।

(গণশক্তি ৪ঠা মে, শনিবার, ২০০২)

-০-

আমাদের চোখে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস

জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি প্রসার সমিতির গৌরবের কথা এই যে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তার সভাপতি। না, তিনি কেবল আলঙ্কারিক সভাপতি নন- সমিতির প্রতিটি পদক্ষেপে
আমরা তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। শাশ্বত বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁর অবদানের মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি- কারণ এই ৮০ বছর বয়সেও তিনি এখনও সৃজনশীল। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা এবং মননকে কেবল রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি- বঙ্গ-সাহিত্যের যে অঙ্গনে তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন তা-ই যেন এক অলৌকিক দ্যুতিতে ভাস্কর হ'য়ে উঠেছে। তাঁর দেশ-কাল-সাহিত্য গ্রন্থ লেখকের জীবন-বোধ এবং প্রজ্ঞার এক স্বর্ণপ্রসূ ফসল। লেখকের সুদীর্ঘ বারো বছরের অতন্দ্র সাধনায় লিখিত বাংলা ভাষা-সাহিত্যের এক অভিধান অবশ্যই উভয় বঙ্গের সারস্বত মহলে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে- এ প্রত্যয় আমাদের আছে।

কিন্তু এই এত বিচিত্র কর্মধারায় মধ্যেও তিনি বাংলা ভাষায় সংকোচনের এবং বঙ্গ-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধের সমান সবর। তিনি অকাতরে এবং প্রকাশ্যে বহু-ভাষাভাষীর এই ভারতবর্ষে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। অন্য বহু বুদ্ধিজীবী যখন হিন্দির আগ্রাসনের কথা বললে উদাসীনতার ভাব দেখান কিংবা পাশ কাটিয়ে যান, তখন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অধিকারের এই দাবীকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি মেট্রো সিনামার সামনে জনসভায় বাংলা ভাষার স্বধিকারের পক্ষে দীপক রাগে বক্তব্য রাখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের স্মরণে আমাদের মিছিলে পা মেলান। দুরদর্শনে বাংলা ভাষাভিক্তিক অনুষ্ঠান কমিয়ে দেওয়ার

এবং হিন্দির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি সভাপতিরূপে আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে কলকাতা দূরদর্শনের কেন্দ্র অধিকর্তার কাছে প্রতিবাদ জানাতে যান।

গত ২/২/৯৫ তারিখে কলকাতা বইমেলায় আমরা যে গুণিজন সংবর্ধনার আয়োজন করি তাতে সংবর্ধনা জানাই সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, ক্ষুদিরাম দাস, সুধী প্রধান, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণলাল দাস মহাশয়কে। বস্তুতঃ বইমেলায়, নন্দনে এবং শিশির মঞ্চে,- সমিতি আয়োজিত তিনটি সভাতেই তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বাংলা ভাষায় এবং সংস্কৃতির আসন্ন সংকটের বিষয়টিকেই তুলে ধরে বাঙালীকে জাতিগতভাবে আরো সচেতন হওয়ার আবেদন রাখেন।

এ হেন একজন সংবেদনশীল এবং প্রতিবাদী মানুষকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে আমরা কৃতার্থ।

-০-

পরিচয়ের গভীরে ক্ষুদিরাম দাস

ধনপতি সামন্ত

আমরা সবে মাত্র বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি পরিষদ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছি। সাধারণের সুপ্ত প্রতিভা ও বাসনাকে কাজে লাগিয়ে বাঁকুড়ার মাটীতে গড়ে ওঠা লুপ্তপ্রায় রত্নরাজিকে বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার মহান কাজে ব্রতী হয়েছি আমরা। আমাদের আশা এমন একদিন আসবে যেদিন বাঁকুড়ার ঐতিহ্যময় গৌরব- কথা স্মরণ করে সকলের বুক গর্বে ভরে উঠবে।

আমরা জানি একাজ সহজ নয়। তাছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য প্রয়োজন বিদগ্ধমণ্ডলীর আশীর্বাদ ও সুচিন্তিত উপদেশ। আমাদের এই আন্তরিক বাসনা আংশিক পূর্ণ হ'ল- পণ্ডিতপ্রবর ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে। তিনি বাঁকুড়া জেলার মানুষ। অসাধারণ পণ্ডিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। আমাদের চলার পথে তিনিই গতি যোগাচ্ছেন।

একবার আমরা দুইজনে (ধনপতি সামন্ত ও শৈলেন দাস) এক গভীর উদ্দেশ্য ও সংকল্প নিয়ে কোলকাতার পথে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের লক্ষ্য বাঁকুড়ার লোক সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু মহৎ,

উদার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে কিছু জ্ঞান আহরণ করা। ট্রেনের কামরায় বসে আলোচনা হ'ল কার কাছে উপযুক্ত প্রত্যাশার দাবী জানানো যাবে? একের পর এক অনেকের নাম মনে পড়ল, কিন্তু সবার কাছেই কিছু না কিছু আনুষঙ্গিক বাধা অন্তরায় হয়ে উঠল। অবশেষে সব চিন্তা-ভাবনার শেষ ঘটিয়ে আমরা ড. ক্ষুদিরাম দাসের দ্বারস্থ হব বলেই মন স্থির করে ফেললাম। ইতিমধ্যে ড. দাসের সঙ্গে শৈলেনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে আমাদেরই অন্যতমা সহকর্মী নমিতা মণ্ডলের গবেষণা ব্যাপারে যাতায়াতের খাতিরে। তাই তাঁর সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে একটু যেন সংকোচ কেমন করে আমাদের মনের কথা, বাঁকুড়ার কথা তাঁর সামনে তুলে ধরব। কিংবা তিনি কি তাঁর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার মাধ্যমে আমাদের আশা প্রদীপকে উজ্বল করে তুলবেন। এরকম নানা চিন্তার জাল বুনতে বুনতে আমরা চলেছি। হঠাৎ মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব যদি বাঁকুড়ার অখ্যাত যুবক রামকিঙ্করের প্রতি স্নেহের দাক্ষিণ্য দিতে পারেন, তাহলে আমরাই বা ডঃ দাসের স্বস্নেহ সান্নিধ্য পাব না কেন? নিজেদের অজান্তে মনকে দৃঢ় করে আমরা এগিয়ে চললাম। অতীত অভিজ্ঞতা যেন আমাদের মনে নব প্রেরণা দান করল।

দিনটি স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন আমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটি আশুতোষ বিল্ডিং-এ দুপুরবেলা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কাজেই তাঁর খাস কামরায় সহজে প্রবেশ করা সমীচীন ছিল না, তবুও আমরা গেলাম, গিয়ে দেখি তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিশেষ কোন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন। আমরা কি করব ভাবছি এমন সময় তিনি আমাদের চমকে দিয়ে বলে উঠলেন আরে শৈলেন যে! কখন এলে, কি ব্যাপার .... ইত্যাদি। আমার সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম পরিচয়। আর এ পরিচয় ঘটিয়ে দিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শৈলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চলে যেতেই তিনি আমাদের তাঁর দু পাশে দুটি চেয়ারে বসিয়ে আমাদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ইতিমধ্যে চা এলো। চা পানের ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাদের শুনালেন তার বাল্যকালের সুখ দুঃখের কিছু কথা। এপ্রসঙ্গে এসে গেল বাঁকুড়ার বিষয় তিনি জানালেন বাঁকুড়া তাঁর কাছে কত আকর্ষণীয়। বাঁকুড়ার বুকে তাঁর আনন্দময় প্রহরগুলির স্মৃতি এখন তাঁর কাছে কত মূল্যবান। কাজেই আমাদের ইচ্ছা যে কত মহৎ সেকথা তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, এই তো চাই শৈলেন, বিশ্বের লোক আমাদের বাঁকুড়াকে জানুক। আমার কাছে বাঁকুড়ার প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। এযে আমার কিশোরের লীলাভূমি। তোমরা কাজ চালিয়ে যাও, আমি তো তোমাদেরই

একজন। ঐযে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন না, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক'। প্রয়োজনে তোমরা আমাকে তোমাদের 'শরিক' করে নিতে পার। কথা শুনে আমরা তো অবাক! এতখানি আশা করিনি। মহতের ধর্ম বুঝি বা পরকে আপন করা। নিজেকে সকলের জন্য বিলিয়ে দেওয়া! এই হ'ল আমাদের সাংগঠনিক পর্বের গোড়ার কথা।

দ্বিতীয়বার আবার আমাদের যেতে হ'ল একটু প্রয়োজনীয় জিনিস বুঝে নিতে। কেমন করে লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি চিনে নিতে হবে, কেমন করে সেসব জিনিস তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের সামনে, কোন্ কোন্ লক্ষণে প্রাচীন বিষয় গুলির গুণাগুণ বিচার করা যেতে পারে ইত্যাদি। আর এসব প্রশ্নের পথ নির্দেশ পাবার জন্য স্যারের কাছে আবার যেতে হ'ল।

এবারও আমরা দুই বন্ধু চলেছি কোলকাতার পথে। ট্রেনের কামরায় দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে দেশলায়ের উপর ছাপা একটা উড়ন্ত প্রজাপতির ছবিটা হঠাৎ আমাদের নজর কেড়ে নিল। প্রজাপতিটা উড়ছে ফুলে ফুলে –মধুর সন্ধানে, সৃষ্টির আনন্দে। আমাদের মনও যেন প্রজাপতি হয়ে উড়ে যেতে চাইছে সৃষ্টির উল্লাসে, অতীতের খোঁজে অমৃত পথের সন্ধানে। হঠাৎ 'শৈলেন' বলে উঠল 'স্যারের' লেখা পড়েছিস্ কিছু? রবীন্দ্রনাথের সবটুকু মধু আহরণ করে বংশধরদের জন্য রেখে যাচ্ছেন। তাঁর রবীন্দ্র পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। কথাবার্ত্তার মাঝখানে ট্রেন এসে থামল হাওয়ায়। সকালের কিছু পরে আমরা গিয়ে হাজির হলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি নির্দিষ্ট কক্ষে। গিয়ে দেখি তিনি সেখানে গোটা দুই ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এক গভীর কাজে বড় ব্যস্ত। হাতের কাজটা সেরে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে তারপর সেই উদাত্তকণ্ঠে প্রিয় সম্ভাষণ করে খোঁজ নিলেন আমাদের কাজ-কর্ম কিরূপ গতিতে এগোচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে বলতে লাগলেন,- দেখ ধনপতি, চলার পথে বাধা থাকবেই, তাবলে থেমে গেলে চলবে না। প্রকৃতির মধ্যে একটা গতি- এ গতিও জীবনের ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। চেয়ে দেখ এই বিপুল নগরে অজস্র লোক চলেছে কত প্রয়োজনে-দেখেছ এদের গতি, কথায় স্রোতে চলতে চলতে আমরা এসে পড়েছি টেমার লেনে স্যারের বাড়ীর দরজায়। আন্তরিক আপ্যায়নে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজস্ব কক্ষটিতে। ওঁনারই মেয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। খেতে খেতে আমরা আমাদের অভিলাষ জানালাম। সব শুনে তিনি তো অবাক্- একি করেছ তোমরা! আমাকে অতিথি করে দিয়েছ যে। না, না, আমি তোমাদের ঘরের মানুষ। আমি বাঁকুড়া যাব তাতে অত আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ কেন? তোমাদের

যখনই প্রয়োজন পড়বে আমাকে জানাবে আমি, নিশ্চয় সময় করে নেব। তাছাড়া তোমরা তো জান এসব লোক সংস্কৃতি চর্চ্চায় আমার নাড়ীর সম্পর্ক। একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মুখে এ হেন কথা শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম।

অবশেষে আমাদের দেওয়া নির্দিষ্ট দিনে তিনি আমাদের পরিষদের সম্পাদক শৈলেনের বাড়ী এসে পৌঁছালেন যথা সময়ে। এবার শুরু হ'ল আমাদের ' ফিল্ড ওয়ার্ক'। ১৯৮১-র জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা বেশ কয়েকজন মিলে বেরিয়ে পড়লাম রমাই পণ্ডিতের জন্মস্থান ময়নাপুরে প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে।

এখানে এই ময়নাপুরে জন্মেছিলেন শূন্যপুরাণ রচয়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাংলাসাহিত্যে অমর কবি রমাই পণ্ডিত; যাঁর অবদানে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য উজ্বল হয়ে উঠেছিল। এক ঢিলে দুই পাখী মারার মতো আমাদের এ অন্বেষণে দু'টো কাজ হ'ল। এক প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ ও কিছু উদ্ধার। দুই আমাদের সদস্যা নমিতা নমিতা মণ্ডলের গবেষণা কাজে উপাদান সংগ্রহ। সত্যি কথা বলতে গেলে নমিতা মণ্ডলের গবেষণা কাজের জন্যই আমরা স্যারের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছি, তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে এসেছি। লোক সংস্কৃতিকে জানতে ও চিনতে শিখেছি অবশ্য এসব কাজে নমিতা মণ্ডলের অবদানও অনস্বীকার্য।

ময়নাপুর গ্রামে পৌঁছে সকলে মহা আগ্রহে পুঁথি খোঁজা ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ইণ্টারভিউ নেওয়ার কাজে মেতে গেলাম। প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে, মুক্ত আকাশতলে রমাই পণ্ডিতের বাস্তু-ভিটার বসে সেদিন জ্ঞানী রসাবত্তা ক্ষুদিরাম দাসের এক অপূর্ব মানববোধের পরিচয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। প্রায় ১৫০-২০০ মতো প্রাচীন পুঁথি ও পুঁথির পাতা গ্রামবাসীরা মহা উৎসাহে আমাদের সামনে জড় করে দিয়েছিল। স্যার অধীর আগ্রহে পরম স্নেহে একটির পর একটি পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। তাঁর সেই আকৃতি দেখে মনে হতে লাগলো মা যেন তাঁর হারানো সন্তানকে বহুদিন পরে ফিরে পেয়ে ধূলো ঝেড়ে তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। ফেরার পথে চতুর্দিকের গাছ-গাছালি দেখে তিনি শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, দেখ, দেখ, সবুজ গাছের কি অপরূপ সৌন্দর্য্য। এই অরণ্য সম্পদই আমাদের ধাত্রী। এভাবে বহুবিধ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম বিষ্ণুপুরে। আদি নাম বনবিষ্ণুপুর। প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় পীঠস্থান। এখানে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কেটেছিল পরম আনন্দে। স্থাপত্য শিল্পে অনন্যা বিষ্ণুপুর যেন নন্দন নিবাসিনী অপরূপা অপ্সরা।

সুদীর্ঘ বনপথ, কারুকার্যময় মন্দির, সুপ্রশস্ত সায়র (দীঘি) যেন মহাকালের দরবারে অতীতের সাক্ষীরূপে নায়িকা সহাস্য বদন। চপল নর্ত্তকী হংসের সারিবদ্ধতা, তীর বিদ্ধ অসহায় হরিণ, ইত্যাদি ইত্যাদি মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিষয়ক নিদর্শনের অপূর্ব মহিমার কথা স্যার অতি সংক্ষেপে, অতি সহজ ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। ছোট মানুষটির অন্তরের বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের ঢেউ যেন আমাদের অন্তরের আলোড়ন তুলে গেল।

১৯৮৫ সালে তিনি আবার এলেন আমাদের সাদর আহ্বানে। আবার আমরা তাঁকে আমাদের মাঝখানে পেলাম পরম আত্মীয়রূপে। বাঁকুড়ার ডি. ও. সি, হলে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় বাঁকুড়ার ভাষা নিয়েও আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তখন বাঁকুড়ায় রামকিঙ্কর স্মারক সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে মহান শিল্পীকে জাগরুক করে রাখবার জন্য। তাই সকলে সিদ্ধান্ত নিলেন বাঁকুড়ায় সুসন্তান মহান শিল্পীর স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমিকে যথার্থ পরিচয়ে ধন্য করে তুলবার জন্য তাঁর নামাঙ্কিত পবিত্র স্মৃতিফলক স্থাপন করতে হবে। এজন্য আনা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রভাস ফাদিকরকে। তিনি স্মৃতিফলক স্থাপনের মধ্য দিয়ে এ জেলার সন্তান বিশ্বজয়ী ভাস্কর রামকিঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। প্রভাস ফাদিকরের সঙ্গে সমমর্যাদায় আমন্ত্রিত হলেন আমাদের স্যার ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ও। রামকিঙ্কর স্মারক সমিতির সদস্যদের নয়, সমগ্র বাঁকুড়াবাসীর মনে সেদিন আনন্দের সাড়া জেগেছিল। রামকিঙ্কর বাবুর ভাইপো দিবাকর বেইজের সাহায্য ও তৎপরতায় শিল্পীর স্মৃতি বিজড়িত ঘরটি শিল্পীর শিল্পসম্ভারে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। যোগীপাড়ার রাস্তায় তৈরী হয়েছিল বিশাল ডায়াস। সেখানে প্রথম বক্তব্য রেখেছিল তৎকালীন জেলা শাসক কল্যাণী চৌধুরী। শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন শিক্ষাবিদ্ অরুণাভা সরকার, প্রাক্তন পৌরপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক অবনী ভট্টচার্য প্রমুখ গুণীজনেরা। সব শেষে শুরু হয়েছিল স্যারের ভাষণ। তাঁর ভাষণে মর্মস্পশী হয়ে উঠেছিল সভা পরিবেশ। বহুজন উপলব্ধি করেছিল নিজের দেশ ও দেশের মানুষের মূল্যবোধ।

১৯৮৬ সালে আমাদের সাদর আহ্বানে আবার তিনি এলেন বাঁকুড়ায়। এবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শত পঞ্চবিংশতিতম জন্ম দিবস পালন করার দায়িত্বে তাঁর আগমন। অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোল বাঁকুড়া জেলা তথ্যকেন্দ্রের হলগৃহে। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ে যে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা

অতুলনীয়। শুধু বাঁকুড়াতেই নয়, বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বক্তৃতা বড়ো জোরালো। তাঁর বক্তৃতা শুনে মনেই হয় না ঐ মানুষটির মধ্যে এত তেজ, এত গাম্ভীর্য ও এত জোরালো ভঙ্গিমা আসে কি ভাবে।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস আজ আর আমাদের থেকে ভিন্ন নন। সুখে দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় তিনি আমাদের চলার পথে দিশারী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি' পুরস্কার। এ সম্মান প্রদানে আমরা গর্বিত। বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামের হেড পণ্ডিতের 'ক্ষুদে' আজ ৭০ বছরের পরিণত ডঃ ক্ষুদিরাম দাস।

আজকের এই কর্মব্যস্ততার যুগে একটু সময় করে আমরাও আমাদের প্রিয় 'শিক্ষক'কে তাঁর ৭০ তম জন্মজয়ন্তীতে দিতে চাই কিছু সম্বর্দ্ধনা। আয়োজন আমাদের সামান্য, কিন্তু আমরা জানি 'জীবনে জীবন যোগ করা, না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা'। আমরা সেই অকৃত্রিম আন্তরিকতা সহকারে তাঁর দীর্ঘ নিরাময় জীবন ও তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

-০-

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চোখে

ক্ষুদিরাম দাস এবং শক্তিনাথ ঝা

আজিজুল হক

মানুষ দুই রকমের। মৌমাছি চরিত্রের মানুষ। মাছি চরিত্রের মানুষ। মৌমাছিরা গৃহস্থের পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যেও বেড়ে ওঠা একটি গাছের ফুল থেকে মধুই সংগ্রহ করে থাকে। আর মাছিগুলো সুন্দর মুখে কোথায় একটা ব্রণ বা ক্ষত সেখানটাকে ভন ভন করে। কাগজ খুললেই কে কত চুরি করেছে কিংবা কে কার কাপড় খুলে দিচ্ছে তার বিশদ বর্ণনা। মনে হয় না মানুষ বলে কোন প্রাণী এই দেশে আছে। "হুম মানুষ কোথায় ম'শায়? – কেমন ছেলেকে মানুষ করেছে দেখুন তো? একজন বিলেতে, একজন স্টেটস্-এ' যে বাচ্চারা 'অ্যা' করে না, 'হিসি' করে না, 'পটি' করে। মানুষ হয়ে উঠেছে বটে তারাই।" সত্যিই কি এত দুরবস্থা আমাদের? পচা-গলা এই ব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের উৎস সন্ধানের কাজে উৎসর্গীকৃত কত মানুষ প্রতি নিয়ত নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কেন খুঁজে পান না আমাদের মাধ্যমগুলো? তারা উপেক্ষিত সরকারি বেসবকারি স্বীকৃতি থেকে।

অ্যাকেডেমিসিয়ানরা হাতড়ে মরেন পুরস্কার দেবার জন্য। অবশ্যই এটাও ঠিক, রাজা যখন কাউকে পুরস্কার করেন, তার জীব আর বুড়ো আঙুলটা কেটে নেন।

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস

আশিতে পড়লেন ক্ষুদিরামবাবু। রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর কে বা কারা রটিয়ে দিল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সেলুন খোলা হোক, নাপিত এসেছে রামতনু অধ্যাপক হয়ে'। হ্যাঁ, তিনি নাপিতের ছেলে। একেবারে গেঁয়ো। এটা তাঁর গর্ব, আমাদেরও। বাঁকুড়ার এক গ্রামে যখন তাঁর বাবা-মা আত্মীয়রা এই মানব শিশুটিকে দেখেন তারা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন এই ছোটখাটো ছেলেটা বাংলা ভাষায় ইতিহাসই পাল্টে দেবে। আচার্য সুনীতি চাটুয্যে কিংবা ছান্দিক প্রবোধ সেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলবেন, একটা মহান সাহিত্য বিচারের ধারাটাই পাল্টে দেবেন। তাঁকে দেখার

পর কোন বার্নাড শ-এরই আর বলার সাহস হবে না কেবলমাত্র মলাট পড়াটাই ভাল সমালোচকের যোগ্যতা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাৎপর্যটাই পাল্টে গেছে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে তার চারখানা গ্রন্থে। এসব কথা আলোচনা করার জন্য অনেক লোক আছেন। বিলেতে সাহিত্য থেকে একটা যুগের ইতিহাস এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা আর লেখকের অবস্থান আবিষ্কার করার কাজ জর্জ থমসনকে আমরা দেখেছি। ডক্টর দাসের হাতে পড়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বাংলা ভাষাটা যে সংস্কৃতজাত নয়, ব্রাহ্মণ্যবাংলা এবং লোকায়তিক বাংলার সংগ্রামেই ইতিহাসই হল বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস। এটা তিনিই তুলে ধরেছেন।

লোকায়তিক বাংলাকে আবিষ্কার করতে এই আশি বছরেও তিনি তরুণ। আজও ঘুরে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামে। বিচলিত হন মানুষের ওপর আক্রমণ দেখলে। যে-কোন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে অবিচল ক্ষুদিরাম দাস। ৭২-৭৬ সালের কালোদিনগুলোতে কৃষ্ণনগর-কলকাতা যাত্রীরা নিশ্চয় দেখেছেন একজন মানুষ ট্রেনের কামরায় চেঁচাছেন, '..... এ অন্যায়, ছেলেগুলোকে এভাবে খুন করা অন্যায়। ধরুক আমাকে-' ইনিই ডঃ দাস। আজও দেখি বিশ-পঁচিশজন লোক নিয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তিনি চিৎকার করতে করতে চলেছেন; 'বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ওপর হামলা' রুখতে হবে। সংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে আজও মাঠেময়দানে ঘোরেন তিনি।

তৈরি হয়ে পড়ে আছে এক অসাধারণ কাজ। বাংলা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক অভিধান। তার সব মূল্যবান গ্রন্থের মতই এটাও হয়ত কেউ তুলে নিয়ে চলে যাবে মুনাফা কামাবার জন্য। 'গ্রন্থস্বত্ব' সহ। নির্বিকার তিনি।

হাওলা-কাওলার ঢাক বাজনার মাঝে এঁরা কাজের কাজটা করে যাচ্ছেন। সাহিত্য অ্যাকাডেমি বা বাংলা অ্যাকাডেমি এদের দেখতে পান না। অ্যাকাডেমি হয়ে গেছে 'যাদুঘর' । মৃতের স্মৃতিতে ভরা- একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র। জীবিত উদ্যোগীরা সেখান থেকে অনেক দূরে। বন্ধু-বুদ্ধদেব ভট্টচার্য নিশ্চয় রাগ করবেন না, তারই পরিচিত দু'জনকে যদি আমি এ বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে নির্বাচিত করি। এই যুগেও ওঁরা আছেন। সুতরাং আমাদের মারে কে?

(প্রতিদিন, অতিথি, ৫ জুলাই ১৯৯৬)

বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী চোখে

একালের অন্যতম অগ্রণী রবীন্দ্রভাবুক

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্গে আমার আলাপ সরকারী কলেজে চাকরির সময়। ঘনিষ্ঠতা হয় যখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অগ্রজ সহকর্মীরূপে তিনি ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আর মনস্বী চিন্তকরূপে ছিলেন সমাদর ও সম্ভমের পাত্র।

আমাদের সময়কালে এমন মনস্বী খুব বেশী ছিলেন না। ক্ষুদিরাম দাস (জন্মঃ বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে, ১৯১৬ সালের ৯ই অক্টোবর; মৃত্যুঃ কৃষ্ণনগর শহরে ২৮শে এপ্রিল ২০০২) কৃতী ছাত্র, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী দায়িত্বশীল সংস্কৃতি কর্মীও বিশিষ্ট চিন্তাবিদরূপে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ডি-লিট উপাধি লাভ করেন। (রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় গ্রন্থের জন্য)। তাঁর সংবর্ধনাসভায় অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'ক্ষুদিরাম আজ বিশাল রাম হ'ল।' সত্যি তাই-ই হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থঃ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়(১৯৫৩), বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (১৯৫৮) চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী (১৯৬৬), বৈষ্ণব রস প্রকাশ (১৯৭৩), সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৮), রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার (১৯৮৪), বানান বানানোর বন্দরে (১৯৯৪), চৌদ্দশ' সাল ও চলমান রবি (১৯৯৪), দেশ কাল সাহিত্য (১৯৯৫), সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান (১৯৯৮),বাছাই প্রবন্ধ (২০০০) তাঁর নিজস্ব সম্পাদনাঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১৯৭৮)।

এই বইগুলির পাতা ওল্টাতে শুরু করলেই অনুধাবন করা যায়, ক্ষুদিরাম দাসের কৃতিত্ব। তাঁর অধ্যায়ন দুরবিস্তৃত, পণ্ডিত্য গভীর, বিশ্লেষণশক্তি ক্ষুরধার, প্রকাশ সামর্থ্য অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ।

ক্ষুদিরাম দাস এসেছিলেন বাঁকুড়া জেলার এক গ্রাম থেকে। অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়। এবং বর্ণহিন্দু

সহপাঠীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন উপহাস। (পরবর্তী জীবনে তেমন একজন সহপাঠী আমার কাছে তা কবুল করেছিলেন)।

সরকারী পদে (প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক) ও কলকাতার দু-একটি স্কুলে শিক্ষকতা করার পরে কলকাতায় তিনটি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক পদে কাজ করার পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার লেকচারার পদে যোগ দেন ১৯৪৫-এ। তারপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সেদিন থেকে পরবর্তী ২৮ বছর (১৯৪৫-১৯৭৩) বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং অনেক বাধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ি পদে যোগ দেন। নয় বছর (১৯৭৩-১৯৮১) তিনি এই পদে কাজ করেন। আমরা দেখেছি, তখনও তাঁকে পদে পদে নানা বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। (সেগুলি কথা এখানে বলা শোভন হবে না)।

অধ্যাপক দাসকে তাঁর ১৯৬২ সালে ডি.লিট প্রাপ্ত বই 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছি এবং জেনেছি এই বইয়ের পরিকল্পনা ও রবীন্দ্র বিচারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনার কথা। ৪র্থ সংস্করণে (১৯৮৪) ভূমিকাচ্ছলে বইটি লেখার ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও মননগত বক্তব্য পাঠকমাত্রেরই জানা উচিত। তাঁর কথা।

" বইটি লেখার একেবারে প্রারম্ভ ১৯৪৯ খ্রীঃ বৈশাখ গ্রীষ্মবকাশে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করি। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লেখার পর পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে ঐ বছর নভেম্বরের শেষে সহধমিণীর মৃত্যু হয়। পরবর্তী প্রায় দু বছরের সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক রাজ্যে আমার সঞ্চারণ ঘটে লৌকিক সংবিৎ ফিরে এলে মাস-পাঁচের মধ্যে অনায়াসে সব বইটা লেখা হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, উক্ত আঘাত এবং তার ফলে অধ্যাত্মে পরিভ্রমণ আমার কাব্যোপলব্ধিকেও আশাতীতভাবে বাড়িয়ে তোলে। ..... স্বাধীন ও মুক্ত মন নিয়ে মৌলিকভাবে আমি লিখতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র সমালোচক পূর্বসূরীদের অনেকেরই লেখা আমি পড়িনি, যাও-বা পড়েছি তার কোনো সংস্কার আমাকে আক্রমণ করতে পারেনি। আমার বহু -অভিজ্ঞতার পর আজ আমি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই, তারা যেমন প্রথমে মুক্তচিত্তে স্বকীয়ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যকবিতা পড়ে নেন। এতে তাঁরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে রবীন্দ্রকাব্যকল্পে বিশুদ্ধ কবিতাই আছে, কোথাও সামান্য তত্ত্ব-সংস্পর্শ থাকলেও তা কাব্য সঙ্গতিহীন নয়।"

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ডি. লিট, বিশিষ্ট রসবোদ্ধা, রবীন্দ্র-বিশেষত্বের এই অভিমত অধুনা রবীব্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ প্লাবিত সংশয়ে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছিলাম, কোন কারণে এই বইটিকে ডি. লিট উপাধি দিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, রবীন্দ্রকাব্যের সাময়িক পরিচয় ও ঐক্যসূত্রদানের জন্যই ক্ষুদিরাম দাসকে আমরা ডি.লিট দিয়েছি। গ্রন্থকারের বক্তব্যঃ " কবির উপলব্ধি একটি ঐক্যের সূত্র ধরে অগ্রসর হলেও, বিভিন্নকালের বিশেষ প্রবণতা ও বিকাশের পর্যায় অনুসারে তাঁর কবি-কৃতিত্বকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যাস করে দেখেছি।" এ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ – আশ্বিন ১৩৬০। চতুর্থ ও শেষ পরিমার্জনঃ ২৫ বৈশাখ ১৩৮৪। 'বনফুল' থেকে 'শেষ লেখা' –রবীন্দ্রকাব্যের দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বেরিয়ে তিনি লিখেছেন (পৃঃ ৩৩৪, ৪র্থ সংস্করণ) – 'যদি রবীন্দ্রনাথের পরিণামী উপলব্ধিকে মন্ত্রের মতো কোনো একটি বাণীতে সংগ্রথিত করে শোনাতে হয়, তাহলে তা উপনিষদের কোনো মন্ত্র হবে না। হবে এই নাটকেরই ('তাসের দেশ') উপসংহারে উদাত্তকণ্ঠে গীত- জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্।'

ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন একাধিক গ্রন্থ। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ছোট বই 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার (১৯৮৪)। বইটি পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সর্বজনবিদিত। তা নিয়েই রচিত এই বই। 'দু-চার কথা'য় তাঁর বক্তব্যঃ " রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে, পড়াতে এবং লিখে আলোচনা করতে প্রখর কাব্য বুদ্ধি ছাড়া অন্য যে ক'টি বিষয়ের প্রাথমিকজ্ঞান অর্জন করে নিতে হয়, তা হলো রাগ- রাগিণীসহ সঙ্গীত, স্বাদেশিক স্মাজ-ইতিহাসসহ কিঞ্চিৎ বিশ্ব ইতিহাস এবং আধুনিক বিজ্ঞান। নভোবিজ্ঞান-পরিচিতি ছাড়া কবির শেষার্ধের বহু কবিতার আধা-পরিচয় পেয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়। সবিনয়ে স্বীকার করছি, আমার পক্ষেও আগে তা-ই ঘটেছে। ক্লাসে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে মনে অনুভব করেছি বাধা। বিষয়টি অধিগত করেছি যখন, তখন মনে হয়েছে যে, আগে ঐ নভোবিজ্ঞানটাই সাহিত্যের ছাত্রদের আয়ত্ত করিয়ে নেওয়া উচিত, সীমিত সময়ে যা সম্ভবপর নয়। অতএব আর একটা বই লিখতেই হয়। ..... যদি কোনো বিজ্ঞান-বেত্তা কাব্যবোধ ও রবীন্দ্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিয়ে লিখতেন তাহলে আরও সুবিচার করতেন এমন মনে করি।"

এই ভূমিকা আমাদেরকে বিস্মিত করে দেয়। লেখকের আত্ম-উদঘাটন, জ্ঞানের ঘাটতি ও তা পুরণের প্রয়াস এখানে যুক্ত হয়েছে তাঁর রবীন্দ্রবিচারের

সঙ্গে। মুক্তমনা, যুক্তিবাদী, পরিবেশ প্রকৃতি ও বিজ্ঞান-সচেতন একটি লেখক-মনের এই উন্মাদনা অবশ্যস্মর্তব্য। ১৩৮ পৃষ্টার এই বই লিখতে তিনি যেসব বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়েছেন, তাঁদের নামোল্লোখেই এটি বোঝা যায়- আইনস্টাইন,আকিমিডিস, আর্য ভট্ট, এডিংটন, কির্কহফ, কেপলার, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, জগদীশ বসু, জেমস জীনস,ভাস্কারাচার্য, মেণ্ডেলিফ, ম্যাকসওয়েল, রয়েটজেন, রাদারফোর্ড, সুশ্রুত, হেলমওহোসে। স্বীকার্য এই ছোট বইটিতে মনস্বী ক্ষুদিরাম দাসের নতুন পরিচয় পাই।

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসায় ক্ষুদিরাম দাস নিরত ছিলেন আজীবন। তাঁর রবীন্দ্র-অন্বেষা ধাবিত হয়েছে নানাপথে। তার প্রমাণ আরও দুটি গবেষণাগ্রন্থ; মানস মজুমদার লিখেছেন, এটির প্রকাশ ১৯৭৮; এই তারিখ বোধহয় ঠিক নয়। লেখক ক্ষুদিরাম দাস একইদিনে আমাকে উপহার করেছিলেন এই বই দুটি –দু'টিতেই লিখেছেন; ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়- প্রতীনিলয়েষু- ক্ষুদিরাম দাস' সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ বইতে তারিখ দিয়েছেন, ২/৫/৭৪ আর 'চিত্রগীতময়ী' রবীন্দ্রবাণীতে সই করে তারিখ দিয়েছেন ২১/৮/৭৪।

মনস্বী ক্ষুদিরাম দাসের রবীন্দ্রচর্চার দুটি দিক এই বই দুটিতে প্রকাশিত। চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণীতে বাংলার কাব্য সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকে রবীন্দ্রকাব্যপথ ধরে পরিক্রম করেছেন। রবীন্দ্র কাব্য সৌন্দর্যভাবনা উন্মোচন করেছেন। 'চোখেদেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে / রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে/ ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল/ আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রকাল।' এই রবীন্দ্রবাণীকে কেন্দ্র রেখে তাঁর রবীন্দ্রকাব্য সৌন্দর্য সন্ধান। আর 'সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ'-এ রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনার নিপুণ বিশ্লেষণ। তাঁর কথায় –তারণ্য এবং প্রগতিকে রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোন মহাজনই বা এত প্রবলভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন? মনোগত একাধিক আক্ষেপেই আমাদের এই পুস্তিকা গ্রহণে প্রবর্তিত করেছে। .....মনস্বী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মনন-চিন্তা এবং কবি হিসাবে তাঁর কল্পনাবস্তু দৃশ্যত পৃথক ব্যাপার হলেও, অনেকক্ষেত্রেই যে মৌলভাবে এক, এটিও দেখানোর প্রয়াস, প্রগতি-গুরু মহাকবিকে সব মিলিয়ে বিচার করার প্রেরণায় তিনি এ বই লিখেছেন। সমাজ সচেতন রবীন্দ্রনাথকে এখানে বড় করে তুলে ধরেছেন সমাজ-সচেতন ক্ষুদিরাম দাস।

(গণশক্তি ১২ ই মে রবিবার, ২০০২)

আত্মজার চোখে

আমার বাবা

বাণীমঞ্জরী দাস

আমার বাবা ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মেধা, পাণ্ডিত্য, মননের স্বাক্ষর তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে যা ভবিষ্যৎকালে বিস্তৃত হবে। তাঁর উত্তরধিকার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, যাঁরা আজ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু আমরা হারালাম আমাদের অত্যন্ত নিকট মানুষটিকে যিনি আমাদের বিরাট পরিবারকে টেনে ধরে রেখেছিলেন- মায়ের মৃত্যুর পর প্রায় চব্বিশ বছর ধরে, বাবা-মা দু'জনের দায়িত্ব একই সঙ্গে পালন করে।

সারস্বত জীবনের পাশাপাশি বাবা ছিলেন একজন পরিপূর্ণ গৃহী। বোধহয় অধুনা লুপ্ত ভারতীয় গৃহধর্মের একজন বিরল প্রতিভু।

আমাদের বাড়ীতে অতিথি আসা নিত্য ঘটনা ছিল। এই সূত্র বহু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছে। এ বিষয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাবার কাছে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের যে সমাদর ছিল, একজন নগণ্য আত্মীয় বা প্রার্থীরও সেই একই সমাদর ছিল। এ বাবদে তাঁর যে সময় নষ্ট হচ্ছে এমন সামান্য অসন্তুষ্টিও তিনি কখনও প্রকাশ করেননি। আমার মাও এবিষয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন-অনেক রাত্রে উঠে অতিথিদের জন্য ভাত বা খিচুড়ি চাপাচ্ছেন এ আমরা বহুবার দেখেছি।

বাবা ঘোর সংসারী ছিলেন কিন্তু সাংসারিকতা তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেছেন, খরচ করেছেন বেহিসাবী। বাজারের বড়ো মাছটি বাজারওয়ালারা ওজন না করেই তাঁর ব্যাগে দিয়ে দিত। শাকবিক্রেতাদের ইচ্ছে করে পয়সা বেশী দিতেন-নইলে তারা পাবে কোথায়? হাতে কিছু টাকা এলেই বাগান পরিষ্কার করা বা পুকুর সংস্কার করা এ ধরনের কাজে লাগিয়ে দিতেন–যতো তাড়াতাড়ি টাকাটা খরচ করে ফেলা যায় এবং কিছু গরিব লোক টাকা পায়। হিসাব করে চলা বা সঞ্চয় করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। বাবা কোনও মন্তব্য করার বিষয়েও ছিলেন বেহিসাবী। কেউ অসন্তুষ্ট হবেন বা নিজের কোনো ক্ষতি হবে এ কথা ভেবে মত প্রকাশকে সংযত করেননি কখনও। এইটি অনেক

ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষতিও করেছে। মানুষকে তিনি খুবই গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, পাত্রাপাত্র ভেদ তাঁর ছিল না।

যাই হোক, বাবার প্রাচুর্য অর্থে ছিল না, ছিল মনে, আমাদের বাড়ীতে আমাদের পূজোর জামাকাপড় কদাচিৎই আসত কিন্তু কাজের লোক ও প্রার্থীর পোশাক এবং শীতের কম্বলের জন্য বাবার অর্থাভাব কখনও হতো না! মাঝে মাঝেই বাবার দু-একটা জামা বা ধূতির হিসাব মিলত না পরে জানা যেত তা কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবা বোধহয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে হোমিওপ্যাথি চর্চা শুরু করেন। খুব জটিল কয়েকটা রোগও সারিয়েছিলেন। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ডঃ চক্রবর্তী তাঁর ছেলের জন্য প্রায় আসতেন। পরে ছুটির দিন সকাল-গুলোতে আমাদের বারান্দার ভরে যেত রোগীতে- বিনামূল্যে ওষুধের সঙ্গে তাদের পথ্যও দেওয়া হতো কিনা।

সকলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি বাবা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। পারিবারিক সম্পর্কের বাইরেও প্রতিটি চিঠির উত্তর যথাসময়ে দিতেন। তাঁর অসাধারণ ভালো তীক্ষ্ণ ছোট ছোট অক্ষরে লেখা চিঠিগুলি চোখের সামনে ভাসছে। বলা বাহুল্য অনেক কিছুর মতো এ শিক্ষাও আমরা নিতে পারিনি। বিজয়া দশমীর দিন আমাদের বাড়িটি ছাত্র, বন্ধু অনুরাগীর উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। বাবা আবার 'শক্তি মন্দিরে'ও(কো-অপারেটিভ) যেতেন যাতে সকলের সঙ্গে দেখা হতো। কোন গুরুতে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু মানবতাবোধে আদান্ত স্পন্দিত বাবা তাঁর বাবার গুরুভাই লছমন দাস আমাদের বাড়িতে এলে যেভাবে তাঁকে আতিথ্যদানে মগ্ন হয়ে পড়তেন তা ভুলবার নয়।

আমাদের 'কৃষ্ণনগরের' বাড়িতে বাইরের কেউ না কেউ পোষ্য হিসাবে থাকত। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় তো বহু ছাত্র থেকে পড়াশুনা করে গেছে কিছুদিন আগে পর্যন্তও। কেউ পড়তে এসেছে, থাকার জায়গা পাচ্ছে না, এটি বাবা মানতে পারতেন না – হয়তো ছাত্র জীবনে নিজের আশ্রয় সন্ধানের কথা মনে রেখেই।

বাবা প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন। কৃষ্ণনগরে পুকুরপাড়ে কয়েকটি ডাহুকের বাসা আছে, বাবা পুকুরে নেমে তাদের খেতে দিতেন- তারাও বাবাকে ভয় পেত না। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবার একটা আলাদা আনন্দ ছিল- প্রতিটি গাছপালা, নদী তিনি চেনাতে চেনাতে নিয়ে যেতেন। ভুগোলে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল- কোন্ বিষয়েই বা ছিল না? পাটি-গণিতের দুরূহ অঙ্ক অনায়াসে করে ফেলতেন।

গ্রহ-নক্ষত্র চেনার পাঠ আমাদের বাবার কাছেই। আকাশে ধূমকেতু উঠলে তা আমাদের না দেখে উপায় ছিল না তা সন্ধ্যাবেলাই হোক্ বা ভোরবেলা।

কৃষ্ণনগরের চার্চের মাঠ থেকে বিশাল ধুমকেতু দেখার কথা এখনও মনে আছে। আর পূর্ণবাবুর (কৃঃ কলেজে তখনকার প্রিন্সিপ্যাল) কোলে উঠে মঙ্গল ও চাঁদ দেখার কথা। বাবার খুব সখ ছিল হ্যালির ধূমকেতু দেখবেন-তাঁর জন্মের কিছু আগে তা উঠেছিল তিনি গল্প শুনেছিলেন। তাঁর সংশয় ছিল তিনি ততোদিন বাঁচবেন কি? বেঁচেছিলেন, কিন্তু হ্যালি প্রতরণা করলো। বাবা জ্যোতিষ জানতেন। রীতিমতো চর্চাও রেখেছিলেন- এই সূত্রেও বহুমানুষ বাবার কাছে এসেছেন। বাবা সঙ্গীত চর্চাও করেছেন। আমাদের প্রথম মায়ের জীবনাবসানের পরে কতগুলি গান বাবা নিজেও গাইতেন, আমাদেরও গাইতে শিখিয়েছিলেন- হৃদি বৃন্দাবনে বাস, তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, কেন রে এই দুয়ারটুকু..... (শ্রীরাম স্তোত্র- 'উদ্বোধন')

স্বভাবের দিক থেকে বাবা ছিলেন স্ফূর্তিবাজ। আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন, তাস খেলা, ক্যারাম খেলা-আমাদের সঙ্গেও খেলেছেন। বিশেষত লাল ঘুঁটি আকর্ষণ তাঁর ছিল অদম্য। এই মন ছোট বয়সে অনেকেরই থাকে, বাবা তা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধতা মতবাদজনিত মনান্তর এসবের বাইরেও বহু শোক তিনি পেয়েছেন। দুই পত্নীর অকালমৃত্যু, নিজের হাতে সন্তানস্নেহে মানুষ করা , দুই ভাই-এর মৃত্যু, তাঁর মনের সঙ্গী আমাদের সম্পর্কিত দাদা প্রবোধ সরকারের মৃত্যু, অত্যন্ত প্রিয় পুত্রবধূ ও সর্বশেষ বড়ো জামাতার মৃত্যু তাঁকে কাতর করেছে কিন্তু পর্যুদস্ত করতে পারেনি। জীবনকে বাবা শেষদিন পর্যন্ত ভালো বেসেছেন। কোনও মজার ঘটনা ঘটলে বাবাকে যতক্ষণ না বলা হতো আমাদের শান্তি ছিল না, তিনি তা উপভোগও করতেন। মর্মাহত হতেন, যুদ্ধদাঙ্গার মতো অমানবিক ঘটনাতে। আমাদের বাড়িতে নিজস্ব লোকসংখ্যা কম ছিল না-তার উপর বাইরের লোকে আমাদের বাড়ীটি ছিল কোলাহলপূর্ণ। বাবার আলাদা কোনও পড়ার ঘর এমনকি পড়বার টেবিল ছিল না। এতকিছুর মধ্যে একটি চেয়ারে বসে খাটের উপর খাতাটি রেখে তিনি যখন লিখতেন মনে হতো না বাইরের কোন কিছু তাঁকে স্পর্শ করছে। নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখেছি। সেই সময় ডাকলে তিনি চোখ তুলতেন কিন্তু মনে হতো জগৎ তাঁর কাছে ছায়া হয়ে গেছে। তাঁর সেই আশ্চর্য গভীর স্বচ্ছ দৃষ্টি- আমাদের কাছের বাবা তখন সুদূর।

এখন তিনি আরও সুদূর। কিন্তু তাই কি? আমাদের প্রতিটি অনুভব আনন্দ বেদনা তাঁর সঙ্গে জড়ানো। হয়তো তাই থাকবে আমৃত্যু।

(গণশক্তি, ৯ই জুন, রবিবার, ২০০২)

-০-

বাবার সান্নিধ্যে সেই সোনার দিনগুলি

ভারতী দাস

সদ্য প্রয়াত আমার বাবা ক্ষুদিরাম দাসের পাণ্ডিত্য নিয়ে আলোচনা করার মতো জ্ঞান আমার নেই। খুব কাছের মানুষ হিসাবে তাঁকে যেমন দেখেছি- সে সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচারণ করব।

সত্যি বলতে কি বাবার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। নিজের রীতিতে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন। 'বাবা' বলতে যে গম্ভীর গার্জিয়ানের রূপ চোখের সামনে ফুটে ওঠে বাবা ছিলেন তার উলটো। খেয়ালী, আপনভোলা মানুষটি ছিলেন সদাহাস্যময় এবং প্রাণচঞ্চল। জীবন তাঁকে অনেক দুঃখ দিলেও যে প্রাণপ্রাচুর্য্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তার ছোঁয়ায় তাঁর পরিপার্শ্ব মেতে থাকতো। প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকাকালীন পূজা বা গ্রীষ্মবকাশ যখনই বাবা গ্রামের বাড়িতে আসতেন-পৌষল্লা, ফীস্ট, বিকালে শালের জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া, লোহাপাথর চেনা, দুপুরে তাসখেলা, রাত্রে দেশী ও বিদেশী গল্প বলার আসর- এইভাবে হইহই করে সময়টা কেটে যেত। রাত্রে অন্ধকার দূর করার জন্য উঠানে গ্যাসের বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করতেন বাবা। প্রবাসী ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আগেই খবর নিতেন তাঁদের 'কাকু' কোন ছুটিতে বাড়ি আসবেন। তাঁরাও তখন গ্রামের বাড়িতে এসে জুটতেন। এরই মাঝে বাবা লোহার, বাউরি সম্প্রদায়ের পড়ুয়া ছেলেদের বিতরণ করতেন কলকাতা থেকে কিনে আনা–বই-খাতা, পেন্সিল, ঝর্ণা কলম ইত্যাদি এবং বৃদ্ধ ও 'মেঝান'দের উপহার দিতেন খদ্দরে চাদর, কম্বল ইত্যাদি।

পূজার সময় বাবা বাজি পোড়াতে ভালবাসতেন। আমাদেরও শেখাতেন। মহাসমারোহে বাড়িতে তুবড়ি, পটকা, বানানো হতো। তবে এগুলি পোড়ানো হতো বাড়ির মধ্যে। জমিদার বাড়ি দূর্গাপূজায় যাওয়া বাবা পছন্দ করতেন না। পরে গ্রামে সর্বজনীন পূজা চালু হলে আমরা সেখানে যেতাম। আমাদের গ্রামের বাড়িগুলি ছিল একই প্রাচীরের আওতায় 'গুচ্ছগৃহ' বা 'House Cluster' গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলত 'বাখুল'। আমাদের 'বাখুল' বাসীরা সবাই সমবেতভাবে আনন্দ উৎসব করতেন।

এবার বলি বাবার বাবা-মার কথা, দাদু সতীশচন্দ্র ছিলেন ধার্মিক, সৎ ও খেয়ালী। গ্রামের স্কুলে 'মাইনর' পাস করেছিলেন অর্থাৎ চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর বাল্যকালেই তাঁকে কলকাতায় আসতে হয় জীবিকার সন্ধানে। দাদু প্রথম পর্যায়ে মহাজনের দোকানে কাজ করতেন। এ সময়ে তাঁর নিজের মুখে শোনা, তিনি যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ির সামনে

দিয়ে ভোরবেলায় যেতেন তাঁকে দু'একবার রাস্তায় পদচারণা করতে দেখেছিলেন এবং একদিন সাহস করে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এই সুযোগ পাওয়াকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে বলি দাদুর সংগ্রহে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ে' প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ দেখেছিলাম। পরবর্তীকালে দাদু বাঁকুড়া কোর্টে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। খুব হাঁটতে পারতেন। বেলেতোড় গ্রাম থেকে বাঁকুড়া প্রত্যহ হেঁটেই যাতায়াত করতেন। এসময় একবার বাঘের মুখে পড়েছিলেন। নির্বিরোধী, নিরহঙ্কার মানুষটি সময় কাটাতেন নিজের মনে। রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসাগরের রচনা, দাশুরায়ের পাঁচালী, নীলকণ্ঠ পদাবলী পাঠ করতে করতে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে দেখেছি। গ্রামে যখন ছিলাম রোজ সন্ধ্যায় ধরে এনে নামতা মুখস্থ করাতেন, তারপর বলতেন আরব্য উপন্যাসের গল্প, রামায়ণের গল্প। একটু রাত হলে হরিনাম জপ করতে বসতেন, চলত গভীর রাত পর্যন্ত। দাদুর গুরুদেব ছিলেন মৌজীবাবা। থাকতেন নেপালের আশ্রমে। দুই একবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসে ছিলেন। তিনি রামের উপাসক ছিলেন। দাদুর পুত্রদের নামের মধ্যে তাই 'রাম' শব্দটি আছে।

বাবার মা কামিনীবালার মধ্যে ধর্মের আতিশয্য ছিল না। তবে লৌকিক দেবদেবীর পার্বন পালন করতেন। ইনি খুব ফর্সা, গৌরবর্ণের আধিকারিণী ছিলেন তাই সম্পর্কে বিশেষে পাড়ায় মানুষ 'রাঙা' 'রাঙামা' 'রাঙাবৌ বলে ডাকতেন। অত্যন্ত পরোপকারী এবং স্নেহশীলা ছিলেন। পাড়ার যে কোনো মাতৃহারা শিশু বড়ো বয়স পর্যন্ত তাঁর স্নেহে এবং আশ্রয়ে লালিত হতো।

বাবার দুবার বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নী প্রতিভার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া কাজলকে বিয়ে করেন। প্রথমা পত্নীকে বাবার দেওয়া নাম 'শ্যামলী'- যা রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে – 'প্রিয়তমা শ্যামলীকে' লিখিত অবস্থায় বাবার বইয়ের সংগ্রহের মধ্যে দেখেছি। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম বাবা ভালবেসে রাখেন 'শোভনা' তাঁর নামে বাড়ির নামকরণ করেন।

আবার বাবার মায়ের সম্পর্কে আসি। বাবার মা ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ। অভাবের সংসার তাই যতটা সম্ভব খেটে একটু স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করতেন। সংসারের প্রয়োজনে বাড়িতে মুড়ি ভাজতেন, জমিদার বাড়ি থেকে ধান এনে, সিদ্ধ করে, চাল কুটতেন-মজুরী হিসেবে কিছু চাল পাওনা হতো। বাড়িতে পাঁচ/ছটি গোরু ছিল। তাই দুধ, ঘি এবং আনুষঙ্গিক খাবারের অভাব ছিল না। দুধ কখনই বিক্রি করা হতো না। মায়ের কষ্ট কমানোর জন্য বাবা গোরুগুলি প্রতিবেশীদের দান করে দেবার বায়না তুলে 'Hunger strike' করেন। বাধ্য হয়ে ঠাকুমাকে প্রতিবেশীদের গোরুগুলি বিলিয়ে দিতে হয় কিন্তু গোরুগুলি কিছুতেই যেতে চাইত না, রোজই ঘুরে ফিরে এসে ঢুকতো আমাদের গোয়ালে।

ঠাকুমার কাছে শুনেছি, ছেলেবেলায় বাবা খুব ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। একবার বল মারতে গিয়ে ডান পায়ের মাঝের আঙুল দুটি উপরে উঠে যায়। সেই ভোগান্তির পর বাবার বল খেলায় উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। বাবা যখন বাঁকুড়া মিশনারি কলেজে পড়তেন তখন স্বগীয় রামব্রহ্ম কবিরাজের বাড়িতে থাকতেন। তিনি তাঁদের এত প্রিয় ছিলেন যে, রামব্রহ্ম কবিরাজমশায় নিজের বাড়ির অংশ তাঁকে লিখে দিতে চেয়েছিলেন। পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও বাবা তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করেননি। আসলে জাগতিক বিষয়ে তিনি ছিলেন মোহহীন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা বাবা শুরু করেন অল্প খরচে রোগ সারানোর জন্য। বাবার দাতব্য চিকিৎসালয়ে পথ্যসহ ওষুধ পাওয়া যেত। নদীয়া জেলা হাসপাতালের দু'একজন ডাক্তারবাবুও বাবার চিকিৎসায় উপকার পান এবং হোমিওপ্যাথির বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। ধনীদের বাবা ওষুধ দিতেন না, বলতেন বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখাতে কিন্তু গরীবদের ওষুধ নিতে আসার কথা থাকলে কাজ ফেলেও বসে থাকতেন।

বাবার কাছে আমরা কদাচিৎ বকুনি খেয়েছি। তিনিই বরং তাঁর ভুলের জন্য আমাদের কাছে বকুনি খেতেন এবং হাসতেন। বাবাকে ঠকানো খুব সহজ ছিল। কেউ এসে, 'আমি আপনার ছাত্র' বললে দামী বইও তাঁকে পড়তে দিয়ে দিতেন এবং তা কদাচিৎ ফেরত আসতো। অনেক বড়ো বয়সেও বাবা অবিবেচনা প্রসূত কাজের জন্য তাঁর মার কাছে বকুনি খেয়েছেন। ছোটো দুটি ভাই রাজেন্দ্র ও রামকুমার তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু ব্যাধিতে আক্রন্ত হয়ে তাঁরা বাবার বহু আগেই মারা যান।

মা-বাবাকে বাবা এত ভালবাসতেন। তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা যেন ছিলেন বাবার সন্তান। তাঁদের খুশি করার চেষ্টা তাঁর লেগেই থাকত। বলতেন, আমার বাবা-মা কতো কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছেন। সর্বদা নিজের ঘরে চোখের সামনে বাবা-মার ফটো টাঙিয়ে রাখতেন। মৃত্যুর পূর্বে ঠাকুমা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে বাবা মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে টানা তিন মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। ইচ্ছা, আমাদের হাতে মার যত্নের ভার দেবেন না। নিজের মাকে নিজে দেখবেন।

তিনি কাউকে অপ্রিয় কথা বলতেন না কিন্তু মতামত প্রকাশের ব্যাপারে ছিলেন দ্বিধাহীন এবং জেদী। কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হবার ক্ষমতা বাবার ছিল অসাধারণ। যখন যে বিষয়ে মন দিয়েছেন তার সবটুকু না জেনে ছাড়াননি। আমারা তাঁর কাছের লোকেরা লেখার সময় তাঁকে দেখেছি- যেন এক সাধক। সব কথায় 'হ্যাঁ' 'হু' উত্তর দিচ্ছেন কিন্তু আসলে রয়েছেন – অনেক দূরে – চিন্তার জগতে। আমরা এসময় তাঁকে বিরক্ত করতাম না। বাবার চলা ফেরায়, কাজকর্মে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা খাপছাড়া ভাব ছিল। কবি Shelly 'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেখলে এই খাপছাড়া ভাব আসলে 'Harmonious madness' এর প্রকাশ। উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বা প্রতিভাবান ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে থাকে। মনের মধ্যে তাঁদের চিন্তা এত সুশৃঙ্খল থাকে যে তাঁদের বাইরের কাজকর্মে শৃঙ্খলা প্রকাশ পায় না।

শিক্ষক মহাশয়দের গভীর শ্রদ্ধা করতেন বাবা। বলতেন, 'আমার শিক্ষকেরা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ আদর্শ, চেতনা, জাগ্রত করার পিছনে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁদেরই। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম শিক্ষকদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সমাজমনস্ক ক্ষুদিরাম দাস বাংলা ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছিলেন। কাব্য সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, বৈষ্ণব দর্শনের চর্চা ছেড়ে জীবনের শেষ পর্বে বাবা আত্মনিয়োগ করলেন বাংলা ভাষায় গড়ে ওঠার রহস্য উন্মোচনে। না হলে হয়ত বাংলার আসল রূপটি অজানাই থেকে যায়।

প্রচণ্ড সংগ্রাম ও কষ্টের মধ্যে কেটেছে বাবার সমস্ত জীবন। সে সংগ্রাম দ্বিমুখী-ভেতরের এবং বাইরের। পত্নী বিয়োগের ব্যথা বাবা দৃশ্যত সহ্য করে নিয়েছিলেন কিন্তু মনে মনে ছিলেন এক বিরহী সত্তা।

কিন্তু একথা তিনি কাউকে বুঝতে দিতেন না। জীবনের সবটুকু সময় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন কাজের মধ্যে। বর্হিজগতের প্রতিবন্ধকতা, একের পর এক প্রিয়জন হারানোর বেদনা তাঁর জীবনটাকে তছনছ করে দিতে পারতো কিন্তু তাঁর সংগ্রামী চরিত্র তাঁকে সব জয় করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীবনের শেষভাগে বাবা বলেছেন, 'জাগতিক প্রতিষ্ঠা, সুখ, আমার প্রয়োজন নেই, সংগ্রামের গৌরবই আমার আসল গৌরব। কোনো 'media'-র মাধ্যমে আত্মপ্রচার বাবা চাইতেন না। বিদেশেও যেতে চাননি, দেশের মধ্যে থেকেই কাজ করা পছন্দ করতেন।

নিজের জন্মভূমি বাবাকে দুঃখ দিয়েছে আবার লালনও করেছে। জন্মভূমির উচ্চাবক লালমাটি, তার শাল, পিয়াল, মহুয়া, হরিতকী, পলাশের জঙ্গল বাবাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করত। বেলেতোড়ের গ্রামে একটি পুষ্করিণী আছে- তার নাম 'বড়ো গড়ে' অর্থাৎ বড়োপুকুর। পুকুরটিতে স্নান করতে বাবা খুব ভালবাসতেন। এটি নানান ফল ফুলের বৃক্ষ বেষ্টিত ছিল। বাবা যখন কৃষ্ণনগরে বসত বাড়ি বানালেন- সে বাড়ির পরিবেশের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন গ্রাম্য প্রকৃতির প্রতিরূপ। তাই এই বাড়ির মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর- আর তার চারিপাশে বাবার মনোনীত গাছপালা- চাঁপা, কাঞ্চন, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, অশোক, শিউলি, মুচকুন্দ, বকুল, মাধবী, মালতী, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, বেল, কতবেল, জামরুল, ফলসা, কলা ইত্যাদি আর তারই সঙ্গে কী আশ্চর্য- বেলেতোড় থেকে নিয়ে এসে লাগানো একটি কাঁটাগাছ- নাম আঁকড়। প্রতিটি গাছ তাঁর কাছে ছিল এক একটি জীবন্ত অস্তিত্ব। তাঁর অপত্য স্নেহ বর্ষিত হতো এগুলির উপর। বাবা আজ আর নেই কিন্তু বাগানের সুগন্ধি ফুলগুলি আজও বাতাসে চড়াচ্ছে তাঁর অস্তিত্বের সৌরভ। বাড়িটির নাম রেখেছিল 'কাজলী', 'Retreat forest resort' – যেন দিন যাপনের গ্লানিকে সরিয়ে রেখে শান্তির কোলে আশ্রয় নেবার জন্য। নামটির মধ্যে যেন Henny Vaughan এর 'The Retreat ' কবিতাটির রেশ লেগে আছে। তাঁর কাছে জন্মে আমার জীবনকে আমি ধন্য মনে করছি। তাঁর সান্নিধ্যে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না আমার হয়েছে। মনে পড়েছে- ছেলেবেলায় তাঁর সঙ্গে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখতে যাওয়া। আমরা বড়ো দুই বোন যখন ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছিলাম- বাবার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় জনার্দণ চক্রবর্তী মশায়ও অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজেছেন। মনে পড়ছে, বাবার কল্যাণেই কবি বিষ্ণু দে মহাশয়ের কাছ থেকে আমার প্রয়োজনীয় পড়ার বই ধার নেওয়া। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাবার খোঁজে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় এসেছেন- তাঁর সঙ্গে কত কথা বলেছি। কখনো কখনো বাবার সঙ্গে খুবই যোগাযোগ করতে দেখেছি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও প্রয়াত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। আজকের যাঁরা বিখ্যাত মনীষী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, অধ্যাপক, দেশনেতা- তাঁদের অনেকেই ছাত্র হিসাবে দেখেছি বাবার সামনে মেঝেতে বসে আলোচনা করতে, পাঠ নিতে।

বাবার জীবনকাল শেষ হয়ে গেল- হয়ত ঠিক সময়েই- কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় এই প্রয়াণ, অকাল প্রয়াণ। তার কারণ তাঁর অভিপ্রেত কাজ এখনও বাকি। বিদ্যাসগরকে নিয়ে তাঁর কাজ করার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল ভাষাতত্ত্বের উপর বই লিখবেন। চলতি বাংলা ভাষার উপর

যে অভিধানখানি রচনা করছিলেন তা সম্পূর্ণ হলো না। জীবন নশ্বর। আমাদের একটাই সান্তনা, অসংখ্য ছাত্রেছাত্রী মধ্যে জ্ঞানের যে দীবর্তিকা তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন তার মধ্য দিয়েই তিনি একযুগ থেকে অন্যযুগ বেঁচে থাকবেন।

(গণশক্তি, ৩০ শে জুন, রবিবার ২০০২)

-০-

ক্ষুদিরাম দাস- একটি ব্যতিক্রমী নাম

বাণীমঞ্জরী দাস

২০১৬-র অক্টোবরে শতবর্ষ পেরিয়ে এলেন প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের পিতা সতীশচন্দ্র দাস খুব বেশী শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ন কাশীদাসী মহাভারত বেশ কয়েকটি কীর্তন গানের বই (যা বটতলায় প্রকাশিত) তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি ১০৮ বার হরিনাম জপ করতেন যা অনেক সময় ১০০৮–এও পরিণত হত। একারণেই ডঃ দাস তাঁর বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর পিতাকে। তাঁর মাতা কামিনীবালা ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর কিন্তু সন্তানদের শিক্ষা-ব্যাপারে আপসহীন। স্বামীর সামান্য সরকারীর চাকুরির বেতনে গ্রাসাচ্ছাদন হয়ত চলত কিন্তু পুত্রের পড়াশুনা খরচ চালানোর জন্যে কামিনীবালা পাশের জমিদার বাড়ি থেকে ধান এনে, চাল কুটে সামান্য পয়সা অথবা চাল, উপার্জন করতেন। ডঃ দাসের পিতামহ নিজেদের জমি চাষ-আবাদ করতেন, মাত্র ২১ বৎসর বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁর পিতামহী অতিকষ্টে সন্তানকে মানুষ করেছিলেন। এই পিতামহীর অপরিমিত আদর ও প্রশ্রয় তিনি বহুকাল লাভ করেছিলেন।

খুব ছোটবেলা থেকে ডঃ দাসকে যে শুধু অপরিসীম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাই নয়, সহ্য করতে হয়েছে জাতপাত-সঙ্কীর্ণ বেলিয়াতোড়ের উচ্চবর্ণের লোকেদের নানা অত্যাচার, শ্লেষ, কটাক্ষ। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন ‘ .... বর্ণহিন্দু সহপাঠীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন উপহাস। (পরবর্তী জীবনে তেমন একজন সহপাঠী আমার কাছে কবুল করেছিলেন।’) এই প্রতিরোধ তাঁকে করেছিল আরও জেদী, একরোখা। বাঁকুড়া জেলার মানুষের স্বভাবগত সারল্য ও একগুঁয়েমি ডঃ দাসের চরিত্রে ছাপ রেখেছিল।

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র মণ্ডলের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ডঃ দাস বেলিয়াতোড় মধ্য, ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১৯২২ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃতে লেটারসহ পাশ করেন বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া ওয়েজলিয়ান মিশন'- বর্তমান বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ' থেকে আই এ এবং সেখান থেকেই ১৯৩৭ সালে সংস্কৃতে

অনার্স প্রথম শ্রেণীসহ বি এ পাশ করেন। ডঃ দাসের নিজেরই স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, তাঁর শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ ক্লাসে তাঁকে বাংলা নিতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ হিসাবে বলেছিলেন 'বাংলায় খেটে পড়ে তেমন শেখায় কী আছে, যা আছে, তা দু-তিন মাসের খোরাক।' কিন্তু এই কথা শুনে ডঃ দাস বাংলাই পড়লেন, কারণ ' ফাঁকি দিয়ে পাস করার জন্য বাংলা নিতেই হল।' গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদ খুব বড় ছিল তাঁর কাছে- টিউশন করে বেঁচে থাকতে গেলে বাংলা পড়াই ভালো। যাই হোক এখানেও প্রথম শ্রেণী রেকর্ড নম্বর নিয়ে পাশ। কিন্তু চাকরি তখনই পেলেন না। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র-র পরামর্শে বই টি পড়লেন। বি টি পরীক্ষার পর আবার গেলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্রর কাছে। উনি চিঠি লিখে দিলেন। চুঁচুড়ার স্কুল পরিদর্শকের কাছে। এম এ পরীক্ষা ও বই টি পড়ার মাঝখানে খগেন্দ্রনাথ মিত্র-র চিঠির বলে উনি ৪০ টাকা মাহিনার মাস্টারিও করেছিলেন। প্রথমে কালনা পরে খানাকুলে স্কুল পরিদর্শকের কাজ করলেন। ১৯৪২-৪৩ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে ও ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কলিকাতা উনমেন্স কলেজে বাংলার অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৫-এ সরকারি চাকরি পান- প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার লেক্চারার। ১৯৫৫ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করেন। এরপর কোচবিহারে বদ্লি হয়েছিলেন, মাত্র একমাসের জন্য। ১৯৫৫-তেই কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে বদলী হন। ১৯৫৯ এ মৌলানা আজাদ কলেজে এবং ১৯৭৩ –এ হুগলী মহসীন কলেজে 'প্রফেসর' পদে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ইতিপূর্বে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ড. দাসের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' (১৯৫৩)- বইটির অনুলিখন করেছিলেন অধ্যাপক ও কবি শঙ্খ ঘোষ (তিনি তখন এম এ ক্লাসের

ছাত্র)। এই বইটি রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে নতুন পথনির্দেশ। তিনি দেখালেন, নিসর্গ, মানুষ এবং রোমাণ্টিকতা এবং তা থেকে জাত একটি অধ্যাত্মচেতনা ক্রমপরিণামমুখী কবিসত্তাকে কিভাবে বিচিত্র পথ বেয়ে পৌঢ়তার দিকে নিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যায়েও যার নূতনত্ব এবং গতিশীলতা অব্যাহত। রবীন্দ্র আর্বিভাবের পটভূমি হিসাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে দেখিয়েছেন, সংস্কৃত সাহিত্য, সূফী ধর্ম ও কাব্য বৈষ্ণব কাব্য সংস্কৃতির সমবায় কীভাবে তাঁর মর্মমূলে কাজ করেছে। এই বহু-সমাদৃত গ্রন্থটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট্টণও

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (১৯৫৮)। অভিনবত্ব-তার ছন্দ বিষয়ক আলোচনায় যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, সংস্কৃত নয়, প্রকৃত বা প্রাচীন বাংলা ছন্দই বর্তমান বাংলা ছন্দের ভিত্তি আমাদের উপরি পাওনা, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা এবং কাব্যরীতি ও কবিদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য।

তৃতীয় গ্রন্থ-'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী' (১৯৬৬) এর নামেই প্রকাশ, বইটির উদ্দেশ্য কী। গ্রন্থটি বলতে গেলে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়ের পরিপূরক। স্টাইল শব্দ-প্রয়োগ, ছন্দ ও অলংকারের বিচার ইত্যাদি আঙ্গিকগত যে আলোচনা, যে ডিটেইল তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থে দেখাতে পারেননি এখানে রবীন্দ্র কবিতার সেই খুঁটিনাটি প্রয়োগকৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিশ্চিত যে সংস্কৃতজ্ঞানের গভীরতা এ গ্রন্থে তাঁর সহায়ক হয়েছে।

চতুর্থ গ্রন্থ বৈষ্ণব রস প্রকাশ (১৯৭২)। এই বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ড. দাস নিজে বলেছেন, তিনি কোনো নূতন তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চাননি। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় পটভূতি আলোচনা অতি সংক্ষেপে মহাপ্রভুর দিব্য ও লৌকিক জীবনকে আলোকিত করা মধুররসের বৈচিত্র্যকে অতি সংক্ষেপে পরিস্ফুট করা- এগুলি তাঁর উপস্থাপনা ও নির্মাণকৌশলে নূতন হয়ে উঠেছে। কীর্তনগান ও রস পর্যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বের দ্যোতক। পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বিষয়ক তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনাটি নিঃসন্দেহে এই বিষয়ক বিতর্কে নূতন দিক উন্মোচন করেছে। তিনি মনে করেন মায়াপুর নয়, নবদ্বীপের পূর্বস্থলী গ্রামের বাবলারি এলাকায় শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ড. দাসের পঞ্চম গ্রন্থ সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৩। নির্মেদ ভাষা, যুক্তিপূর্ণ তথ্য সমাবেশ এবং ভাবালুতা বর্জিত উপস্থাপনায় এটি বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মানুষ সম্পর্কিত ভাবনার সঙ্গেই বিজড়িত পল্লীগ্রাম সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বাত্মচেতনা এগুলি দেখানোর সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, ভাবনার নিবিড় সান্নিধ্যে তারা খুবই ঘনিষ্ঠ।

ষষ্ঠ গ্রন্থ- ড. দাস সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণচণ্ডী' (১৯৭৮)। এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনাকালে তিনি ঐ সময়ের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যায়ণ করেছেন, পড়েছেন, 'আইন ই আক্‌বরী'। সেই পথ ধরে গেছেন, যে পথে হেঁটেছিলেন দেশত্যাগী মুকুন্দরাম। সমস্ত পূর্ববর্তী ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন টোডরমলের রাজস্ব-নীতি সম্পর্কে ভুল ধারণাই ভীত করে তুলেছিল সাধারণ মানুষকে। দেশত্যাগ করেছিলেন মুকুন্দরাম সহ আরও বহু মানুষ। ঐতিহাসিকদের কাছে এই ভূমিকাটি বহুমূল্য।

সপ্তম গ্রন্থ 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' (১৯৮৪)। এ বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ড. দাস স্বভাবেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাঠ করেছেন এমনকি স্টিফেন হকিং পর্যন্ত। গ্রন্থটিতে নাম উল্লেখ করেছেন বহু বৈজ্ঞানিকের। রবীন্দ্রনাথের বস্তুজগৎ ছাড়িয়ে নভোবস্তু মণ্ডলের দেশে যাত্রার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন, কবির নব নব রহস্য উন্মোচনের, সৃষ্টি ও ধ্বংসমূলক পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহের।(খুব ব্যক্তিগতভাবে বলি, যতবার আকাশে ধূমকেতু দেখা যেত আমার বাবা ড. দাস গভীর আগ্রহের সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং পুত্রকন্যাদেরও দেখাতেন। খুব আক্ষেপ ছিল। 'হ্যালির ধূমকেতু' যার কথা তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন, জীবৎকালে তা দেখা তাঁর কপালে হয়ে উঠবে না। বাবা বেঁচেছিলেন কিন্তু হ্যালি (১৯৮৬) এবার সকলকেই নিরাশ করেছিল।) জ্যোর্তিবিদ্যা এবং জ্যোতিচর্চা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের কথা অনেকেই জানতেন। মহাকাশ বিজ্ঞান ছাড়াও ভূবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানও যে রবীন্দ্রনাথের কৌতুহলের বিষয় ছিল তাও তিনি দেখিয়েছেন।

ড. দাস বাংলা বানান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন একটি ছোট পুস্তিকায়- 'বানান বানানোর বন্দরে' (১৯৯৪)। তিনি তৎসম শব্দের বানান অবিকৃত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বৈপ্লবিকভাবে চালু বানানের পরিবর্তে প্রতিযোগিতা উপযোগীতা ইত্যাদি বিকল্প বানানকে স্বীকার করায় কথাও তিনি বলেছেন।

তাঁর অষ্টম গ্রন্থ 'দেশকাল সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। এটি পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংগ্রহ।

নবম গ্রন্থ 'চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি(১৯৯৪)। ছোট ছোট প্রবন্ধের আকারে ভাগ করে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম ছাড়াও তাঁর সমাজ চিন্তা বিজ্ঞানবরণ ব্যাকরণচর্চা গণচৈতন্য জাগরণে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বহু বিষয়কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রচর্চা যে এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক এ বিষয়ে তিনি পাঠককে সচেতন করেছেন।

ড. দাসের দশম গ্রন্থ 'সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান' (১৯৯৮), সাঁওতালি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জগতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

একাদশ গ্রন্থ- 'বাছাই প্রবন্ধ' প্রকাশ অক্টোবর ২০০০। 'এ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন কয়েকটি বাছাই প্রবন্ধ নিয়ে এ সংকলন প্রাবন্ধিক ক্ষুদিরাম দাসের বাছাই প্রবন্ধ নিয়ে এ সংকলন প্রাবন্ধিক ক্ষুদিরাম দাসের প্রবল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি প্রতিটি প্রবন্ধেই চোখে পড়ে (অধ্যাপক মানস মজুমদার- এই গ্রন্থের সংকলক)। একটি প্রবন্ধ কোথাও প্রকাশিত হয়নি 'অথ বিবেকানন্দ- রবীন্দ্র কথা'। সংকলিত প্রবন্ধগুলি বৈচিত্র্য ও নূতনত্বে উজ্জ্বল। পরিমিত, গাঢ়বদ্ধ, ঋজু, তীক্ষ্ণ, বাক্যবন্ধ- যা ড. দাসের সব রচনারই বৈশিষ্ট্য- এটিতেও তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। এটি তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ সেটি তাঁর ছাত্র ড. অরুণকুমার বসু ও ড. মানস মজুমদার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ড. ক্ষুদিরাম দাসের প্রাপ্ত পুরস্কারের সংখ্যাও কম নয়। ডি লিট উপাধি ছাড়াও বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থের জন্য প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ইত্যাদি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি।

ড. দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পঃ বঙ্গ সরকারের Linguistic and Comparative Dictionary Project নামে একটি প্রকল্পের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং কাজ গুরু করেন। বাংলা, ইংরাজী এবং সংস্কৃত তিনটি ভাষাকে নিয়ে কয়েকটি ছেলেমেয়ে এবং দু-একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে প্রাথমিক কাজটি তিনি ১৯৯৬ সালে শেষ করেন। ইচ্ছা ছিল, এতে হিন্দীও থাকবে, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। এই অভিধানে ইংরেজী বানানের উচ্চারণ কী হওয়া উচিত, তাও বলা হয়েছিল। এই ডিক্শেনারি শুধু প্রকাশের অপেক্ষায়

ছিল। কার্ডে শব্দ লেখা অনেকগুলি বক্স জমা পড়ল পঃ বঙ্গ পুস্তক পর্ষদের কাছে। কিন্তু একটি বিশেষ শক্তিশালী 'লবি'র বিরুদ্ধতায় এই অভিধান প্রকাশে বাধা পড়ল। পরে সরকার এটি প্রকাশ করতে রাজি হন প্রুফ দেখা দায়িত্ব দেন ড. দাসকেই, কিন্তু তখন ২০০১ সালে তিনি এই বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করার মত অবস্থায় ছিলেন না। প্রুফ দেখা গুরু হয়েছিল কিন্তু তাঁর অক্ষমতাবশতঃ পুস্তক পর্ষদ কার্ড সমেত ২ টি বক্স ফিরিয়ে নেয়। তারপর ঐ কার্ডগুলি কোথায় কী অবস্থায় তা আর উদ্ধার করা সম্ভব কিনা তার কিছুই আমাদের জানা নেই।

ড. দাস তাঁর জীবনের দীর্ঘ ১৫ টি বছর কোনো সৃষ্টিশীল কাজ না করে (যা করলে তিনি আরও কিছু দিয়ে যেতে পারতেন) এই অভিধানের পিছনে তাঁর মূল্যবান সময় ও জীবন নষ্ট করেছেন। যা প্রকাশিত হলে হয়তো অভিধান এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দুই-ই অনেক লাভবান হত। ড. দাস অনেক সুদূরপ্রসারী চিন্তা নিয়েই এই কাজে হাত দিয়েছিলেন- তা একেবারেই ব্যর্থ হল, একই সঙ্গে সরকারী অর্থেরও অপচয় হল। এই বিফলতা তাঁকে মানসিক দিক থেকে নিশ্চিতই পর্যুদস্ত করেছিল। কীভাবে এটি উদ্ধার করা সম্ভব তা ভাবলে বোধহয় তাঁর প্রতি আমাদের সঠিকভাবে শ্রদ্ধানিবেদন করা হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে জীবনযাপনের দিক থেকে ড. দাস ছিলেন খুবই সাধারণ। ধুতি ও পাঞ্জাবি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে খাদির জহরকোট এই ছিল তাঁর পরিধেয়। তাও সংখ্যায় খুব বেশি নয়। আসলে আড়ম্বর, প্রাচুর্য, সঞ্চয় এগুলিকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর পক্ষপাত ছিল সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতি। তাই প্রতি পূজার কম্বল, ধুতি ইত্যাদি কেনা হত, বাড়ীর জন্য নয়, তাঁর অনুগৃহীত গরীব মানুষদের জন্য। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারিতে বিশ্বাস করতেন- নিজের কঠিন অসুখেও তা থেকে সরে আসতেন না। একবার পেটখারাপে সামান্য দুটি Enteroquinol খাওয়ানোর কথা বলেছিলেন, 'খুকি আমাকে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।' প্রতিটি ছুটির দিনে কৃষ্ণনগরে বাড়ীর বারান্দা রোগীর ভিড়ে ভরে থাকত। রোগীরা তাঁর কাছে ওষুধ এবং পথ্য দুইই পেত। তথাকথিত এলিট্ সম্প্রদায়, ছাত্রছাত্রী, গুণী মানুষজন, বিদ্বৎসমাজ তাঁকে ঘিরে একটি পরিমণ্ডল রচনা করলেও এই খ্যাতি এই সম্মান তাঁর ব্যক্তিত্বের সবটা প্রকাশ করে না। একেবারে ভূমি থেকে উঠে আসা এই মানুষটি তাঁর শিকড়কে কখনোই ভোলেননি। তাই বাজারের লোকজন বিনা ওজনে, বিনা দরদামে তাঁর ব্যাগে মাছ এবং অন্যান্য সব্জি তুলে দিত। প্রতিবেশীরা সাহায্য ও পরামর্শ নিতে আসত। হাতে কিছু টাকা এলেই বাগান পরিষ্কার করা বা পুকুর কাটার কাজে লোক

লাগিয়ে দিতেন- যাতে লোকেরা কিছু টাকা পায়। যাদের ধার দিতেন-শোধের প্রত্যাশা রাখতেন না। আত্মীয়স্বজন তাঁর বাড়ীতে আসত-যেত এবং থেকেও যেত। পরিবার যথেষ্ট বড় হওয়া সত্ত্বেও কেউ না কেউ সবসময় পোষ্য হিসাবে থাকত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিবৎসল দেবদ্বিজে এবং তথাকথিত কর্মে আগ্রহ না থাকলেও বাড়ীতে আগত পিতার গুরুভ্রাতার যে সেবা তিনি করতেন, তা তাঁর মত মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পারিবারিক গুরুদেবের বাড়িতেও প্রত্যেক বছর যেত ছাতা, জুতো, ধুতি ইত্যাদি- যদিও কোনো দীক্ষা তিনি নেননি। ড. দাসের লেখার কোনো টেবিল-চেয়ার ছিল না। একটি সোফা-চেয়ারে বসে চৌকির উপর খাতা রেখে তিনি লিখতেন- তখন তিনি বাহ্যচেতনাশূন্য। কোনো কোলাহল তখন তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। ট্রেন পথে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা যাতায়াত করেছেন অনেকদিন। জায়গা পেলে সীটের উপর পা তুলে তন্ময় হয়ে বই পড়তেন, এমনই তন্ময় যে, পায়ের তলা থেকে জুতা চুরি হয়ে যেত। তখন হয় শিয়ালদা থেকে হাওয়াই চপ্পল কিনে পায়ে দিয়ে নয়ত খালি পায়ে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের রাড়ীতে যেতেন- এ ঘটনাটি প্রায়ই ঘটত। শুনেছি এ অবস্থায় একবার নাকি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও চলে গিয়েছিলেন।

বহু শোকের উপত্যকা তাঁকে পার হতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে পত্নীবিয়োগে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছিলেন, পরে তা সন্বরণ করে তিনি মন দিলেন সৃষ্টিকর্মে। তার ফল 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়'। এরপর বি এ পাঠরত অবস্থায় ছোটভাই উম্মাদ হয়ে গেলেন, বহুকাল বাড়ীতে রেখে, চিকিৎসা করিয়ে কোনো ফল না হওয়ায় তাকে তিনি রাঁচিতে পাগ্‌লা গারদে পাঠালেন। কিছুদিন পর তাঁর সুস্থতার খবর পাওয়ার পর যখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, বলা হল, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এই শোক ড. দাসের কাছে পুত্রশোকের চেয়ে কম ছিল না- ভাই তাঁর চেয়ে কুঁড়ি বছরের ছোট ছিলেন। শোকপ্রস্ত পিতামাতা ইতিপূর্বেই গত হয়েছেন, এবার মারা গেলেন তাঁর দ্বিতীয় পত্নী (১৯৭৮) । উদ্‌ভ্রান্ত হলেন তিনি কিন্তু আবারও তা কাটিয়ে চলে গেলেন সৃষ্টির জগতে। মারা গেলেন মধ্যম ভ্রাতা। তারপর আবার গুরুতর শোক তিনি পেলেন পুত্রবধুর মৃত্যুতে। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর জোষ্ঠ জামাতারও মৃত্যু ঘটেছিল কিন্তু বোধহয় সেই শোক সঠিক অনুভব করার অবস্থায় তিনি ছিলেন না।

তাঁর বাস্তব জীবন ছিল বড়ই কঠিন, ভিতর ও বাইরে অপ্রতিহত সংগ্রাম যাকে বলে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা, তা চালিয়ে গেছেন সারাজীবন- প্রতিকূল

পরিস্থিতি বা বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে আপস করেননি। নিজের যুক্তিবোধ ও বিবেকের কাছ থেকে একচুল সরে আসেননি।

(কবিতা সীমান্ত ছেষট্টি সংকলন ১৮২৪)

‘ভালোবাসার উৎষর্গ’

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসঃ শ্রদ্ধাষ্পদেষু

গিরিন্দ্র শেখর চক্রবর্তী

একটা উজ্বল ব্যক্তিত্ব ....কবিতা..... আমার চেতনা
লেখনী..... আমার আমিত্ব..... উজ্বল ব্যক্তিত্ব
একটি উজ্বল ব্যক্তিত্ব
মনে ও মননে প্রতিফলিত
বার-বার
দূরে-অতিদূরে, কাছে-অতিকাছে।

লাল মাটির শিশু
প্রতিভার ক্রম বিবর্তনে
চিন্তনের প্রগতিশীলতায়
হীরের মতো জ্যোতিষ্ক নিয়ে
চলেছে বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে।
মানব-সত্বার বিস্ময় দ্যুতি
দার্শনিক চোখে সদাবিচ্ছুরিত
জীবন ইতিহাসে,
শান্ত অথচ চঞ্চল সমুদ্র সফেনের মতো
শুভ্রতায় ভরিয়ে দ্যায়

আগামী শতাব্দীকে ...

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে নিয়ে

অদ্বৈত কুণ্ডু

গোবুর ডবায় পদ্ম ফুটে দেখবি যদি আয়
বাঁকুড়ার শহর-পারা বেল্যাতোড় গাঁয়।
আগেই হিথায় ফুটে গ্যাছে বসন্ত যামিনী
ভবক মাখ্যে ভাঁউরে গ্যাছে মৌমাছি গুণগুণি।
সিখান থ্যাকে এখন ছুটে আর এক ফুলের বাস
জান্যে গ্যাছে সে ফুলটার নাম ক্ষুদিরাম দাস।
বড্ড গুণী ছেল্যাটারে, লেখাপড়ায় ডাগর
ঘষে মাজ্যে দেখে বললেক-বঠে বিদ্যাসাগর।
সাগর জলটা নুন্যা লয়হে; গুড়ের সুয়াদ আছে
সুখে দুখে তিষ্টা প্যালে বেদম কাজে লাগে।
ঢ্যাঙ্গা মাপের নাইবা হলেক, মানে দেদার বড়
বুড়া হলেও ঠ্যাকার সময় জুয়ান থ্যাকেও দড়।
কলকাতায় চলে গ্যালেও লাড়ির টান আছে
হিথায় কিছু হবেক শুনে আসে যে হাঁকুট্যে।
ভালবাসার বাঁধে ঘেরে রাখি সাগরটাকে
রতন খুঁজে লিতে হবেক নাক্-ডুবাডুব্ ডুবে।

-০-

তুমি

মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরী প্রকৃতি ধীরে ধীরে তুলে নিল কালো ওড়নাটা
শাল-মহুয়ার বন থেকে শুরু হল বৈতালিক।
গোলাপী দ্যুতির ভেতরে থেকে হেঁসে উঠল তরুণদেব
রাঙা মাটির সঙ্গে হোল মধুর মিলন।
সেই মুহূর্তে কাল পাঁকের থেকে আপনাকে উদ্ভাসিত করতে
উঁকি দিল একটি কুঁড়ি।
আস্তে আস্তে বিকশিত হল শতদল
ছড়িয়ে পড়ল আপন সৌরভ।
মৌমাছি ভ্রমরের দল এল গুণগুণিয়ে
গুণিরা নিয়ে এল তাকে সমাদরে আপন মন্দিরে।
সম্মানিত করল জাতীয় পুষ্পে
সে-তুমি।

-০-

আনন্দ অভিসারী

তুলসী চট্টোপাধ্যায়

সচেতন সুচেতনায় বিশ্বাসী
তোমাকে মানপত্র দেওয়া হোল
ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা।
কর্মযোগী তুমি পণ্ডিত জ্ঞাণী
আনন্দ প্রয়াসী-
পৃথীবীর ধুলো কাদা অবজ্ঞা
হেলায় ফেলেছো ঠেলে
সত্যের সন্ধানে ;
অনন্ত আলোক তাই উদ্ভাসিত তুমি
অনাবিল গতিবেগে এখনো চলেছ
লক্ষ্যে-
আরব্ধ কর্মের সাধনে
সাহিত্যে অজ্ঞাত যত
তথ্যের সন্ধানে
পৃথিবীর নিঃশ্বাস আকাশ
সাড়া তোলে অহরহ
পথে ও প্রান্তরে
তারও শরিক তুমি
তেজোদীপ্ত প্রাণ।

সম্বর্দ্ধনা

ভরত মাহাতো

বাঁকুড়ার কাঁকরের বুকে-
ভালোবাসার কথা ভেবে
আমার দুটি-কোমল হাতের
তুলে আনা ফুল-নাও তুমি।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোয়-
আকাশের কালো মেঘের নীচে
তোমার স্পর্শে-সূর্যের ঝলসানো
দিনগুলি-বসন্ত চিত্তে সুখ চায়।

সেখানে পৃথীবী-চিকন-শাখায় চেরা ;
যেখানে মরীচিকা-হৃদয় ঝলসায়;
সেই উষ্ণ আকাশ তলে.....
একটুকরা রুটির আশায় .....
জীবনকে নিয়ে পদাতিক পদক্ষেপ।

তারি মাঝে জীবনের ভবিষ্যৎ-নতুবা
ব্যর্থ পৃথিবী; সেই অরণ্য স্বাদে
জীবন-বিষাদে-ফাগুনের ছোঁয়া চায়।।

-০-

প্রসঙ্গঃ শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ ক্ষুদিরাম দাস

শ্রাবণী দাস

অনন্ত বালুকারাশির মাঝে
জহুরী খুঁজে বেবায়
আসল ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো।
নীলাম্বর আকাশের মাঝে
জ্যোতিষী খুঁজে ফেরে
অপার রহস্য।
অগণিত মানুষের মাঝে
আমরা খুঁজে বেড়াই
তোমাকে-
আমরা ভুলে যাই,
তবু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি
আমাদের আকর্ষণ করে চলে
অনিবার।
তেমনি তুমি আকর্ষণ করে চলেছ
জ্ঞান পিপাসু মানুষকে
অনাবিল মনুষ্যত্বকে।

-০

শিক্ষাচার্য ক্ষুদিরাম দাস

পার্থসারথি ভট্টচার্য

তুমি নেই বলে আজ
ওগো প্রিয়,
আরও প্রিয় হলে আজ।
যদি কিছুদিন আরও থাকতে
চোখে চোখে যদি রাখতে,
কথা রাখলে না
তুমি থাকলে না
গেলে দূরে চলে আজ।
ছিলে তুমি প্রিয়জন,
ছিল যে তোমাকে
বড় বেশি প্রয়োজন।

হয়ে আমাদেরই একজনা
আলো দিতে আরও এক কণা,
নিভে গেল আলো
আজ যা হারালো
ভেবে মন ভোলে কাজ।
তুমি নেই বলে আজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র প্রতিভা পরিচয়

নির্ম্মলকুমার ঘোষ

ভাবোচ্ছ্বাস বাদ দিলে, রবীন্দ্র-প্রশস্তি যাহা গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কাল হইয়া আসিয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ মর্ম্মানুধাবনের ফলে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে বলা চলে না। প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবন করাই কবিকে যথার্থ দেখা, এবং তাহা সম্ভব হয় যেখানে সেই প্রতিভা প্রতিফলিত হইতেছে,-অর্থাৎ সমালোচক বা ভাবানুগ্রাহীর মানসপটের বিস্তার এবং ঔজ্জল্যের উৎকর্ষের উপর। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে, কিংবা পূর্বনির্দিষ্ট কোনো সংস্কারের দ্বারা অভিভূত মানসদর্পণে দেখিলে, এবং প্রতিভার আংশিক বিশেষত্বকে বিশিষ্ট করিয়া দেখিলে, যথার্থ মর্ম্মানুধাবন ব্যাহত হয়।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্র প্রতিভার সার্ব্বভৌম পরিচয় দিয়েছেন, এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাঁহার নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় এইরূপ বিশদ ও গভীরভাবে আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

পৃথিবীর যে-কোনো দেশে এবং যে–কোনো কালেই রবীন্দ্র-প্রতিভা অতুলনীয়। সভ্যতার ইতিহাসে রবীন্দ্র-প্রতিভা চিরকালের বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের বিষয় হইয়া থাকিবে। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি যে কত সুদূর-প্রসারী ও গভীর হইতে পারে, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যে কী পরিমাণ বাণীময় হইয়া উঠিতে পারে, বিশ্বোপলব্ধি মানুষের অন্তরে যে কতটা চেতনশীলতা সঞ্জাত করিতে পারে, বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ট উদাহরণ। অ-সাধারণ মানুষের অর্থাৎ কবির প্রতিভায় এই অসামান্যতা সৃষ্টি হয় দুইটি বাহ্য উপাদানের দ্বারা ‘একটি বহুকাল-আগত আর একটি তাৎকালিক বর্তমান। একটি ক্রিয়া নিগূঢ়, অন্যটি বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পশ্চাতেও একদিকে বিপুল ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনের স্মৃতি রহিয়াছে।’ অতীতের মধ্যে অবগাহন এবং বর্তমানের পরিবেশে পরিসিঞ্চনের দ্বারাই এই মানস-স্বভাব সম্ভব। ‘কেবল অতীতের অনুসরণ নয়, অতীত এবং বর্তমানের সমঞ্জসীকরণই ঐ প্রাকৃতিক শক্তির কাজ।’ কিন্তু এই সমঞ্জসীকরণ হয় প্রাপ্ত ঐতিহ্যের রূপান্তরের ফলে। কোন্ অদৃশ্যশক্তির ক্রিয়ার ফলে এই সমঞ্জসীকরণ নবরূপায়ণে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে? যে বৈজ্ঞানিক অজ্ঞাত-কারণে দুই পৃথক্ বস্তুর সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, প্রতিভার পরিস্ফুরণও অনুরূপ অজ্ঞাত কারণেই সম্ভারিত

হয়। হয়, একটাই দেখি। কারণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেরূপ, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপই অজ্ঞাত এবং বিস্ময়কর। 'পুরাতন ও প্রত্যক্ষের যাবতীয় বিচ্ছিন্ন, অনৈক্যযুক্ত, পরস্পরবিরূদ্ধ অথচ সমন্বয়ের জন্য আগ্রহশীল জীবনাদর্শের ঐক্য সাধিত হয় এবং নূতনের জন্ম হয়।' এই নূতন যদিও অতীতের আশ্রয়ে এবং সমকালীন প্রতিক্রিয়ায় উদ্‌বুদ্ধ হয়, তথাপি অনাগতকালের অভিমুখেই ইহার গতি। এই জন্যই প্রতিভা-মাত্রই কালবাহিত হইয়াও কালাতিক্রমী। এইজন্যই কালিদাস বা গোটে বা রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন।

মন চেতনার আধার। চৈতন্যের স্‌ফুরণ হয় মনের বিস্‌তৃতি ও গভীরতার জন্য। ব্যক্তিভেদে এই বিস্‌তৃতি ও গভীরতা বিভিন্ন। ইহা কালেরও আপেক্ষিক। মাইকেল্‌ অ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফেল্‌, গোটে, কালিদাস এবং সেক্‌স্‌পিয়র, তৎ তৎ কালের ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভাবিত হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশই রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। ঐতিহাসিক কারণেই এক-একটি যুগ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, এবং তৎকালীন মানুষের মনকে বিস্তারে এবং গভীরতায় বিরাটকে ধারণ ও প্রকাশ করিবার সহায়তা করে। কিন্তু এ যেন যজ্ঞের উপযোগী বেদীনির্ম্মাণ মাত্র। ইহার পর আছে ব্যক্তিগত সাধনা ও পরিশ্রম, আছে সমিধ সংগ্রহ এবং নানা বর্ণে সমুজ্জল ও গন্ধে সুমধুর পুষ্পচয়ণ। এই ব্যক্তিগত সাধনা কঠোর ও শ্রদ্ধান্বিত না হইলে যজ্ঞবেদী প্রাণ-রিক্ত রহিয়া যায়। সেইজন্যই, যুগপ্রভাব সহায়ক হইলেও শুধু ব্যক্তির অক্ষমতার ফলেই বহুক্ষেত্রে প্রতিভার সম্যক্‌ অথবা কিছুমাত্রও বিকাশ ঘটে না।

মহতী ভাষার মাধ্যমেই মহৎ ভাব স্‌ফুরিত হয়। ভাষার নৈপুণ্য আসে বহুদিনের অনুশীলনে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার মূল উৎস দুইটিঃ দক্ষিণ-ভারতে তামিল এবং বাকী সমুদয় অংশে সংস্কৃত। তেলেগু, মাল্যালাম্‌ প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় যাঁহাদের রচনা সার্থক হইয়াছে, তাঁহারা প্রাচীন তামিল হইতে প্রাণ-রস আহরণ করিয়াছেন। বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের শিকড়ও সংস্কৃত ভাষার রসে সিক্ত।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যতোটা নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন, অদ্যাবধি কোনো ভারতীয় সাহিত্যিকই ততোটা হয় নাই। দিগ্বিজয়ের ভেরী-নিনাদ তো ধ্বনিময় না হইয়া পারে না। মনোবিজয়েরও মূল-রহস্য আছে; ধ্বনির সঙ্গে বাণীর মিলন। জীবনকে আসঙ্গ গ্রহণ করিয়াও তাহার জৈব সংকেত এড়াইয়া যাওয়া। রবীন্দ্র প্রতিভার মূল কথা ইহাই।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বইটি সমালোচনা বা সুখালোচনা মাত্র নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমায় একটি সার্থক ও মূল্যবান নির্দেশ-গ্রন্থ রূপেই ইহার মূল্য।

(যুগবাণী, কলিকাতা শনিবার ১০ই অগ্রহায়ণ,১৩৬২, ২৬ শে নভেম্বর ১৯৫৫)
("রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়"; লেখক-অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। প্রকাশক-পুথিঘর ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য-দশ টাকা।)

-o-

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী

দিনের পর দিন চলে যায় কোন বৈচিত্র্যের অনুভূতি না রেখে। তাদের মধ্যে অকস্মাৎ একটি দুর্লভ ক্ষণের আবির্ভাব হয় পরম সত্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দু'চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ক্ষুদিরামবাবুর বইটি পেয়ে এবং প'ড়ে পাঠকের মনে সেই অনুভূতিই জাগবে। অষ্টাধ্যায়ী এই মহৎ গ্রন্থের তিন শতাধিক পৃষ্ঠার ছত্রে ছত্রে পাণ্ডিত্য , মননশীলতা ও রসানুভূতির যে সহৃদয়- হৃদয়বেদ্য সমাবেশ সাধিত, তা প্রায় অলৌকিক। গ্রন্থের বহিরঙ্গ মুদ্রণ-পারিপাট্য যেমন সুরুচিসম্মত, অন্তরঙ্গ তেমনি কান্তাসম্মিত কাব্যেপদেশের মাধুর্য-পরিপ্লুত।

মহাকাশে অনাহত দিব্যবাক্যের যে-সূক্ষ্ম প্রায় অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি আমাদের কানে ছন্দের প্রসাদে এসে উপস্থিত হয় সেই নিতল নীল নীরবের মাঝে বেজে-ওঠা গভীর বাণীর শ্রুতিসুখ আমরা পেলাম অধ্যাপক দাস মহাশয়ের মনোরম রবীন্দ্রসাহিত্য-বিশ্লেষণের মধ্যে। বাংলা , সংস্কৃত ও ইংরাজি তিন সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মনীষীপ্রবর রবীন্দ্রকাব্যের সাংকেতিক সৌন্দর্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কাব্য সৌন্দর্যের মূল তত্ত্বগুলি সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বইটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ তো বটেই , পণ্ডিত গবেষক ও অধ্যাপকদের পক্ষেও এর সাহচর্য ছাড়া রবীন্দ্রসমীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

কোনও এক বই সম্বন্ধে পরলোকগত রোনাল্‌ড্‌ নিক্‌সন সাহেব বলেছিলেনঃ বইটি চুরি ক'রেও পড়া উচিত । আমরা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষুদিরামবাবুর বই প্রসঙ্গ নির্ভয়ে সেই পরামর্শ দিই। .....

-সম্পাদক, ভারতবর্ষ,

(বৈশাখ,১৩৭৪)

পাণ্ডিত্য ও অনুভবের এক বিরল মিলন

ভবতোষ দত্ত

'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী রবীন্দ্রনাথের প্রথমাবধি সকল কাব্যের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ চলেছে শেষ পর্যায় পর্যন্ত। এতে নেই শুধু 'শেষ লেখা'র কবিতার আলোচনা। ক্ষুদিরামবাবুর রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচনার বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে কবিতার ভাবসৌন্দর্য মাত্র পাঠ বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ রস ও সৌন্দর্যানুভূতি ছাড়া আর কোনও কিছুর অবতারণা করেননি। অজিত চক্রবর্তী এক সময়ে রবীন্দ্র কাব্য সমালোচনায় কবিমানসকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে কবির ব্যাক্তিগত জীবনের নানা তথ্যের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হত। এটা কিন্তু আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার রীতি ছিল না। তখন সমালোচকেরা কবিতা পাঠই করতেন, কবিমানস অনুযায়ী কবিতার আলোচনা করতেন না। সেই জন্য কবিতার দোষগুণ নির্দেশ করতে কখনও দ্বিধা করতেন না। অবশ্য সে নির্দেশ হত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী। ক্ষুদিরামবাবুর আলোচনা যেন সেই রীতিতেই করা সংস্কৃত রসতত্বের ওপর অতিরিক্ত ঝোঁক না দিয়ে।

বইয়ের নামকরণ থেকে তাঁর অভিপ্রায় খানিকটা বোঝা যায়। চিত্র এবং গীত –এই দুটি কবিতার প্রধান প্রকৃতি। এ কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন আগে বলেছিলেন। কবিতায় যে ছবি ফোটানো হয়, নয়তো ভাবানুভূতি জাগিয়ে তোলা হয়। কবিতা রচনার সিদ্ধিকে এ ভাবে আমাদের প্রাচীন রসবেত্তরা দেখেননি। কিন্তু এই দু'টি দিকে ক্ষুদিরামবাবু তাঁর লক্ষ্যকে নিবদ্ধ রেখেছেন। চিত্রগুণ এবং সঙ্গীতগুণ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা থেকেই স্বতঃস্ফুর্ত হয়। তাই বিশুদ্ধ কবিতা নীতি নয় ধর্ম নয়, ব্যবহারিক কোনও উদ্দেশ্য নয়, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সৃষ্টি। ক্ষুদিরামবাবু এই বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সৌন্দর্য কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তাই বিচার করে দেখিয়েছেন বিস্ময়কর সূক্ষ্মতার সঙ্গে। দরকার হলে কোথায় ভাববিরোধিতা বা ভাবাভাস হয়েছে তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সাধারণত রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর্যায় যে ভাবে ভাগ করা হয়, ক্ষুদিরামবাবু সে ভাবে করেননি। তাঁর ভাগগুলি এ রকম- উজ্জ্বলতম অনুকৃতি কাব্য-সৌন্দর্যের আবির্ভাব, সংস্কৃত রীতির অনুশীলন, সুর সঙ্কেতময় লৌকিক বাণীবন্ধনের ঐশ্বর্য, সঙ্কেতময় অর্থচিত্রের ও প্রত্যয়নিষ্ঠ কল্পনার প্রাধান্য, সংবৃত কল্পনা ও প্রতিহত গীতধর্মের অধ্যায়। সূচিপত্রে এই নামগুলির সঙ্গে কাব্যগ্রন্থের

উল্লেখ আছে। এ বইয়ের ভাষায় পাণ্ডিত্যের দীপ্তি যেমন স্ফুরিত, তেমনই ভাবানুভবের সুক্ষ্ম বোধশক্তিও ক্রিয়াশীল। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য এবং রসতত্ত্বে তাঁর নিঃসংশয়িত অধিকার প্রমাণিত আধুনিক ভঙ্গিতে কাব্য-ব্যাখ্যা করতে গিয়েও অনায়াস-সিদ্ধ রসতত্ত্বের প্রয়োগে। ভাষা যে খুব সরল তা বলতে পারব না। তিনি চলতি ক্রিয়াপদ দিয়েই লেখেন বটে, কিন্তু তাঁর ভাষা-বন্ধনে সংস্কৃত ভাষারীতির ছায়া আছে। তিনি অলঙ্কৃত বাক্য ব্যবহার করেন সে বাক্যে সন্ধি-সমাসও থাকে। মাঝে মাঝে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন যা অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বোঝা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। যেমন 'বক্রতা' শব্দটি। এ শব্দটি তিনি কুন্তকের ব্যবহৃত অর্থে মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে ফেলেন, তাতে পাঠকের কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি হয়। তবে এটা স্পষ্ট যে 'পণ্ডিতী' বাংলা বলতে যা বোঝায়, ক্ষুদিরামবাবুর গদ্য সেই জাতের নয়। কারণ তাঁর শব্দ ব্যবহারে চলতি শব্দ অবাধ ও অনায়াস।

(চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, ক্ষুদিরাম দাস। আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০ নভেম্বর ৯৬)

-o-

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও কাব্য

নারায়ণ চৌধুরী

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস-ডি-লিট মহাশয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন সত্যিকারের বিদগ্ধ ব্যক্তি। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য ও রস-রসিকতার এক আশ্চর্য সমন্বয় চোখে পড়ে, যে-সমন্বয় আমাদের সমালোচকদের মধ্যে সচরাচর বিরল দর্শন বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যের মূল্যায়নে বিচারের তৌলদণ্ড হয় পাণ্ডিত্যের দিকে, নয় তো পাণ্ডিত্যহীন রসানুভব প্রবণতার দিকেই বেশী ঝোঁকে- এমন একাঙ্গিতার দৃষ্টান্তই বেশী আমাদের আলোচনা-সমালোচনার ধারার মধ্যে। ডঃ দাসের রচনা এ-নিয়মের ব্যতিক্রম। ইতোপূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করে তাঁর পাণ্ডিত্যকর্ষিত রস-ভূয়িষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থে তাঁর মনোযোগ ন্যস্ত হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর। এখানেও সেই একই সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। নামে বইটি 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ' হলেও এতে বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনাও বড়ো কম নেই। কিন্তু রসই হোক আর দার্শনিকতাই হোক, দুইকে এক আধারে সার্থক সমন্বয়ে মেলাবার ক্ষমতা লেখকের সহজায়ত্ত, ভাষাও তাঁর তদনুযায়ী স্বচ্ছন্দ সচল উদ্দিষ্ট ভাবদ্যোতক। সমালোচনা সাহিত্যে ক্ষুদিরামবাবু অচিরেই তাঁর নিজস্ব আসনটি সুনির্দিষ্ট করে নিতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বৈষ্ণব-রস-সাহিত্যের ভূমিকা স্বরূপে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার একটি বিস্তৃত অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক পটভূমির তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ ও পরিশেষে বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দর্শনসমূহের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক লক্ষণগুলি আলোচনা করে তিনি সবশেষে এসেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল প্রতিবাদ্য অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের আলোচনায় এবং এক তুলনামূলক পরিশীলনের সাহায্যে পূর্বোশিত দর্শনগুলির সঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য প্রকট করেছেন। এই দর্শনগুলির মধ্যে একমাত্র শংকরের অদ্বৈতবাদ বাদ দিলে আর সব দর্শনই কমবেশী দ্বৈতবাদী, তবে লক্ষণার দিক থেকে বিচার করলে বল্লভ প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈতের সঙ্গেই অচিন্ত্যভেদাভেদের মিল বেশী-এই লেখকের সুচিন্তিত

অভিমত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা একই সঙ্গে লীলাবাদ ও শক্তিবাদী। লীলাবাদী এই অর্থে যে, ভগবানের সঙ্গে জীবের ভেদ অভেদ দুই-ই তাঁরা কল্পনা করেছেন,শক্তিবাদী এই অর্থে যে, ভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিতে এই ভেদ অভেদের বিরুদ্ধতার সমাধানও হয়েছে গৌড়িয়-বৈষ্ণবীয় কল্পনায়। রামানুজ-মধ্ব-নিম্বার্ক- বল্লবের ভেদাত্মক চিন্তার এমনতরো সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিজে কোনো দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করে যাননি, প্রকৃতপক্ষে 'শিক্ষাষ্টক' নামে যে আটটি স্বল্পাক্ষর কিন্তু গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন এ ভিন্ন তাঁর আর কোনো লিখিত চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁর জীবণই ছিল তাঁর বাণী, আর সেই চর্যাভিত্তিক বাণীকে কেন্দ্র করেই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী দুশো বছর গৌড়-বাংলার বুকের উপর দিয়ে এক প্রবল ভাববিপ্লবের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল- কি সমাজমানসে, কি সাহিত্যে সংস্কৃতিতে। পদাবলী, গীত আর জীবণী কাব্যের এমন বিপুল ফসল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আর কোনো পর্বে দেখা যায়নি। লেখক এই সমস্ত রচনার রস-স্বরূপের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি সুদীর্ঘ অধ্যায়ে। বৈষ্ণব কাব্যে ভক্তির উপাদানের প্রাবল্য বহুবিদিত তথ্য, কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি এই ভক্তি-কাব্যের অজস্র সম্ভারকে ভক্তিদর্শনের সঙ্গে অংকিত করে বিচার করেছেন, যে ভক্তিদর্শনের গুণগত উৎকর্ষ ও পরিমাণও বড়ো কম বিস্ময়য়োদ্রেককারী নয়।

আরও যেটা বিস্ময়ের বিষয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই বিশাল ভক্তিরদর্শন কিন্তু বাংলার মাটিতে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল বৃন্দাবনে, ষড়-গোস্বামীদের প্রধান তিন প্রবক্তা সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামীর চেষ্টায় তাও বাংলা ভাষায় নয়, সংস্কৃতে। যে অচিন্ত্যভেদাভেদের কথা বলা হয়েছে, তারও জন্ম এইখানে। ভাগবত এই দর্শনের ভিত্তি এবং এই দর্শনের মূল সূত্রগুলি বিধৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। আরও লক্ষণীয়, এই দর্শন কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ চৈতন্যদর্শন নয়, রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণদর্শন। চৈতন্যের নবদ্বীপের সঙ্গী ও লীলাপরিকরেরা ভগবানের অবতার জ্ঞানে চৈতন্যকেই তাঁদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অনুরাগ ও পূজা নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণই উপাস্য দেবতা ও তাবৎ মনোযোগের কেন্দ্র । বাংলা ও বৃন্দাবনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের দরুণ কোনো কোনো পণ্ডিত (যেমন, ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রভৃতি) এই রূপ

অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীদের সৃষ্ট দর্শন স্বতন্ত্র এক দর্শন- নবদ্বীপের ভক্তিদর্শনে সঙ্গে এর বিশেষ কোনো মিল নেই। গ্রন্থকার এই মতের খন্ডন করে লিখেছেন যে , আসলে নবদ্বীপ আর নীলাচলে চৈতন্যের লীলা পরিকরেরা তাঁদের প্রভুকে কেন্দ্র করে যে ভক্তিদর্শনের সূচনা করেছিলেন, তা-ই পরিশ্রুত ও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়ে গোস্বামীদের কৃষ্ণদর্শনে রূপান্তরিত হয়েছিল। নীলাচলবাসী রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন দুই প্রান্তের মধ্যে ভাব-সংযোগের প্রধান বাহন। তদানীন্তন বিশ্বাস অনুযায়ী, বিশ্বম্ভর-চৈতন্যও তো কৃষ্ণই বটেন অন্তরে শ্যাম বাহিরে গৌর এই কৃষ্ণোন্মাদ অসাধরণ করুক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতীক। লেখকও এই বিশ্বাসের অনুবর্তী বলে মনে হলো।

এই বিশ্বাসের ক্ষেত্র এবং কৃষ্ণ কে স্বয়ং ভগবান মনে করা রূপ কতকগুলি প্রত্যয়ের ক্ষেত্র লেখক অপ্রতিবাদে ট্র্যাডিশন কেই মান্য করেছেন। তাঁর মতো বিচার সন্ধিৎসু সমালোচকের কাছে এ ব্যাপারে আরও একটু সচেতনতা আশা করেছিলাম, সে কথা স্বীকার করব। তিনিও যদি গতানুগতিক ভক্তদের মতো গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলেন তো গোড়ীয় বৈষ্ণব দশনের নূতন মূল্যায়ন হবে কী প্রকারে? তবে এই দিকটা বাদ দিলে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল ও যুগাদর্শের সঙ্গে সংগতিযুক্ত। গ্রন্থের একাধিক স্থলে নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি স্বার্থহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে দেখে আনন্দিত হয়েছি। দর্শন ধর্ম ও পুরাতন সংস্কৃতির আলোচনায় কায়েমী স্বার্থের পোষকতা করার একটা সাধারণ প্রবণতা আছে আমাদের ধর্মীয় লেখকদের মধ্যে। এই প্রবণতা থেকে আলোচমান গ্রন্থের লেখক মুক্ত, সে কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বারবার বলব।

(যুগান্তর , রবিবার, ২২ অক্টোবর ১৯৭২)

-o-

VAISHNAVA –RASA-PRAKASH: 1st Part: By Dr. Kshudiram Das. A.K.Sarkar & Co. /1-A, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Rs 15.

Dr Kshudiram Das, a veteran professor of Bengali language and literature combines in his make-up a happy amalgam of deep erudition and fine aesthetic sensibilities. We have seen this fusion in his studies of Rabindranath; now this is once more in evidence in his work on Vaishnava literature of which the first part has been out.

Although the back mainly deals with an exposition of the lyrical aesthetic qualities of Bengali Vaishnava poetry, the author supplies its philosophical back ground as well and that in an adequate measure. As a matter of fact, the entire corpus of Gandiya Vaishnava philosophy is taken due notice of to serve as a fitting backdrop to the principal subject-matter of discussion of the book. For example, the learned author makes a comprehensive study of the sailent features of the different representative vakti-philosophies of the South as propounded by Ramanuja, Nimbarka, Maldhava and Vallabhacharya and shows their affinities and differences with Achintya-Bhedaabheda-Tattva , a particular form of dualism developed by the Bengal school of Vaishnava thinkers. This dualistic philosophy, be it noted although it had its origin in Navadwip and around the personality of Chaitanya, when the people of the then Bengal and Orissa regarded as an incarnation of God was improved upon and perfected in Brindaban by the six Goswamins, and this after the passing away of the Master. The more notable among the six Goswamins were the two brothers Sanatan and Roop and their nephew, Jeev, and this celebrately trio, each one of them a highly erudite Sanskrit scholar were the men responsible for the building up of the imposing structure known as Gaudiya Vaishnavism comprising both its theology and poetics. The famous Achintya- Bhedaabheda was their creation.

The Navadwip and Neelachal (orissan) Vaishnavites poured their hearts best love and longing on Chaitanya, while the Brindaban

Goswamins placed Krishna in the central plank of their philosophical edifice in the light of the teachings of the Bhagvat. This dichotomy between the approach of the Bengal and orissan Vaishnavities and that of their Brindaban counterparts has baffled some scholars. But Dr. Das gives a convincing answer to this apparent riddle. His argument is that according to the associates and disciples of Chaitanya, the latter was no other than the embodiment of Krishna and Radha joined together, so there was no fundamental difference between the two approaches. Besides, the Goswamins of Brindaban did not formulate their philosophy of their own, they had their inspiration from the direct example of the Master, and as for the working out of the details of that philosophy, Rai Ramananda Swaroop Damodar and Raghunath Das (Goswamins) acted as the intermediaries between Neelachal and Brindaban and thus bridged the gulf between the two seemingly contrary standpoints.

From the middle of the sixteenth century onwards for an uninterruptedly period of nearly two hundred years Bengal witnessed a revolutionary upsurge of emotion in its life and society which it had not witnessed before. This was the direct outcome of the impact of Chaitanya and his Vaishnava faith. There was a leveling down of classes, and untouchability and some other social taboos were made short shrift of. The efflorescence of the Vaishnava movement found its best expression in literature where appeared a galaxy of padakartas with their fine lyrics and songs and a number of biographers of the life of Chaitanya both in verse and drama. The author takes stock of all these writings with his special attention on the 'rasa' aspect of the lyrics. Critical acumen and aesthetic sensibilities are blended together in the elaboration of what he seeks to make out by way of evaluation of Bengali Vaishnava poetry.

Except for marks of traditionality here and there, the author's outlook is on the whole progressive. What is particularly striking is his abiding sympathy for all manner of people belonging to the oppressed

and the depressed layers of society, a trait which lends an added charm to the discussion. In a sub-section of the book Dr. Das devotes a few pages to a comparative study of Vaishnava and Rabibdra poetry and opines that Rabindranath was essentially a nature- poet and that there was not much of mysticism in him as understood in the Vaishnavic sense.

-Narayan Chaudhuri -

-o-

সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ

ভূমি , সীমা, প্রমা ইত্যাদি সব শব্দ অবশ্যই যৎপরোনাস্তি সম্ভ্রান্ত; উপরন্তু অধ্যাত্মভাবনায় অনুপ্রাণিত কবিচিত্তের আলোচনায় এ-সব শব্দ অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিকও বটে। কিন্তু রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় এই জাতীয় ধোপদুরস্ত শব্দ গত কয়েক দশক ধরে এতই নির্বিচার প্রবুক্ত হয়েছে যে, এখন এগুলি 'ক্লিশের' মতো শোনায়। বুদ্ধিমান পাঠক ও শ্রোতা বিরক্ত হন; তাঁদের সন্দেহ জাগে যে, ব্যাপারটাকে অনর্থক অনচ্ছ করে তোলা হচ্ছে। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সন্ধানী । অন্তত এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের চিত্ত শুধুই 'ভূমা-অসীমের তত্ত্ব ' নিয়ে ব্যস্ত ছিল না। অসংখ্য মানুষের কাছে যিনি উপনিষদের ঋষিমাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের নানা ব্যাধি ও সমস্যাও যে অত্যন্ত প্রবলভাবে তাঁকে ভাবিয়েছিল এবং এক্ষেত্রও তাঁর সমকালীন নানা স্মাজ-রাজনৈতিক চিন্তকের তুলনায় তিনি যে আরও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, ডঃ দাস তাঁর গ্রন্থে সে কথা প্রমাণ করে ছেড়েছেন।

'সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ' –এর প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়লেই বোঝা যায় যে গ্রন্থকার ধোঁয়াটে কথার কারবারী নন ও ভাবালুতার ধার ধারেন না। শেষ পর্যন্ত পড়লে বোঝা যায় যে, যুক্তির সোপানগুলিকে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে তবেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের পৌঁছেছেন। বস্তুত সেই সোপানগুলিও তাঁর নিজেরই হাতে গড়া। তার জন্য তিনি যত্নভরে তথ্যের মালমশলা জোগাড় করেছেন। আপ্তবাক্যকে তিনি বিনাবাক্যে ছেড়ে দেন না। সংগৃহীত নানাবিধ সংবাদের আলোয় বারবার তাকে যাচাই করে নেন। এইটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।আসলে তত্ত্বে যে তাঁর আগ্রহ নেই তা নয় কিন্তু তত্ত্বকে তিনি হাওয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে চান না, তথ্যের উপরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান।

তা-ই তিনি দিয়েছেন। ফলত, রবীন্দ্রনাথের যে আধুনিক-মনস্কতার কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন সেই তত্ত্ব এখানে নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে না। স্থান ও কালের পটভূমিকায় তা একটি নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছে ও সেই কারণেই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে এখানে কালানুক্রমিকভাবে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সেই ভাবনার উন্মেষ ও বিকাশকে এখানে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যাতে প্রচলিত নানা বিশ্বাস ও ধারনা হয়তো বা দেখায়, কিন্তু এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রমানসের বিবর্তন ও রবীন্দ্র-ভাবনার ক্রমাগ্রগতি সম্পর্কে যাতে সন্দেহের

কোন অবকাশ থাকে না। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তাঁর আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন এবং অসংখ্য তথ্য প্রমাণের সাহায্যে তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে এমনভাবে সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাও যার ফলে অন্যতর তাৎপর্য পায়। বস্তুত, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'ঝুলন' ইত্যাদি কবিতাকেও তখন আমরা নূতনভাবে দেখতে শিখি। তবে, রবীন্দ্রনাথের প্রগতিভাবনা সম্পর্কে যাঁরা 'পাথুরে প্রমাণ' করতে চান, কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধগুলির সাক্ষ্যই সম্ভবত তাঁদের কাছে অধিকতর গ্রাহ্য হবে। জাতীয়তাবাদ , দেশগঠন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গ্রামীণ অর্থনীতি , শিল্পোদ্যোগ, ধনবণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সেই সাক্ষ্যগুলিকে এখানে সুন্দরভাবে গেঁথে তোলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণনায় যার আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গত সেই 'সবুজপত্র' সম্পর্কেও ডঃ ক্ষুদিরাম দাস জানাতে ভোলেননি যে, 'চলিত ভাষায় প্রবন্ধাদি লেখার ধারা প্রতিষ্ঠিত করা এই পত্রিকার গৌণ কীর্তি মাত্র, আসলে ভাবনাচিন্তার যাবতীয় 'জড়ত্ব ও শৈথিল্য থেকে শিক্ষিত বাঙালীকে উদ্ধার করা'ই ছিল এই পত্রিকার মুখ্য অভিপ্রায়।

ঋষিত্বের খোলস থেকে রবীন্দ্রনাথকে এই গ্রন্থে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দেখানো হয়েছে, তপোবনাভিমুখী কবি বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, আসলে তিনি অত্যন্ত আধুনিক মনের একটি মানুষ। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোথায় তিনি আধুনিক , এবং কেন।

(আনন্দবাজার , ২০ বৈশাখ ১৩৮১)

-০-

রবীন্দ্রনাথের নভোবিজ্ঞানী চেতনার প্রতিই বেশি মনঃসংযোগ

ক্ষিতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথের যখন এগারো বছর বয়স, সদ্য উপনয়নের পর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃদেব মহর্ষি গিয়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণে। ডালহৌসিতে থাকতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছেলেকে নিয়ে নীল আকাশের তলায় বসে তারার কথা বলতেন। প্রক্টরের লেখা সরল পাঠ্য ইংরেজী বই থেকে গ্রহতারকার কথা মুখে মুখে বুঝিয়ে দিয়ে ছেলেকে বলতেন সে-সব বাংলায় লিখে রাখতে। রবীন্দ্রনাথের পঁচাত্তর বছর বয়সে লেখা, 'বিশ্বপরিচয়' সম্ভবত সেই 'হোমটাস্কের' একটা কিস্তি, অপরপক্ষে হয়তো এ-বই তাঁর মহাকাশ কল্পবিহারের অন্যতম প্রবেশক ও অন্তিম পাঁচ বছরে রচিত কবিতার ভূমিকা। এগারো থেকে তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়সের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রশাখায় বিচরণ করেছিলেন। তাঁর এই বহু বিচিত্র বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় পরিমল গোস্বামী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার মজুমদার, প্রবাসজীবন চৌধুরী, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা পুস্তকে বা প্রবন্ধে। আমাদের আলোচ্য পুস্তকে ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্রনাথের নভোবিজ্ঞানী চেতনার প্রতিই বেশি করে মনঃসংযোগ করেছেন।

'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ দাস এই স্বল্পায়তন পুস্তকের সূচনায় 'সবিনয়ে স্বীকার' করেছেন, কবির জীবনের শেষার্ধে (১৯০১-৪১) রচিত বহু কবিতা ক্লাসে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে মনে তিনি বাধা অনুভব করেছেন, বুঝেছেন নভোবিজ্ঞান পরিচিতি ছাড়া এই শ্রেণীর কবিতার সম্পূর্ণ তাৎপর্য আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। নভোবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে, পূর্বলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও ইতস্তত প্রদত্ত বক্তৃতা গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে, দ্রুতগতিতে ও সংক্ষেপে তিনি এ-বই লিখেছেন-মূলত সাহিত্যের ছাত্রদের সুবিধার জন্য।

মুখবন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার লিখেছেন, "এটি রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে তাঁর (ডঃ দাসের) চতুর্থ পুস্তক এবং একেবারে অভিনব। এতে রবীন্দ্র কবিতায় পরমাণু বিজ্ঞান ও নভোবিজ্ঞানের গভীর অনুষঙ্গ কবিতা ধরে ধরে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়েছেন। .... ডঃ দাসের ব্যাখ্যা, বিশেষত বিজ্ঞানের অংশগুলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং সেগুলির প্রাসঙ্গিকতায় ও যথাযথতায় আকৃষ্ট হয়েছি।" ডঃ পোদ্দারের মতো

একজন বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রশাসক ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের এই মন্তব্য পুস্তকের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা প্রমাণ করে।

বিষয়বস্তু বিশদ করতে গিয়ে ডঃ দাস ভাষা ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক ও তুলনামূলক অভিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে সম্ভবত পরিভাষা প্রয়োগে তিনি সুদক্ষ হয়ে উঠেছেন।

লেখকের ভূমিকা দু-ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে তিনি বলেছেন রামায়ণ-মহাভারতের স্রষ্টাদের মতো, কালিদাস-শেক্সপীয়ারের মতো, রবীন্দ্রনাথ একজন মহাকবি। তাঁর মতে, শুধু আমাদের একালেই নয় ভাবী কালেও তিনি যে বহুদূর অতিক্রম করে যাবেন, এমন স্বাক্ষর তাঁর রচনায় যথেষ্ট। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের এতখানি আত্মিক সম্পর্ক তাঁর আগে কোনো সাহিত্যিকের লেখাতেই দেখা যায়নি, বিজ্ঞান অন্তরঙ্গতার এই নজিরে আধুনিক কাব্যে তাঁর জুড়ি নেই-আজও তিনি আধুনিকতম কবি। কেবল মহাকবি নন, ডঃ দাসের মতে রবীন্দ্রনাথ একালের একজন প্রবল মানবতাবাদী এমন কি সমাজ সাম্যবাদীও। এই উক্তির সমর্থনে মাক্সীয় যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি ঈশ্বর, উপনিষদ, অধ্যাত্ম, মহর্ষি, ব্রহ্মসমাজ, নৈবেদ্য প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যার সঙ্গে মূল বিষয়বস্তু সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত।

ভূমিকায় দ্বিতীয় অংশে লেখক রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে দেশে-বিদেশে জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, পরমাণুতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে অগ্রগতি হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদূর বিস্তারী কল্পনা ও অপরিমেয় বিস্ময়ে পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কে নূতন নূতন জ্ঞানের বিস্তার বিষয়ে নিজেকে অবহিত রাখতেন, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সাগ্রহে অনুধাবন করতেন। তাঁর এইসব গ্রন্থ প্রবন্ধাদি পাঠের প্রত্যক্ষ ফল হল তাঁর লেখা ছাত্রপাঠ্য পুস্তক, 'বিশ্ব পরিচয়' এবং পরোক্ষ ফল হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা বিজ্ঞানের সত্যদ্বারা প্রভাবিত বহু কবিতা ও গান। লেখকের মতে এইসব লেখা পড়ে বুঝতে পারা যায় আধুনিক বিজ্ঞানকে কবি কেবল বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেননি, মিশিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের সঙ্গে, যার ফলে তাঁর কল্পনার স্বরূপই গিয়েছিল বদলে।

পরমাণু নির্ভর মহাকাশ অধ্যায়নের মূল কথাগুলি ভূমিকার দ্বিতীয়াংশে বিবৃত করে লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ে হাত দিয়েছেন। আলোচনার যথাযথতা বজায়

রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-নির্ভর কাব্য বা কবিতাকে তিনি কালনুক্রমে তিনটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন এবং মূল বিষয়বস্তু নিরিখে তৎ তৎ পর্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তাঁর হিসাব অনুসারে প্রথম পর্বের বিস্তারঃ 'কবিকাহিনী' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত; এই পর্বের আলোচ্য বিষয় হল পূর্ব প্রচলিত জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে রবীন্দ্র কাব্যের সোহার্দ্য বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার ; 'বলাকা' থেকে 'বিচিত্রিতা' পর্যন্ত; এই পর্বে লেখক উদাহরণ সহযোগে বিচার করেছেন যথার্থ নভোবিজ্ঞানের সঙ্গে কবির আন্তরিক মিলনের কথা। তৃতীয় পর্বের বিস্তার 'শেষ সপ্তক' থেকে 'জন্মদিনে' অবধি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার এই শেষ পর্বে লেখক লক্ষ্য করেছেন নক্ষত্র-নীহারিকাময় মহাকাশের নিয়ত রূপান্তরে কবির সুদৃঢ় আস্থা আপেক্ষিকতা-নির্দেশিত দেশ কালের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে কবির নিশ্চিত প্রত্যয় এবং তারই অনিবার্য পরিণাম-স্বরূপ সৃষ্টি-ধ্বংস লীলার সঙ্গে তাঁর একান্ত একাত্মতা।

লেখক কী ধরনে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন তার নিদর্শন স্বরূপ এই তৃতীয় পর্বের কিছু কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করা যাক- 'রোগশয্যায়' কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় মহাকাশের ধ্বংস সৃষ্টির সঙ্গী হিসাবে কবি নিজেকে ভেবে নিয়েছেন এবং সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসারেই নিজেকে মহা-চৈতন্যের অংশ বলে মনে করেছেন। আঠাশ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন- যে চৈতন্যজ্যোতি/ প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে/ নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়/ আদি যার শূন্যময়, অন্ত যার মৃত্যু নিরর্থক/ মাঝখানে কিছুক্ষণ/ যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদভাসিত/ এ-চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে/ আনন্দ অমৃতরূপে..../

মনে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সূত্র পাবার পর উপনিষদ-কথিত আনন্দরূপমমৃতম কবির কাছে পরিষ্কার হয়ে পড়ছে। তিনি জ্যোতিষ্করশ্মির মধ্যে সৃষ্টির সেই অমৃতরূপ অনুভব করছেন ....। তাঁর এখন আর সন্দেহ নেই যে 'তমসার পারে জ্যোতির্ময়' বলে তিনি উপনিষদের যে-বাণীকে একদা অভিনন্দিত করেছিলেন তার স্বরূপ-পরিচয় বিজ্ঞান-বিশ্লেষিত জ্যোতিঃ কণিকার মধ্যেই নিহিতঃ

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই/ জানি আমি, তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।/ এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে/ চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে/ আমার হয়েছে অভিষেক ....।

কী এই আদি জ্যোতি? এ কি সেই সর্বব্যাপী মহাজ্যোতি যা জড় বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের ঐক্য সম্পাদন করছে যার কথা কবি লিখেছিলেন তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' পুস্তকের উপসংহারে, প্রাকৃতবিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বের ভিত্তিতে? এ কি সেই উপনিষদুক্ত আবিঃ-বিশ্বের প্রকাশে শক্তি –যা মানুষের চৈতন্যকে মহাবিকিরণের পথে নিয়ে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে? এই শেষ প্রশ্নটি সমালোচকের –লেখকের নয়।

(আনন্দবাজার রবীন্দ্রকল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস)

-o-

নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

সবার নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছেন যিনি, যিনি কত অজানারে জানিয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণার নতুন পথ কি ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে? যখন এমন একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে এদেশের পুচ্ছগ্রাহী বাঙালি গবেষকেরা, তখন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের রবীন্দ্র-বিষয়ক পঞ্চম গ্রন্থ আমাদের বোধ ও বোধির জগতে জাগিয়ে দিল আলোড়ন। গ্রন্থের শিরোনামঃ 'চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি'। অধ্যাপক দাসের সেই খর্বতনু বর্ণোজ্জ্বল গ্রথখানি, নাম যার 'রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার', প্রথম প্রকাশ-মুহূর্তেই মুগ্ধ করেছিল মনোযোগী জিজ্ঞাসু পাঠকদের। বুঝিয়ে দিয়েছিল, রবীন্দ্র-মহাকাশে এখনও প্রতীক্ষায় আছে প্রোজ্জ্বল কোনও নক্ষত্র, সতর্ক পথিকের দ্বারা আবিষ্কারের প্রত্যাশায়। সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানিও এমন চব্বিশটি রবীন্দ্র-বিষয়ক বিস্ময়কর প্রবন্ধের সংকলন যাদের আপাত-অসংলগ্নতার অন্তরালে একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় গোপনে কাজ করে গিয়েছে নিশ্চিদ্র নিপুণতায়।

চব্বিশটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন তাদের শিরোনাম। কিন্তু সব মিলে একটিই নামঃ 'চলমান রবি'। স্বয়ংস্প্রভ যিনি, আপন কক্ষপথে সংক্রমণকালে তাঁর রূপান্তর ঘটলেও স্বভাব থাকে অবিনশ্বর। লোকজগৎ স্রষ্টার (সূর্য) এই স্বরূপ অলৌকিক রসস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেও ছিল সমান সত্য। 'রবীর চলার কক্ষপথে পালাবদল' লক্ষ করতে করতেই অধ্যাপক দাস অলৌকিক প্রতিভার (প্রতিভা বৈজ্ঞানিকের বীক্ষণাগারে বিশ্লেষ্য নয়- এই অর্থে 'অলৌকিক') বিভিন্ন বিকাশের অনন্যতা লক্ষ করেছেন এবং পাঠক সাধারণকেও লক্ষ করতে শিখিয়েছেন। রাজনীতি, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান- রবীন্দ্র-মননে অনাহুত ছিল না কোনও কিছুই।

জ্ঞানের বিশ্বরূপ দর্শনের সুযোগ যিনি পেয়েছেন, তাঁর ভাব ও ভাবনায় সব কিছুই ছায়াপাত করেছে অনায়াসে। তবে অপরের চোখের সামনে যখন বর্তমানের প্রাচীর দাঁড়িয়ে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য মূর্তিতে, তখন রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী দৃষ্টির আলো রঞ্জনরশ্মির মতো হয়েছিল অন্তর্ভেদী ও গোপন ব্যাধি আবিষ্কারে সমর্থ। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষণবাদ তো রবীন্দ্র-দর্শনে নন্দিত নয়। তাই পরাধীন ভারতের সর্বোত্তম সচেতন নাগরিক হিসাবে তিনি যে-সত্য উচ্চারণ করতে

পেরেছিলেন তা কালান্তরেও সত্য। 'সংগ্রামী জনজাগরণে কবির ভূমিকা' এবং গণ চৈতন্যের জাগরণে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দুটিও লক্ষ করতে বলি। 'রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে সমাজ ও স্বরাজ' এবং 'মানুষের সপক্ষে মহাকবি' প্রবন্ধ দুটিও একই সঙ্গে পঠনীয়। ঠিকই লিখেছেন তিনি- 'দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধ'রে তাঁর উচ্চারিত ও দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রদর্শিত গঠনমূলক স্বাদেশিকতার পথে দেশ চলল না। স্বায়ত্তশাসন পেলেও এর ফল যা দাঁড়াবে, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মত রবীন্দ্রনাথ তা পূর্বাহ্নেই বুঝেছিলেন। অথচ দেশের রাজনীতি ও ব্যক্তি-চরিত্র সম্পর্কে হতাশা কবিকে আত্মকেন্দ্রিকতায় পিছিয়ে নিয়ে যেতেও পারেনি। দেশের গুরুতর সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন কবি পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন'। (পৃ ১০০) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা এই স্তরের কেউ। রাজনীতির সাধনা তাঁর নয়। অথচ এই অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের কাছে অধমর্ণ ছিলেন রাজনৈতিক জগতের প্রাজ্ঞরাও। এমনকি তাঁর সিদ্ধান্ত ও সংকেত উত্তর-স্বাধীনতা পর্বেও নিগূঢ় তাৎপর্যবহ।

'আধুনিক বিজ্ঞানের ধারায় এক মহাকবির যোগদান' প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীদাস যখন লেখেন- 'রবীন্দ্রনাথের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের পারস্পরিক মহাকর্ষের গণনা ছাড়িয়ে সূর্য-তারকা-নীহারিকার রহস্য ভাঙতে আরম্ভ করেছে' (পৃ ১৪১) তখন নিতান্তই সাধারণ সংবাদ বলে তথ্যটি গণ্য হয়; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান কীভাবে পূর্বেকার শতকের বেড়া ভেঙে এগিয়ে চলেছে প্রবল বেগে, এ বিষয়ে যখন সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেন (পৃ ১৩৭-১৪১) বিজ্ঞানের ছাত্রের নিষ্ঠাসহ- একটি তথ্যকেও উপেক্ষা না করে – তখন বিজ্ঞানের ঘোষিত ছাত্রও তাঁকে সমীহ জানাতে বাধ্য হয়। কিছু পরেই অধ্যাপক শ্রীদাস 'প্রাণ বিজ্ঞানে কবির দীক্ষা ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রবর্তন প্রবন্ধটি লিখে রবীন্দ্র-সমালোচকরূপে আপন যোগ্যতা আর একবার প্রমাণ করলেন। আসলে মানব-প্রজ্ঞার বিভিন্ন কক্ষে যে রবি চলমান, তাঁর সৃষ্টিসামর্থ্যের মূল্যায়ন করতে গেলে সমালোচককেও সমানধর্মী হতে হবে; কারণ 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্' চিরকালই স্রষ্টার পক্ষে করুণ। গবেষকরূপে অধ্যাপক শ্রীদাসের এই শ্রম অবশ্যই অভিনন্দনীয়। এও এক বিস্ময়। একটি প্রবন্ধে ('একটি কবিতার একক কবি') তিনি 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপেক্ষিত এক শ্রেণীর প্রতি আত্মাভিমানী শিক্ষিতজনের আচরণকে নিন্দা করে অব্যর্থ বাক্য প্রয়োগ করেন নির্দ্বিধায়, পরমসহায় রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে- 'আজকের দিনে চাকরিতে সংরক্ষণ সত্ত্বেও উল্লেখ্য কিছু যে হচ্ছে না তার কারণ এদের শিক্ষার অভাব ও উচ্চবর্ণের ঘৃণিত

স্বার্থবুদ্ধি (পৃ ৮৩) মাঝে মাঝেই এই ধরনের মন্তব্য শিক্ষাভিমানীর কাছে জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ভূমিকা পালন করেছেন। চিন্তার বলিষ্ঠতা যে নৈসর্গিক তারুণ্যের মুখাপেক্ষী নয়, অধ্যাপক শ্রীদাস তা আর একবার বুঝিয়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে।

(যুবমানস জুন ১৯৯৪)

(চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, মল্লিক ব্রাদার্স)

চোদ্দশ'সাল ও চলমান রবি

বিনতা রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের 'চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার পরিচিতি। শুধু কাব্য নয়, শুধু গান নয়, নয় শুধু গদ্য, এখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্বাপর মানসিকতাটুকু তিনি ধরতে চেয়েছেন। গ্রন্থ একটি হলেও এর রচনাগুলি ধারাবাহিক বা কোন ক্রমানুসারী নয়। মোট চব্বিশটি পৃথক পৃথক নিবন্ধ নিয়ে গ্রন্থটি পূর্ণ হয়েছে। ফলে অধ্যায় বিভাগও নেই। নিবন্ধগুলি নিজেরাই এক-একটি ছোট গল্পের মতো পর পর স্থান পেয়েছে। ফলে বিষয়বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেকটি রচনা সামগ্রিক স্বাদুতা বহন করে। চোদ্দশ' সালে দাঁড়িয়ে এই প্রাজ্ঞ সমালোচকের রবীন্দ্র-অবলোকনের মূল্য কম নয়।

নিজ বক্তব্য ব্যাখ্যানে দ্বিধাহীন মনোভাব প্রকাশই তাঁর রচনার সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন, 'কর্ণকুন্তীঃ মহাভারতে ও রবীন্দ্র নির্মাণে' প্রবন্ধটি তিনি শুরু করেছেন এভাবে- 'মহাভারত পুরাণও নয়, মুখ্যভাবে কাব্যও নয়, ইতিহাস। শ্লোক ছন্দে তথা আরও বিভিন্ন ছন্দে লেখা হলেই কাব্য কবিতা হয় না।' তারপর সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন কুন্তী ও কর্ণ চরিত্রকে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বলেছেন- 'কারও সঙ্গে গোপন প্রণয়ের ফলে কুন্তী সন্তানধারণ করেন এবং ক্রমে সে পরিবারে তা জানাজানি হয়ে গেলে লোকলজ্জায় পড়ে পরিশেষে সন্তানটিকে মোমের পেটিকায় সুরক্ষিত করে নিকটবর্তী অশ্ব নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।' কুন্তীর অপর তিন পুত্র লাভ সম্পর্কে সমস্ত অলৌকিক কাহিনী বর্জন করে তিনি বলেন পাণ্ডুর যৌন অক্ষমতার জন্য তৎকালে প্রচলিত নিয়োগপ্রথা অনুয়ায়ী যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের জন্ম হয়। মহাভারতের কুন্তী চরিত্র ব্যাখ্যা করে তার পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথের হাতে কুন্তী চরিত্রের রূপবদল দেখিয়েছেন, কিভাবে মহাভারতের নির্দয় স্বার্থান্বেষী কুন্তীকে রবীন্দ্রনাথ স্নেহাতুর মাতৃমূর্তিতে রূপায়িত করেছেন। অবশ্য লেখকের অন্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' তে কুন্তী ও কর্ণ চরিত্রের রূপবদল বিশ্লেষণে তিনি অনেক বেশি বিশদ ও প্রাঞ্জল, সন্দেহ নেই। তবে এই প্রবন্ধটিও স্বল্প অবয়বে সংহত ও সুগঠিত।

'রবির চলার কক্ষপথে পালাবদল' প্রবন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টি প্রেরণ করে লেখক রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রবণতার মূল সুরটিকে ধরতে চেয়েছেন যেখানে

চিরচলিষ্ণুতার প্রতি কবির গভীর আনুগত্য ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে কল্পনা ও বাস্তব এই দুইয়ের দ্বন্দ্বময় বহিঃপ্রকাশ সদা লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-মন যখন সৌন্দর্যপিয়াসী স্বপ্নময় রাজ্য অবাধ বিচরণরত তখনই আবার বাস্তবের কঠিন আঘাতে উদ্বেলিত তার মন ছুটে গেছে সাধারণ মানুষের দুঃখজর্জর জীবনের দিকে। একইভাবে নিজের হৃদয়মধ্যেও আবার পালাবদলের পালা চলছে অহরহ। একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানা জনমত তৈরি হয়েছিল, কবিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, তিনি দুঃখ ও অমঙ্গলের ছবিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন; কারণ তিনি চিরশান্তি ও ঈশ্বর-নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত কবি। ক্ষুদিরামবাবু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রবন্ধটিতে যত্ন সহকারে এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন, বিস্তৃত করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্র- মানসিকতায় ঈশ্বরের স্থান কোথায়। অজস্র উদ্ধৃতি সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানবজীবনের দুঃখ, সংগ্রাম ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভ হয়। এক জায়গায় বলেছেন ' তাঁর দেবতার ক্ষেত্র হল অভিযাত্রী মানুষের মধ্যে।' ডঃ দাস এ কথাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, কবিকে অহিংসার ভক্ত বলে যত প্রচারই করা হোক না কেন, কবি কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করতে আমাদের শেখাননি। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রবৃত্তিও তিনি বিহিত করেছেন- 'হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী মানসিকতার ও কর্মপ্রয়াসের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করা হয়েছে 'প্রতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়তই অন্যায়, অবিচার, অসংগত অবহেলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। অহেতুক ইংরেজ-তোষণের বিরোধী ছিলেন তিনি। বারংবার স্বদেশের ভাষা ও শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার তার অন্যতম স্বাদেশিকতার নিদর্শন। তিনি প্রথমাবধি জাতি-ধর্ম ছোঁয়াছুঁয়ির প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। যে কোনও রকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্য তিনি দায়ী করেছেন আমাদের মানসিক হীনম্মন্যতাকে, সাবধানও করেছেন। মেহনতী মানুষের শ্রমের প্রতি তাঁর যেমন ছিল নিরঙ্কুশ সম্মানবোধ, তেমনই ছিল ঐশ্বর্যশালীদের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। নিপীড়িত শোষিতদের প্রতি দুর্ব্যবহারকে কখনই ক্ষমার চোখে দেখেননি। জীর্ণ-পুরাতনকে দূর করে নবীনকে–নবচেতনাকে-নতুন যুগকে দু হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতাকে প্রবন্ধকার এমন দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন যে, অজান্তেই আমরা তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি। এখানেই একজন লেখকের কৃতিত্ব।

সৃজনীমূলক সাহিত্য সমালোচনার সময়ে সমালোচকের মূলত দৃষ্টি থাকে রসাস্বাদন ও রসপরিচয়দানে সর্বোপরি তার সাহিত্যমূল্য নিরূপণের দিকে। এমন কি সমালোচনাও কখন কখনও সৃজনাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ব্যাখ্যার স্বকীয়তা ও সৌন্দর্য আমাদের এমন মুগ্ধ করে ফেলে যে, ক্ষণিকের জন্য মূলের বিস্মরণ ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ সমালোচনা রসপরীক্ষাও। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত' আমরা মগ্ন হয়ে পড়ি না কি? এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই গ্রন্থের 'নিসর্গ থেকে মানুষের দ্বারে বা 'রূপদর্শীর চোখে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ পড়ার সময়ে আমরা মগ্ন হয়ে পড়ি। কি চমৎকার ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন দেশ-কাল-অভিঘাতের ফলে কবির নিসর্গ- কল্পনা কিভাবে সমাজ কল্পনার রূপ নিয়েছে। কালের প্রয়াণপথে কবি-অনুভবে বসন্ত ও যৌবনের কি রূপান্তর ঘটেছে। কবিতার অসংখ্য পঙ্‌ক্তি চয়ন করে রচনার শব্দার্থগত চারুতা, চিত্রগত রমণীয়তা এবং ধ্বনিমাধুর্যের সংকেত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। কাব্যের রসবিচার করতে গিয়ে নিজেই হয়ে উঠেছেন একজন খাঁটি রূপদর্শী।

ক্ষুদিরাম দাসের রচনাভঙ্গির বা মানসিকতার সব থেকে বড় সম্পদ হল তিনি কোন রবীন্দ্র-সমালোচক বা বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নন। তিনি সব সময়েই তাঁর চিন্তাভাবনার নিজস্বতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতাটিকে বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকেন। এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। অত্যন্ত সাবলীলভাবে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, উৎসর্গ-নৈবেদ্যের বিশ্বদেব, ব্রহ্মসংগীত ও গীতাঞ্জলির প্রভু, নাথ, দেখে তাঁকে যারা ঈশ্বরদর্শী বা ঈশ্বরবাদী বলে ভাবেন তাঁরা ভুল ভাবেন। তিনি ঋষি, সাধক, গুরু কিছুই নন। তিনি আসলে একজন কবি। 'কাল্পনিক নিসর্গ-সৌন্দর্য এবং প্রখর সমাজবোধ এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যে কবি আসা-যাওয়া করেছেন তাঁর কাব্যজীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত।' 'চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি' রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন বিশেষ অংশের সমালোচনা নয়, নয় কোন পর্যায়ক্রমিক আলোচনাও। এতে রয়েছে চির আধুনিক রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম চিত্তবাসনারই পরিচয়দানের প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, কাব্য থেকে প্রবন্ধ ও পত্রাবলিতে- প্রবন্ধ থেকে গল্পে- সর্বত্র লেখকের অবাধ বিচরণ ঘটেছে কবি রবির হৃদয়মন্দিরে সজ্জিত ভাবনাকুসুমগুলির সামগ্রিক রূপ উদ্ভাসিত করে তোলার মহৎ অভিপ্রায়ে। যে রবীন্দ্রনাথ থামতে জানতেন না, যিনি চলিষ্ণুতার সত্যকে পরম সত্যরূপে জ্ঞান করতেন, সেই চলামন রবিরই পরিচয় জ্ঞাপন হয়েছে এই গ্রন্থে।

(দেশ পত্রিকা, ৩-রা ডিসেম্বর ১৯৯৪)

চলিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ

মানস মজুমদার

গ্রন্থকার প্রথিতযশা। রবীন্দ্রসাহিত্যের পঠনপাঠনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা গ্রন্থকারের 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়', 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবানী', 'সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' গ্রন্থসমূহের সঙ্গে সুপরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনার জগতে এক স্বতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক তাঁর নবতম গ্রন্থ 'চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি' এবছর রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। সেদিক থেকে গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ চিরচলিষ্ণু। তাঁর মনন, কল্পনা, সৃষ্টি সবকিছু সম্পর্কেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি জানেন, পরিবর্তনই সত্য। জীর্ণ পুরাতন বর্জনীয়। সৃষ্টিতে জয় হয় চিরনূতনের। সেই চিরনূতনেরই বার্তাবহ তিনি। তাঁর মনন-চিন্তনের ধারাটি তাই স্বতঃ সজীব। তাঁর কল্পনা বিচিত্র পথগামী। তাঁর সৃষ্টি বহু শাখায়িত, বৈচিত্র্যদীপ্ত। 'কল্পনা ও বাস্তব, নিসর্গ ও মানুষ, নগর ও গ্রাম, বিশ্ব ও স্বদেশ, পৃথিবী ও মহাকাশ, প্রাচীন-বর্তমান ও ভাবীকাল তাঁর কাব্যে নাট্যে গানে এত বিচিত্র মূর্তি ও এমনই চিত্তাকর্ষক ভাষার ইঙ্গিত নিয়ে রয়েছে যে তিনি এক অপরিমেয় বিস্ময়ের উৎসটি উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রয়াসী হয়েছেন বিস্ময়ের পরিমাপে।

বলা বাহুল্য, সে প্রয়াস সার্থকও হয়েছে। আর এই বিস্ময়ের উৎস উন্মোচন করতে গিয়েই ডঃ দাস চিরচলিষ্ণু রবীন্দ্রনাথের গতিশীল সত্তাটির স্বরূপ-রহস্য-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ডঃ দাস রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ, স্বদেশ ও বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রেখে যেমন বিচার করেছেন, তেমনি সমকাল থেকে চিরকালের ধারাবাহিকতায় তাঁর স্থানটি নির্ধারণে মনোযোগী হয়েছেন। তিনি মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ নিছক স্বপ্নপ্রবণ সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমাত্র নন, নন বাস্তব জগতবিমুখ তুরীয়বিলাসী, বরং তিনি তাঁর কালের একজন প্রবল মানবতাবাদী, এমনকি সমাজসাম্যবাদীও। 'আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণের আশ্রয়ে প্রগতিমূলক জাতীয়তাবাদী, চিরনবীনতার পথিক এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য পর্যবেক্ষণে আস্থাবান' । জীর্ণ প্রথাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ তিনি, জাতিবর্ণ ও

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরোধী দুঃখবিপদ বরণে অকুতোভয় সংগ্রামশীল। সুদূর মহাবিশ্বের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ অনুভবে অক্লান্ত তিনি।

বাংলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্যের, সামগ্রিক সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজনীতির লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচী থেকে তাঁর সমাজ-প্রীতি ও স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব ও কর্মকে তিনি একসঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। হয়তো সম্পূর্ণ সফল হন নি। এ বিষয়ে ডঃ দাসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য; 'গ্রাম-সংগঠনের আদর্শ আজকের পঞ্চায়েতের রূপে কিছুটা কার্যকর হতে চলেছে, বাঙলায়, কিন্তু ভাবাদর্শে স্বপ্নে এই বিপ্লবী কবি যা অনুভব করেছিলেন সেই সমগ্রতা কখন সুলভ হবে কে জানে? তবে আন্তজাতিক আদর্শে আজকের আত্মশোধন ও প্রগতির পূর্ব দিশারী হিসাবে কবি চিহ্নিত থাকবেন বহুদিন, তাঁর কল্পনাদৃষ্ট নিঃসীম মানবিকতা আয়ত্তে না এলেও'।

সন্দেহ নেই, ধনতান্ত্রিকতা বা অর্থলোভ সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। শুধু তাই নয়। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রজাতিগুলির চরিত্র-স্বরূপ তিনি মর্ম দিয়ে অনুভব করেছিলেন। বিশ্বজোড়া শোষণ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের উৎসটিকে তিনি নির্ভুলভাবে সনাক্ত করেছিলেন। তাই ন্যাশানালিজমের বিরুদ্ধ মুখর হয়েছিলেন। ডঃ দাস যথার্থই বলেছেন; 'আদর্শবাদী ভাবুক হিসাবে তিনি যাই বলুন সাম্রাজ্যবাদের ধনতান্ত্রিক পশ্চাৎপট রাজনীতি-অর্থনীতিবিদ না হয়েও তিনি শুধু মনীষার জোরেই ধরেছেন এইটিই বিশেষভাবে দেখার বিষয়'।

রবীন্দ্রনাথের সমাজমুখী দৃষ্টি আত্মমগ্ন প্রেম-সৌন্দর্যের জগতে তাঁকে স্থায়ীভাবে বদ্ধ করে রাখেনি। জন্মসুত্রে এবং কর্মসূত্রে বুর্জোয়া গোষ্ঠির মানুষ হলেও শ্রেণীস্বার্থকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। মেহনতী মানুষ ও অন্নহীন কৃষাণের জীবনের শরিক হতে চেয়েছেন। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার বিরোধিতা করেছেন। যাবতীয় অন্যায় অবিচার, শোষণ-পীড়ন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে অতিশয় সচেতন তিনি। ডঃ দাস তাই লক্ষ্য করেছেনঃ 'কবি রমণীয় সৌন্দর্যের ও শব্দবিন্যাসের মায়া সৃজনে অদ্বিতীয় হলেও চলিষ্ণু ও সংগ্রামী মানুষের দুঃখময় জীবন-সংঘাতেরও নিয়ত সঙ্গী হয়েছেন-হয় কাব্যে ও নাট্যে, নয় প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, কর্মে ও নানান বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে'।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আয়ুষ্কালে বহু উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে। যে সমস্ত আবিষ্কার জীবজগৎ, বস্তুপৃথিবী ও মহাকাশকে একত্রে বেঁধেছে। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত আবিষ্কার সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের মিশ্রণে 'পাঠক সাধারণের মানসিক আনন্দের পরিধি এমনভাবে প্রসারিত করে তোলা যায়, এ রবীন্দ্রনাথই বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন'। 'নৈবেদ্য'র 'গ্রহে সূর্যতারকায় নিত্যকাল ধরে/ অণু- পরমাণুদের নৃত্য কলরোল' কিংবা সায়াহ্ন পূর্বের কবিতার 'চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে/ কেন্দ্র তার তারাপুঞ্জ মহাকাশ-চক্র-পথে ঘুরে' প্রভৃতি পংক্তি তার দৃষ্টান্ত।

'চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি' গ্রন্থে এভাবেই রবীন্দ্রনাথের চলিষ্ণু স্বভাবের পরিচয় প্রদত্ত। তথ্য-তত্ত্ব, যুক্তি ও উদাহরণ সহায়তায় ডঃ দাস তাঁর আলোচনার ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর লেখার সংযম ও পরিমিতিবোধ অসাধারণ। সংহত সুসমঞ্জস বাক্য পরস্পরায় আলোচনাকে ঘনপিনদ্ধ রূপদানের কৌশলটি তাঁর অনায়াস-আয়ত্ত। আলোচনা অত্যন্ত সঞ্জীব। রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক-সমাজে গ্রন্থটি যে সমাদর পাবে, সে আশা নিশ্চয় করা চলে।

(চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি, গণশক্তি, ৮ই মে, রবিবার, ১৯৯৪)

বানান বানানোর বন্দরে

ক্ষুদিরাম দাসের 'বানান বানানোর বন্দরে' সাম্প্রতিক বানান সংস্কার প্রচেষ্টার অসংগতির বিষয়ে একটি পুস্তিকা। এটিকে একটি জোরালো মনোগ্রাফও বলা যেতে পারে। একত্রিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার দুটি অংশ। প্রথম অংশে লেখক বানান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইত্যাদি সংক্ষেপে বলেছেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি 'সংস্কারকদের প্রস্তাবিত বিষয়' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁর আলোচনার উপলক্ষ চারটি বই ও পুস্তিকা- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির 'বাংলা বানান সংস্কার-একটি ভিত্তিপত্র', সাহিত্য সংসদের 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম', শিশু সাহিত্য সংসদের 'হাসতে হাসতে বানান' ও আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'বাংলা-কী লিখবেন কেন লিখবেন'। লেখকের মতে সংস্কারকরা হ্রস্ব-ইর প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে অটবী, রজনী, ধরণী, শ্রেণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বানানকে বদলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। তাঁর প্রবলতর আপত্তি জাতিবাচক ও ভাষাবাচক শব্দে, স্ত্রীলিঙ্গে এবং বিশেষণে দীর্ঘ-ঈকার বর্জনে (পৃ. ২০,২৩)। অধ্যাপক দাস প্রচলনের যুক্তিতে ইংরেজি, বাঙালি প্রভৃতি শব্দে হ্রস্ব-ইকার মানতে রাজি। তাই যদি হয় তবে খুশি, ফরাসি, কেতাবি নয় কেন ?

অধ্যাপক দাসের সবচেয়ে সাহসিকতাপূর্ণ প্রস্তাব মনযোগ, মননিবেশ প্রভৃতি বানান, বাক্‌ধারা, দিক্‌ভ্রম, দিক্‌দর্শন প্রভৃতি বানান, প্রতিযোগিতা, মনস্বীতা, দায়িত্ব, বিরোধীতা প্রভৃতি বানান এবং কর্তাকারক, যোদ্ধাবৃন্দ প্রভৃতি শব্দ। তাঁর এই সব প্রস্তাব এখনই গৃহীত না হওয়াই সম্ভব। তবে প্রস্তাবগুলির মধ্যে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মত খুব জোরালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ৭৪ বর্ষ ২ সংখ্যা রবিবার ৪ চৈত্র ১৪০১)

(বানান বানানোর বন্দরে, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস। ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স, ১৫.০০)

অধিকার ও চিন্তার ব্যাপ্তি

বারিদবরণ ঘোষ

ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্কলিত পঁচিশটি প্রবন্ধের বিষয় বিচিত্র। প্রাচীনপর্বে চৈতন্য-মুকুন্দ, আধুনিক পর্বে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পাশে সুকান্তের কাব্য নিয়ে আলোচনা তাঁর অধিকারের ব্যাপ্তিকে সূচিত করে। মুকুন্দরামের কাব্যে 'গুজরাটে' কালকেতুর রাজ্যস্থাপন প্রসঙ্গে 'গুজু' অর্থে ছোট এবং 'রাট' অর্থে দেশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন- সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে কবি অন্য কোনও কাব্যে কি এই অর্থের প্রয়োগ আমরা দেখতে পেয়েছি? গির অরণ্যের সিংহ এবং অষ্টাদশভূজা দেবী মূর্তির উল্লেখ তো গুজরাট প্রদেশকেই স্মরণ করায়- যদিও এই প্রদেশ সম্পর্কে মুকুন্দরামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকারই কথা। বাংলা ছন্দ এবং সুনীতিকুমারকে নিয়ে তাঁর আলোচনা রীতিমতো ভাবনা জাগায়। প্রবোধচন্দ্র সেনকে তিনি এ ব্যাপারে আমল দিতে চান নি। আবার সাঁওতালি ভাষা নিয়ে তাঁর আলোচনাও একান্তই প্রাসঙ্গিক। আসলে বইটিতে নতুনতর কিছু ভাবনাচিন্তার খোরাক রয়ে গেছে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ শে নভেম্বর ১৯৯৬)

-o-

মুক্ত ও স্বচ্ছদৃষ্টির আলাদা জগতের প্রবন্ধ

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শিক্ষাবিদ্ হিসাবে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের যতটা খ্যাতি, প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতি তার চেয়ে কিছু কম নয়। আসলে তাঁর শিক্ষক-সত্তা এবং প্রাবন্ধিক-সত্তা একাত্ম। শুধু শ্রেণীকক্ষেই নয়, তাঁর রচনাগুলির মধ্য দিয়েও তিনি আমাদের মত পাঠককে ভাবাতে চেয়েছেন, শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক দাস অবশ্য গতানুগতিক ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধ লেখেন না। তিনি মুক্তবুদ্ধির অধিকারী তো বটেই, তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কলম সমাজতাত্ত্বিকের। তাই মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনায় ধর্মীয় আবেগ বা অধ্যাত্মবাদকে তিনি গুরুত্ব দেন না, তার সমাজতাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিটিই তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়। তাই মাঝে মাঝে তিনি এমন মন্তব্য করেন যা আমাদের প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। প্রথম প্রবন্ধ 'রাজাপ্রজা পরিস্থিতি- প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের বাঙলায়' আমাদের মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তিনি দেখিয়েছেন, রাজা-প্রজার সম্পর্কে 'বিভ্রাট যা তা ঘটেছিল ইংরেজ কোম্পানীর শাসনে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নয়া জমিদার ও তস্য নায়েব- গোমস্তাদের অত্যাচারে'। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেও (কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ) গ্রন্থকার নতুন পথ ধরেই হাঁটেন। তিনি অনায়াসে সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে সুফি আউলিয়ারা ইউসুফ-জুলেখার যে প্রণয় কাহিনীর প্রচার করেছিল, তারই প্রভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। শ্রীচৈতন্যের আদ্বিজচণ্ডালে প্রেম ও নামধর্ম প্রচারের উৎসটি যে বেদ-বেদান্ত নয়, তা যে পূর্ববতী তিন-চারশো বছরের বাংলার বেদ-বিরোধী লোকায়ত ধারারই ঐতিহাসজ্ঞাত-অধ্যাপক দাসের এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক এবং এই জাতীয় সিদ্ধান্তই সমালোচকের মৌলিকতা প্রমাণ করে (দেবমানব শ্রীচৈতন্য)। ১৪ টি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি মধ্যযুগ নিয়ে। একটি বঙ্কিমের 'সীতারাম' উপন্যাস- সম্পর্কিত আলোচনা, দুটি কেবল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে দুটি, আর আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রবন্ধে। একটির বিষয় বিচিত্র। শহর কলকাতায় আরবি-ফারসি-উর্দু-সংস্কৃত। এটি নানা অজানা তথ্যে ঠাসা। রীতিমত কৌতূহল জাগায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রেও তিনি স্বতন্ত্র্য দেখান। আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, 'প্রণয়বৈচিত্র্য প্রদর্শনই বঙ্কিমের উপন্যাস নির্মাণের মৌল প্রেরণা, ইতিহাস ধর্মনীতি প্রভৃতি গৌণ (বঙ্কিম মনোধর্মের

পটভূমিতে সীতারাম)।' এভাবেই বঙ্কিমের শেষ পর্বের উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্ম প্রবর্তনের প্রচলিত ধারণাটিকে তিনি উড়িয়ে দেন। রবীন্দ্র-সমালোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথেরই সাহায্য নিয়ে নিজস্ব মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, 'তিনি বারংবার ডেকেছেন ঈশ্বরকে অথচ বারবার সাড়া দিয়েছে মানুষ।' এভাবে প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় সম্পাদক মানস মজুমদারের সঠিক মূল্যায়নে 'ক্ষুদিরাম দাসের প্রবল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি'।

(বাছাই প্রবন্ধ- ক্ষুদিরাম দাস, সম্পাদনা-মানস মজুমদার, পুস্তক বিপণি)

(২৭ এপ্রিল ২০০২, আজকাল)

প্রবীণ আচার্যর রচনায় আজও সেই হীরকদীপ্তি

শ্রী ক্ষুদিরাম দাস,

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শঙ্খ ঘোষ আপনার উজ্জ্বলতম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম জ্যোতিষ্ক। প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনি কীভাবে তাঁর লেখা উত্তরপত্র বিদীর্ণ করেছিলেন, মর্মঘাতী মন্তব্যে কণ্টকিত করেছিলেন তাঁর অহঙ্কৃত যৌবনস্পর্ধা; এবং পরবর্তী জীবনে নির্দ্বিধ জানিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর যাবতীয় মত এবং সিদ্ধান্তই (কার্যকরী বিষয়ে) আপনার মত ও সিদ্ধান্ত-এরকম বিবরণ পড়েছি শঙ্খ ঘোষেরই রচনায়। আজ আপনার সাম্প্রতিকতম 'বাছাই প্রবন্ধ' গ্রন্থটির পাঠ শেষ করে শঙ্খ ঘোষের সেই স্মৃতিময় নির্জন রচনাটি খুব মনে পড়ে। মনে পড়ে, এই অর্বাচীন লেখকও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদা আপনার কাছে, অবিকল শঙ্খ ঘোষের তৎকালীন মানসিকতায়, রবীন্দ্রপাঠ নিয়েছিল। দুটি সূত্র যুগপৎ স্মৃত হলে মনে হয়, কী বিষম সাফল্য ও ব্যর্থতা আপনার আজন্ম আচার্যকতায়। আপনার শিক্ষক-জীবনের প্রবহমানতায় এই দুটি বিপরীত দৃষ্টান্ত বইটির পাঠ আরও নিবিড়, আরও বিষাদজড়িত করে তোলে, বিশেষত যখন দেখি বইটি উৎসর্গ করেছেন আপনি আপনার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে। আপনার ছাত্র হিসাবে পরিচিত হওয়ার গৌরব শেষ পর্যন্ত হীনম্মন্যতায় পর্যবসিত হলেও, আজ, নতমস্তকে, আপনার এই বই-উপহার গ্রহণ করা যায় এই বিশ্বাসেই যে, এতবছর পর, এই বইয়ের মাধ্যমে, আপনার কাছে নতুন পাঠ নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আপনার এই বইটি সম্পর্কে কাগুজে আলোচনা লেখা, এই লেখকের পক্ষে, একরূপ ধৃষ্টতা। ২৭৬ পৃষ্ঠার একটি রত্নগর্ভ বই বিষয়ে সংবাদপত্রের পাঁচ-সাতশো বরাদ্দ শব্দ কোনও কাজেই লাগবে না আপনার। তথাকথিত প্রশংসা ও নিন্দা- উর্ধ্ব আপনি এই লেখা পড়েও দেখবেন না। কিন্তু, নিজস্ব তাড়নায় এই বই সম্পর্কে অন্যদের (বিশেষত, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আপনার কাছে পাঠের সুযোগ পাচ্ছে না) জানানোটা খুবই অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আপনি ক্লাশে পড়ানোর সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্য বিষয়ে অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করেছেন। সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখা, ভাষাতত্ত্ব

ব্যাকরণ, ছন্দ–অলঙ্কার,সাহিত্যশৈলী ছাড়া বিজ্ঞান হয়েছে আপনার স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কত-যে নতুন দিক উন্মোচন করেছেন আপনি। বস্তুত আপনার লেখনি বাংলা মননশীল প্রবন্ধের ধারাটিকেই করে তুলেছে দিগন্তবিস্তৃত। আপনার রচনারীতি একাডেমিক, কিন্তু নির্ভার। সাহিত্য-সমস্যা-বিষয়ক যাবতীয় সমাধানগুলি আপনি খুবই আত্মবিশ্বাস এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে করেন, কিন্তু সেখানে কোনও হাস্যকর উন্নাসিকতা নেই। মনে পড়ে ক্লাশে পাঠ দেওয়ায় আপনার একটি অননুকরণীয় তীব্র ভঙ্গি ছিল, 'চিত্রা' যখন পড়াতেন, তখন মনে হত আপনার কাছে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই অভিপ্রেত নয়। তখন, আমরা যারা লুকিয়ে প্রেম করি, জীবনানন্দ-শঙ্খ পড়ি, পদ্যও লিখি; তারা প্রায়শই জনান্তিকে বলেছি, কেআডি কবিতার ব্যবচ্ছেদ করেন, কবিতাই আসল, তত্ত্ব নয়। পরে বুঝেছি, নিহিত তত্ত্বটি জেনে গেলে কবিতার রস আরও গভীর হয়ে ওঠে। আজ বোঝা যায়, ওইসব ক্ষণজন্মা কয়েকজন অধ্যাপকের সেই অকাতর জলসিঞ্চন ছিল কতটা অমোঘ।

তো, আপনার সেই অননুকরণীয় ও ভ্রূপেক্ষহীন পাঠদানভঙ্গির সঙ্গে আপনার রচনারীতির খুবই সাযুজ্য রয়েছে। একটি বিষয়ের কত গভীরে পৌঁছলে ওই সাবলীল দৃপ্ততা অর্জন করা যায়, তা আপনার এই বই পড়ে ফের উপলব্ধি করলাম।

সাহিত্যকে আপনি কখনও সমাজ ও সময়-বিশ্লিষ্ট করে দেখেননি। একদিকে সাহিত্যতত্ত্ব, রস; অন্যদিকে সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আপনার সাহিত্য-বিচারকে অন্যতর তাৎপর্য দিয়েছে। এই বইয়ের চোদ্দোটি রচনায় আপনাকে দীর্ঘকাল পর সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করলাম।

প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগে বাংলায় রাজা-প্রজা পরিস্থিতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যদেব, রামপ্রসাদ, আরবি-ফারসি-উর্দু-সংস্কৃত, বঙ্কিমের সীতারাম, বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ, টামাস হার্ডি-যতীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি বহু-বিস্তৃত গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি আপনার বোধ ও মননের এক উজ্জ্বল উদ্ধার হিসাবে চিরকালীন হয়ে থাকবে। প্রতিটি রচনাই আপনার নিজস্বতার মাত্রাবিস্তারী।

বাংলা-মাস্টারদের সম্পর্কে যে- অনুযোগ চিরকাল উঠেছে এই বইও সেই অনুযোগের পরিপূরক যে, আপনারা মৃত কবিদের রক্তমাংসেই বড় বেশি

পরিতৃপ্ত। কী ক্ষতি হয়, স্যার যদি একজন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস একজন কবি শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন?

বাচালতা ক্ষমা করবেন।

প্রণাম নেবেন।

গৌতম ঘোষ দস্তিদার

(২৪ ডিসেম্বর ২০০০ রবিবারের প্রতিদিন, বাছাই প্রবন্ধ- ক্ষুদিরাম দাস, সম্পাদনা- মানস মজুমদার, পুস্তক বিপণি।)

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল ধারা

গৌতম নিয়োগী

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য যে দিন দিন বেড়েই চলেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বৈচিত্র্যে ও বৈদাগ্ধে বাংলা ভাষায়তনের মধ্যে যে নানা ধরনের রচনার কথামালা নিয়ত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তা বাঙালির মননশীল চর্চার নিদর্শন। সাহিত্যের পণ্ডিতেরা বলেন, বাংলা সাহিত্যের যেসব শাখা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেতে পারে তাহলে ছোটগল্প এবং লিরিক বা গীতি কবিতাকে বেছে নিতে হয়। হয়তো এ কথার যথার্থ এই যে বাংলায় উপন্যাস কিংবা নাটক তুলনামূলকভাবে দুর্বল ; তবে সেই সঙ্গে একথা তো স্বীকার না করে পারি না যে তুলনামূলকভাবে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা এখন যথেষ্ঠ বলীয়ান। তবে অতখানি উচ্চকণ্ঠ বলার মতো না হলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল এক ধারা যে বেড়ে চলেছে, আমরা তার কথা বলতে চাইছি। সম্প্রতি প্রকাশিত সুলিখিত গ্রন্থ পাঠ করে সেই বক্তব্যই আরও জোরদার হলো।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ) ডঃ ক্ষুদিরাম দাস লিখিত 'বাছাই প্রবন্ধ' গ্রন্থটি সম্পাদনা করে বের করেছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই বর্তমান আর এক যশস্বী অধ্যাপক মানস মজুমদার। এ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হয়নি এমন বেশ কিছু রচনা দুই মলাটের মধ্যে সংগ্রহ করে দেওয়া ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা মানস মজুমদারের কাছে ঋণী। তেমনি অল্পকথা 'সম্পাদকের নিবেদন' শীর্ষক লেখাতে তিনি গ্রন্থ পরিচয় তুলে তো ধরেছেনই, সেই সঙ্গে প্রাবন্ধিক ক্ষুদিরাম দাসের বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করেছেন।

'বাছাই প্রবন্ধ' বইখানি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে গ্রন্থকার সম্পর্কে কিছু পরিচয় 'কালান্তর' এর পাঠক পাঠিকাদের জন্য জানিয়ে রাখা দরকার। ক্ষুদিরাম দাসের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে ১৯১৬ এর ৯ অক্টোবর। সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়ে এম এ পাস করেন বাংলায়। সেখানেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (১৯৩৯)। সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ। 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' বিষয়ে গবেষণা করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট। স্কুল সাব ইন্সপেক্টার হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করে অধ্যাপনায় আসেন এবং স্কটিশচার্চ, কলকাতা উইমেন্স, প্রেসিডেন্সি, কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, মৌলানা আজাদ, হুগলী মহসিন ইত্যাদি কলেজে পড়িয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু

লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন (১৯৮১)। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়', 'বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি', 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, 'সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' ইত্যাদি স্মরণযোগ্য।

স্বচ্ছদৃষ্টি ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী ডঃ দাসের নানা ব্যাপারেই প্রবল অনুসন্ধিৎসা এবং লেখায় তার প্রতিফলনও আমরা লক্ষ্য করি। বর্তমান গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে চৌদ্দটি প্রবন্ধ। প্রথম রচনাটি 'রাজা-প্রজা পরিস্থিতি-প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের বাংলায়' পড়তে পড়তেই আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠি । তথ্য ও যুক্তির প্রকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ এই প্রবন্ধে আমার যেটি বিশেষ ভাল লেগেছে, তা হলো লেখকের স্বচ্ছ ইতিহাসবোধ। নানা আকর উপাদানের সাহায্যে প্রজাদের বিশেষত নিম্নবর্গীয় কৃষকসমাজের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক আলোচনা করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটও বিচার করেছেন। আরও যা ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে বিশেষভাবে বলার মতন তা হলো লেখকের মন সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ও বিজ্ঞান ধর্মী। মধ্যযুগের বাংলায় সুলতানি বা মোগলযুগে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের আমলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজারা সর্বদা নির্যাতনের শিকার-এমত ধারণা যে ইতিহাসসম্মত নয়, তা তিনি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি কোম্পানির আমলেই রায়তদের প্রকৃত দুর্ভোগের সূচনা তাও বলেছেন।

প্রয়োজনে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যে লেখক পিছপা নন, তা দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ' রচনাটি স্পষ্ট। এত সুন্দর রচনা কমই পড়েছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্পর্কে লেখক যে নতুন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তা ভেবে দেখার মতন। বড়ু শব্দের অর্থ অবৈধ প্রণয়ী। চণ্ডীদাসকে 'বড়ু' অভিধা দেওয়ার পিছনেও রামী রজকিনীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক। চণ্ডীদাস বাংলায় রাধাকৃষ্ণলীলার আদি কবি কিন্তু সম্ভবত ইউসুফ জোলেখার প্রণয় কাহিনীর ইঙ্গিত আশ্রয়েই কাব্যটি রচিত। লেখকের ভাষায় 'কবি আশ্চর্য অভিনিবেশ সহকারে সেকালকার নরনারীর জীবনচর্চা, প্রণয়রীতি এবং দ্বান্দ্বিক বাকৃ পদ্ধতি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেগুলির গ্রন্থণে নিজ কল্পনাকেও নিয়োগ করেছিলেন যার ফলে কাব্যটি দীর্ঘ হলেও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে' (পৃ-৬৮)। কাব্যটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অপবাদ যা বিমানবিহারী মজুমদারের মতন লেখকরা করেছেন, তা যুক্তিসহ উড়িয়ে দিয়েছেন ক্ষুদিরাম দাস। আমরা কৃতজ্ঞ।

'মহাপ্রভুর বাউল-ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রীতি সঙ্গতি' প্রবন্ধে চৈতন্যের মানবিকতাবোধ ও সাম্যাদর্শ বিশ্লেষণও মনোগ্রাহী। আবার 'দেব মানব শ্রীচৈতন্য' রচনায় চৈতন্যের ব্যক্তি জীবন ও ভাব জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। 'শ্যামাসঙ্গীত ও রামপ্রসাদ' রচনাটিতেও নতুন কথা বলার চেষ্টা আছে। 'শহর কোলকাতায় আরবী-ফারসী- উর্দু-সংস্কৃত' রচনায় প্রাবন্ধিকের পাণ্ডিত্যের নিদর্শন লক্ষণীয়, যদিও পাণ্ডিত্যের অহমিকা নেই।

এইভাবে 'বঙ্কিম মনোধর্মের পটভূমিতে সীতারাম', 'রবীন্দ্র-বঙ্কিম সম্পর্ক' এবং অথ বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র কথা' পাঠক-পাঠিকাদের কৌতুহলে আবিষ্ট করে রাখে। 'রবীন্দ্র পরিচায়িকা' রচনায় দশক পরম্পরায় রবীন্দ্র সাহিত্যের সমীক্ষা করেছেন। ' রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের রচনা। এ বিষয়ে তিনিই প্রথম লেখেন পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যায়। উত্তরকালে সুখময় ভট্টাচার্য সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ বইতে আমরা আরও তৃপ্ত হই।

শেষ তিনটি রচনার বিষয় ভিন্নধর্মী। 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তঃ কবিকৃতি' ছন্দের যাদুকরের নানা দিক আলোচনা করেছেন। 'কবি টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' উভয় কবির মনোধর্মে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। আবার 'কথাকার মানিকের ইতিকার' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব বৈশিষ্টগুলি অল্পকথায় চিহ্নিত করেছেন। সবমিলে সুরতিত গদ্য শৈলীতে যুক্তিগ্রাহ্য এক প্রাবন্ধিক হাজির হন আমাদের সামনে। তাঁকে বরণ করি। (২ এপ্রিল ২০০১, কালান্তর)

-০-

প্রথাসিদ্ধ সুপণ্ডিত এবং বহুদর্শী ভাবুকের দুই ধারা

সোহিনী ঘোষ

দুটি চমৎকার বই পড়া গেল। দুটিই প্রবন্ধের। দুই লেখকই স্বনামধন্য। এক জন প্রাবন্ধিক-শিক্ষক হিসাবে, অন্য জন বাংলা ছোট গল্পের অসামান্য রূপকার হিসাবে। এক জন আদান্ত অ্যাকাডেমিক, প্রথাগত শিক্ষা-ব্যবস্থায় উচ্চকোটিতে অবস্থিত-অন্য জন দারিদ্র্যের কারণেই মূলত হাজারিবাগের সেণ্ট কলম্বাস কলেজের পাঠ শিকেয় তুলে জীবনধারণের তাড়নায় বিবিধ পেশায় নিযুক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রথম জন ক্ষুদিরাম দাস, দ্বিতীয় জন সুবোধ ঘোষ। ক্ষুদিরাম দাসের বইটির নাম বাছাই প্রবন্ধ, সম্পাদক–তাঁরই ছাত্র মানস মজুমদার; সুবোধ ঘোষের বইটি প্রবন্ধাবলী, সম্পাদক- নিতাই বসু। উভয়েই সুযোগ্য সম্পাদক। তাঁদের বিশ্লেষণী মননঋদ্ধ ভূমিকা পাঠককে তৃপ্ত করে।

বাছাই প্রবন্ধ-এ সংকলিত প্রথম রচনাটি দীর্ঘ, সুবিন্যস্ত একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। 'রাজা -প্রজা-পরিস্থিতি-প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের বাংলায়' প্রবন্ধটি পাঠককে বিস্মিত করে। যে ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে বেদ থেকে নাথ সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত সাহিত্যের সহায়তায় রাজা-প্রজার সম্পর্ক নিরূপণের দুঃসাধ্যকর্ম লেখক সম্পাদন করেছেন তা কৌতুহলোদ্দীপক। 'কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ' প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ইউসুফ-জুলেখার প্রণয়কাহিনীর প্রভাব আলোচনা করে এক নতুন চিন্তার উদ্বোধন করেছেন। এই ধরনের মন্তব্য ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়- বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে চিরাচরিত বহুমান্য ধারণাকে তিনি নস্যাৎ করেছেন। যুক্তি বিস্তারে বুঝিয়েছেন শুদ্ধতাবাদীরা যাকে অশ্লীল বলে অভিহিত করে থাকেন, তা প্রকৃতপক্ষে আবরণহীন স্বাভাবিক বাকরীতি। সম্ভোগশৃঙ্গারের বর্ণনায় আবরণ থাকা আর না থাকার ফলে কাব্যভাষার প্রভেদ তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। 'মহাপ্রভুর বাউল ব্যক্তিত্ব ও নামপ্রীতি সংগতি' ও 'দেবমানব শ্রীচৈতন্য' প্রবন্ধ দুটিতে চৈতন্যের ব্যক্তিজীবন ও ভাবজীবনের চিত্রই মুখ্যত পরিস্ফুট। প্রথমটিতে এরই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে তাঁর বাউল ব্যক্তিত্ব।

'বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক', 'রবীন্দ্র পরিচায়িকা', 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য', 'অথ বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র কথা'- প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু

না কিছু নতুন ভাবনার প্রকাশ হয়েছে। ক্ষুদিরাম দাসের রচনাশৈলী অসাধারণ। এই হিসাবে সংকলিত সমস্ত রচনাই সুখপাঠ্য। তবে এই সংকলনগ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের থেকে সাহিত্যের ছাত্ররাই উপভোগ করবেন বেশি।

(শনিবার ১২ মে ২০০১, আনন্দবাজার পত্রিকা)

--o-

তৃতীয় অধ্যায়

চলিষ্ণুতার উদ্দীপক বই

অপূর্ব কর

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস আশি বছরের জীবন পরিক্রমা সম্প্রতি সমাপ্ত করেছেন। আর সেই উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে সমকালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে অভিনব এই গ্রন্থে। প্রায় চুয়ান্ন, পঞ্চাশ বছরের শিক্ষকতা –অধ্যাপনার জীবন। আর সে জীবন এমন অনিন্দ্য ভাস্বরতায় মোড়া, সারস্বত সাধনায় অনন্য, পূর্ণ কবি চসার সম্পর্কে ড্রাইডেনের মূল্যায়ন বাণীর যেন মনে আসে," It is sufficient to say, according to the proverb, that here is god's plenty" ক্ষুদিরামবাবু সম্পর্কে হাজার শংসাবাণী এ দেশে এখন বাঙ্ময়। তার কিছু আহৃত হয়েছে 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াসে।

প্রয়াসে মহত্তম একটি কর্তব্য পালন সম্পাদিত হয়েছে। কারণ প্রোজ্জ্বল বাঙালী মানসে বা রবীন্দ্র অনুধ্যানকারীদের কাছে ক্ষুদিরামবাবু আরো এক মহিমান্বিত আসনের অধিকারী। ১৯৫৩-য় বেরিয়ে ছিল ক্ষুদিরামবাবুর প্রথম বই –' রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়'। রবীন্দ্র প্রয়াণের পরে পরে বাঙালীর অন্তরের ধন বা বিশ্ব মনীষার অমূল্য সম্পদকে শ্রদ্ধাপ্লুত মুল্যায়ন-নিরীক্ষায় করে তোলা হচ্ছিল অপ্রাকৃত বা অলৌকিক দুরধিগম্য, দূরতীত নভোলোকের মহা জ্যোতিষ্ক, কিংবা রবীন্দ্র চিন্তা চেতনার পরিমাপে আরোপিত হচ্ছিল দারুণ ভ্রান্তি, ক্ষুদিরামবাবু অনন্য বিশ্লেষণে কবিকে দিয়েছিলেন যথার্থ ও প্রকৃত আসন। তিনি বলা যায়, রবীন্দ্রনাথকে ভ্রান্ত চেনার জগদ্দল ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, তাঁর অনুধ্যানে বেঁধে ছিলেন প্রকৃত পথ চলার গ্রন্থি। অধ্যাপনা জীবনে সহস্র কথকতার পাশাপাশি তিনি আত্মলীন জিজ্ঞাসা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছেন নিয়ত। ১৯৬৬-তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী', ১৯৭৮-য়ে 'সমাজ-প্রগতি-রবীন্দ্রনাথ,' ১৯৮৩ তে 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার', ১৯৯৪-য়ে '১৪০০ সাল ও চলমান রবি' প্রভৃতি রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থ, যাতে রবীন্দ্র পরিচিতি দানে তিনি নব স্রষ্টা। তিনি আরো অনেক আকর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আশি পেরিয়েও বর্তমানে নিমগ্ন সাঁওতালী বাঙলা 'শব্দ সাম্য (অভিধান) ও A Linguistic Dictionary of Bengali words রচনায়। অশীতিপর বয়সে তাঁর মনন ও লেখনী সচলতা মনে করিয়ে দেয় কেন জানি চৈতন্য চরিতামৃত স্রষ্টা কৃষ্ণ দাস

কবিরাজের কথা। মনন, পাণ্ডিত্য তাঁর এখনো মাণিক্য ছড়ানো, যাবতীয় কাঠিন্য সহজাতদায়ী।

'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' গ্রন্থ তাঁর জীবন ও কৃতি পরিচিতির অনন্য উন্মোচক হয়েছে। গ্রন্থটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ক্ষুদিরাম বাবু সম্বন্ধে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, সদ্য প্রয়াত রবীন্দ্র গুপ্ত, অরুণ কুমার বসু, সুধীর চক্রবর্তী, শিশির কুমার দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রকাশ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতির্ময় ঘোষ, মানস মজুমদার, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ, প্রতিটি লেখা ক্ষুদিরাম বাবুকে নিয়ে বিশিষ্ট মননের দলিল চিত্র। এই প্রথম ভাগেই (বোধ করি, এটির স্বতন্ত্র বিভাজন হওয়া উচিত ছিল) ক্ষুদিরাম বাবুর তিনটি লেখা, রয়েছে যা তাঁর উজ্জ্বল শিক্ষা চিন্তার মহামূল্যবান স্মারক।

দ্বিতীয় বিভাগে ক্ষুদিরাম বাবুর আত্মস্মৃতি চারণের ছটি লেখা আছে। তাঁর মানবিক সংগ্রাম মুখর জীবন কথা ও তাঁর ধ্রুব বিশ্বাসের জগত এ সব লেখায় বড়ো মরমীভাবে উদ্‌ঘাটিত। তাঁর অমল ঋজু বিশ্বাস ইতিহাসের গতিপথ ধারায় কিভাবে ন্যস্ত, কেন ন্যস্ত তার সন্ধান দেয়। 'বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি পরিষদের সম্বর্ধনা প্রদানের উত্তরে তাঁর ভাষণটিতে ও 'শিক্ষার সংস্কারের উদযোগে শ্রেণী স্বার্থের উগ্রমুর্তি' নিবন্ধটিতে। এখানে তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও গাঢ় প্রত্যয় উন্মোচিত। বইয়ে তাঁর অনবদ্য লেখা 'পূজো পার্বনের একটি স্মৃতিচিত্র', তাঁর আশ্চর্য মনোলোক এখানে উদ্ভাসিত। সেই সূত্রে তাঁর কলম-যে কত সংবেদনশীল, গভীরতা তা বড়ো স্পষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ক্ষুদিরামবাবুর রচিত মধ্য জীবন কালের কয়েকটি কবিতা আছে, তাঁর আন্তর সরসত্যকে যা স্পষ্ট করে। দ্বিতীয় বিভাগে নমিতা মণ্ডল, ভারতী দাস বাগচীর লেখা বিশেষ অন্তরঙ্গতায় মোড়া। গ্রন্থটিতে ক্ষুদিরামবাবুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে, নিয়েছেন আব্দুসসাত্তার, শঙ্খ ঘোষ, শ্যামলী বসু প্রমুখ। শঙ্খ ঘোষের সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্সি কলেজের পটভূমিতে তাঁর ছাত্রদরদী ও শিক্ষানায়কের রূপটি দ্যুতিময় ও স্বচ্ছ। দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য অনবদ্য লেখা সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের, লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ভূপেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন লাহা, অমরেন্দ্র গণাই প্রমুখ ব্যক্তি।

তাঁর জীবন বৃত্তান্ত পড়ে রোমাঞ্চিত হতে হয়, তাঁর পথ চলা উদবুদ্ধ করে, আর তাঁর উন্মুক্ত সৃষ্টিশীলতা ও বহুধা কীর্তি দেখে শ্রদ্ধা জাগে, 'পথের ছায়া

ছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' গ্রন্থের সার্থকতা এখানেই। এক লহমায় পড়ে ফেলার এ বই সমকালীন এক সমুজ্জ্বল জীবনের দ্যুতিময়তার মহোজ্জ্বল আবেশে মনকে ভরিয়ে তোলে, হৃদয়ে ছড়ায় সেই সঙ্গে অপূর্ব স্নিগ্ধতা। গ্রন্থটিতে আগেই বলেছি আরো অনেক লেখা নেওয়া যেত। তাঁর গুণমুগ্ধের তালিকা বিরাট, সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁর জীবনের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বুঝি বাদ থেকে গেছে। যাই হোক, এই অভিনব গ্রন্থের সূচনার পরিকল্পনা সবিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থের কয়েকটি সাংঘাতিক বানান ভূল প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে চরম শৈথিল্য প্রমাণ করে। রচনাক্রম সাজানোয়, অবিন্যাস সংশোধনীয়। সূচী ক্রমে আবিরলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম বাদ গেছে। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে ক্ষুদিরামবাবুর প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের কয়েকটি সমালোচনা যাতে অধুনা লুপ্ত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক, অ্যানন্দবাজারের ১৩৮১র লেখা, রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার, নারায়ণ চৌধুরীর মূল্যবান অভিমত।

বইটি সমগ্র বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে পরম আদরণীয় বই হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে করি। তালগোল পাকানো দিনে আক্রান্ত সময়কালে বাঙালী মানস যে কি আশ্চর্য নয়নাভিরাম প্রত্যয়ী হাঁটা হাঁটতে পারে, তার অনাবিল একাত্মতার অনুভব এখানে প্রতিটি বর্ণমালায় উজ্জ্বল। পরোক্ষে এ বই একালের শিক্ষানুরাগী বাঙালীর আত্ম আবিষ্কারের দলিল বলেই গণ্য হবে। পথ চলার আনন্দে টানেন অন্যকেও। এ বই বড়ো চলিষ্ণুতা জাগানো। বইটির সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রকাশ চক্রবর্তী।

(যুগান্তর শুক্রবার ১০ফাল্গুন ১৪০২, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬)

শুধু মনীষার ঔজ্জ্বল্য নয়, ধরা পড়ে অতীত চিত্রও

নির্মলেন্দু ভৌমিক

গবেষণার ও ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ়তায় কোনো কোনো অধ্যাপক একদিন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এমনই একজন মানুষ। সম্প্রতি তাঁর আশি বৎসর পূর্তি-উৎসব হয়ে গেল। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই উৎসবেরই একটি অঙ্গ । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মানস মজুমদার, অধ্যাপক দাসেরই সুযোগ্য ছাত্র, এই সঙ্কলনটি সম্পাদনা করেছেন। এই সঙ্কলনে মোট তিন ধরনের রচনা আছে। অধ্যাপক দাসের প্রত্যক্ষ ছাত্র-ছাত্রীগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি, দ্বিতীয়ত তাঁর বন্ধু সহকর্মীদের দ্বারা তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন এবং তৃতীয়ত, অধ্যাপক দাসেরই নিজ রচনা। এই তিন দিক থেকে রচনাটি প্রকাশিত হওয়ায় অধ্যাপক দাসকে খুব ভালভাবে চিনে নেওয়া যায়।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস (জন্ম ৯ অক্টোবর, ১৯১৬, ২৩ আশ্বিন ১৩২৩। বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া) যে যুগের মানুষ, সেই যুগের শিক্ষকগণ একটি বিশিষ্ট আদর্শ ও মূল্যবোধদ্বারা চালিত হতেন, বস্তুত সেটাই তাঁদের মূল মূলধন ছিল। অধ্যাপক দাসের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের মূলদিক সেই দিকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তীক্ষ্ণ দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেও তাঁর সঙ্গীতপ্রবণতা সজাগ থাকে, গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিজেকে তিনি সহজেই মেলে দিতে পারেন। মূলত সংস্কৃতের ছাত্র,-সেটাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক প্রসারিত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় ইংরেজি সাহিত্য তাঁকে দিয়েছে নবতর মাত্রা বোধ। তাঁর যাঁরা প্রত্যক্ষ ছাত্র (যথা শ্রী শঙ্খ ঘোষ, শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রী শিশির কুমার দাশ) শিক্ষক হিসাবে, মানুষ হিসাবে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন। প্রত্যক্ষ ছাত্র হিসাবে ডঃ শ্রী মানস মজুমদার ‘প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সেই অন্তরঙ্গ মানুষটি’- অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসকে আবিষ্কার করেছেন। কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের প্রতিবেদন থেকে যেমন জানা গিয়েছে ‘ররীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়’ গ্রন্থটির শ্রুতিলিখনকর্ম তিনিই করেছিলেন, তেমনি শ্রীমানস মজুমদারের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা গেল, শ্রীচৈতন্য দেবের প্রেমধর্মের ওপর অধ্যাপক দাসই প্রথম সুফি প্রভাব লক্ষ্য করেন, কিংবা, তিনি ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী এই খবর। অবশ্য গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের ওপর সুফি প্রভাব সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন গুরু-শিষ্যের বিতর্ক একদা হয়ে গেছে।

তাঁর বন্ধু-সহকর্মীদের মধ্যে আছেন শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী, শ্রী ভবতোষ দত্ত। এই লেখাগুলির মধ্যে একমাত্র ভবতোষ দত্ত ছাড়া সকলেই অধ্যাপক দাসের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত আনন্দময় যোগসূত্রর উল্লেখ করেছেন, রচনাগুলিও আকারে ক্ষুদ্র। শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত মশাইয়ের লেখা 'অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' দস্তুমাফিক একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে খুব অ্যাকাদেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যাপক দাসের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে। এইরকম আর একটি নিবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক দাসের প্রত্যক্ষ ছাত্র ডঃ অরুণ কুমার বসু, 'রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মেষকার'।

তৃতীয় ধারায় আছে স্বয়ং অধ্যাপক দাসের রচনাবলীঃ 'সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে অধ্যাপক দাসের মতামত', সাঁও-বাংলা অভিধান বিষয়ক প্রস্তবনা' 'সশ্রদ্ধং প্রতিবচনম্'। শেষাক্তিটির তাঁর নিজের বাল্যস্মৃতির চিত্রণ, প্রথমটি তেমনি সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা। দ্বিতীয়টিই সবার্ধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার ওপর সাঁওতালি প্রভাব সম্পর্ক ভাষাচার্য সুনীতিকুমার একদা যে দ্রুত বিক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে ক্ষান্ত ছিলেন, এ কর্মে আর অগ্রসর হতে পারেননি, কয়েক দশক পরে সুনীতিকুমারের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে অধ্যাপক দাস শিক্ষকের সেই আরব্ধ কর্ম যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করে ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নবকীর্তি রচনা করেছেন। বাংলা ভাষার ওপর সাঁওতালি ভাষা সংস্কৃতির প্রভাব প্রকৃতি সম্পর্কে অধ্যাপক দাস যে যে মন্তব্য করেছেন, হয়তো সকলেই সে বিষয়ে একমত হতে পারবেন না। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'তেও এ বিষয়ে অধ্যাপক দাস একটি নিবন্ধ লিখেছেন, যদিও তা অসম্পুর্ণ ছিল। আলোচ্য সঙ্কলনে সেই নিবন্ধটির প্রকাশ কাম্য ছিল। যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও মন দিয়ে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন। কিংবা বৈষ্ণব রচনাশাস্ত্রের, সেই একই মানস তাঁর ভাষা বিজ্ঞান ও অভিধান চর্চার ক্ষেত্রও কার্যকরী হয়েছে। এই দুই দিক থেকে দেখলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক দাস গান গাইতে পারেন, রচনা করতেও পারেন। অনেকেই তাঁর মধ্যে একজন শিশুকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কৈশোরে লেখা কয়েকটি কবিতার সংকলন এতে আছে। 'বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন সূত্রে বক্তব্য' 'যখন স্কুলে পড়তাম' গ্রাম-পরিবেশ ও সমাজ' 'ফেলে আসা সেই দিনগুলি' প্রভৃতি রচনাও মূলত তাঁর

আত্মজীবনীমূলক রচনা। এছাড়া আছে তাঁর শিক্ষক, সুনীতিকুমার এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর আত্মজা শ্রীমতী ভারতী দাস (বাগচী) লিখিত রচনা হল- 'আত্মজার চোখে ক্ষুদিরাম'। তাঁর তিন কন্যা এই গ্রন্থের প্রকাশক।

সম্পাদক ডঃ মানস মজুমদারের বিন্যাস লক্ষ্যণীয়। গ্রন্থের শুরুতেই 'মুখ্য ঘটনাপঞ্জী' 'পুরস্কার প্রাপ্তি', 'কর্মসূত্রে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ', এবং রচিত গ্রন্থের তালিকা উপস্থিত করে অধ্যাপক দাশের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রচ্ছদে আছে অধ্যাপক দাশেরই একটি স্কেচ (প্রকাশ চক্রবর্তীকৃত)। পরিশেষে আছে- ' ডঃ দাস লিখিত কয়েকটি পুস্তকের সমালোচনা'। অথাৎ গ্রন্থটির মাধ্যমে কেবল একজন আদর্শবাদী অধ্যাপকের জীবন ও ব্যক্তিত্বই ধরা পড়েনি, সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে একটি যুগেরও অতীত কথা। সেখানেই এ বই ব্যক্তিগত সীমা লঙঘন করে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক জগতের একটি প্রসঙ্গিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। সম্পাদক ডঃ মানস মজুমদার। মল্লিক ব্রাদার্স।

(প্রতিদিন ১৩ শ্রাবণ সোমবার ১৪০৩।। ২৯ জুলাই ১৯৯৬)

বিদগ্ধ অধ্যাপকের অন্তরঙ্গ চিত্র

রামেশ্বর শ

ডঃ মানস মজুমদার সম্পাদিত 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' গ্রন্থখানি সমালোচনার জন্য হাতে পেয়ে একই সঙ্গে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলাম। বিস্মিত হলাম এই জন্যে যে, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বৈদগ্ধ্য ও ব্যক্তিত্বের যে এতো দিক আছে তা আগে জানতাম না। তাঁকে শুধু দূর থেকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছি, কাছ থেকে জানার সুযোগ পাইনি। আর বিমুগ্ধ হয়েছি এই জন্যে যে তাঁর বৈদগ্ধ্য ও ব্যক্তিত্বের নানা রশ্মি বিচ্ছুরণের বিশ্বাসযোগ্য এবং অন্তরঙ্গ চিত্র যাঁরা এখানে এঁকেছেন তাঁরা অধিকাংশেই তাঁর কাছের মানুষ বা কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন- কেউ তাঁর নিকট ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কেউ স্নেহধন্য ছাত্র, কেউ গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক, কেউ অন্যভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিত- এবং প্রত্যেকেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র স্বনামধন্য ব্যক্তি। এতো বিশিষ্ট ব্যক্তির কলমে আঁকা এতগুলি অন্তরঙ্গ চিত্র একত্র গ্রথিত করে সর্বজনলভ্য করে তোলার জন্যে সম্পাদকে সাধুবাদ জানাই। মনীষী সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় যাঁকে "রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ..., ভাষাতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত..... অনলস –অক্লান্ত সাহিত্যসাধক " রূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন বর্তমান গ্রন্থখানি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় নয়, গ্রন্থখানি আর একটি কারণে মূল্যবান –এটি একটি যুগের বাংলার সারস্বত চিত্র, এবং এটি তারই সঙ্গে অনেক প্রাসঙ্গিক সারস্বত তথ্যে সমৃদ্ধ। একটি উদাহরণ দিইঃ অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মনন্-চিন্তমের গভীরতা উদ্‌ঘাটন করে বলেছেন- " ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ... চিন্তার ক্ষেত্রে যে হাল-চালনা করেছেন তার বড় বড় দৃষ্টান্ত আছে। লিখেছেন অনেক, চিন্তা করেছেন তার চেয়েও বেশি।" যে যুগে আমরা অনেকেই কোন বিষয়ে চিন্তা না করেই লিখে ফেলছি বা যতটা চিন্তা করছি তার চেয়ে বেশি লিখছি, যতটা লিখছি তার চেয়ে বেশি ঘোষণা করছি, সে যুগে অধ্যাপক দাস সম্পর্কে এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। 'বাংলা ভাষার মূলে নিষাদ কিরাত' –এর ভিত্তি(substration) বিষয়ে অধ্যাপক দাস যে মৌখিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং করছেন সে বিষয়ে প্রথানুগত ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিতর্ক তুলতে পারেন, কিন্তু তাঁর মনন-চিন্তনের যে মূল ম্যাথু আনন্দ কথিত যে high seriousness –এর ইঙ্গিত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন সেটা তর্ক। তাঁর রবীন্দ্র-মুল্যায়নের প্রসঙ্গে যে অতিরিক্ত তথ্য অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন ইংলন্ডের টেগোর সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'Rabindranath Tagore and the

British Press' নামক সঙ্কলন-গ্রন্থ সম্পর্কে তা আমাদের রবীন্দ্র-গবেষণাকে সমৃদ্ধ করবে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত "ক্ষুদিরাম বাবুর বাংলা জ্ঞানের গভীরতা'র কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন- "সংস্কৃত সমালোচনা- পদ্ধতির পরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে কখনোই হয়নি। .... অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মৌলিকত্ব এখানে। তিনি প্রথম প্রয়োগ করে দেখালেন যে অলঙ্কারিক পদ্ধতি আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় (বিশেষ করে চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণীতে)"। অধ্যাপক শক্রীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, শিশিরকুমার দাশ, অরুণ বসু, জ্যোতির্ময় ঘোষ, মানস মজুমদার, রবীন্দ্র গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন লাহা, সুধাকর চট্রোপাধ্যায়, অধ্যাপক দাসের মনীষা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন বা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে লিখেছেন-সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে অধ্যাপক দাসের কিছু স্বরচিত লেখাও সঙ্কলিত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে বইটি অধ্যাপক দাসের মনীষা ও তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ নির্ভরযোগ্য ভাষ্য এবং সেই যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস, এই জন্যে বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

(গণশক্তি ১৮ই ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ১৯৯৬)

এক বিশ্রুত অধ্যাপক

পুলিন দাস

পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্কুদিরাম দাস বইটি সারস্বতসমাজে বিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিত অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। এর একটা অংশ অধ্যাপকের নিজের কিছু লেখার পুনর্মুদ্রণ আর অপর অংশ তাঁর শিক্ষাগুরু, পরিজন, ছাত্র, সহকর্মী প্রমুখের রচনা সঙ্কলন। স্বরচিত লেখাগুলির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঋজুবাক এই অধ্যাপকের বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ অভিমত। প্রাচীন শাস্ত্রের রক্ষণশীল স্বভাব জেনেও মনে হয়েছে তাঁর 'সংস্কৃতকে কোনো না কোনো অধ্যায়ে আমাদের শিক্ষাসংলগ্ন করে রাখতেই হবে।' কারণ,'সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন আয়ুর্বেদ জ্যোতিষের স্বাদ ও জ্ঞান আমাদের চাই-ই।' ইংরেজি পুনঃপ্রচলনের প্রস্তাবের পাশাপাশি এ সব কথাও আজ ভেবে দেখা জরুরি। 'যখন স্কুলে পড়তাম' 'ফেলে আসা সেই দিন দিনগুলি' 'পূজা পার্বণের একটি স্মৃতিচিত্র' লেখাগুলোতে দেখা মেলে ব্যক্তি ক্ষুদিরাম দাসের ছায়া ও ছবি। তেমনি আবার 'সুনীতিকুমার স্মৃতিকথা' 'স্মৃতিচারণায় রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র' গুরুশিষ্য সংবাদমূলক রচনাদ্বয়ে ধরা আছে ছাত্র ক্ষুদিরাম দাসের আর এক মূর্তি। ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন তাঁর শিক্ষকদের সম্বন্ধে। অন্যদিকে তাঁর ছাত্রকুল লিখেছেন তাঁদের অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস সম্পর্কে। ফলে তিন পুরুষের মানসসংহতি ঘটে গেছে বইটির দুই মলাটের মাঝখানে। অধ্যাপক দাসের পাণ্ডিত্য, তাঁর গবেষণাকর্ম নিয়ে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁর সহকর্মী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত। সাক্ষাৎকারমূলক লেখায় অনেক বিষয়েই অধ্যাপকের বেশ খোলামেলা মন্তব্য শোনা গেছে। পণ্ডিত্যের অন্তরালবর্তী কবি চিত্তের ফল্গুপ্রবাহ ধরা পড়েছে তাঁর কৈশোরক কবিতার সঙ্কলনে। মূল্যবান সংযোজন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা সংক্ষিপ্ত অথচ ইঙ্গিতময় চিঠি। অধ্যাপক দাসের অন্যায়ভাবে অকারণ বিরুদ্ধতার শিকার হয়ে পড়ার যে নেপথ্যকাহিনী শুনিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী, এই পত্র মনে হয় তারই ইঙ্গিতবহ।

দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বেড়ে ওঠা, গাছে চড়া, সাঁতারকাটা, সাইকেল, নৌকা, ঘোড়ায় চাপা, তাস-আড্ডপ্রিয় মানুষটি আবার বিদ্যায়, গবেষণায় পাণ্ডিত্যে উজ্জল, বহুবর্ণময়। বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি আর গ্রাম্য

সরলতার মাধুর্য এ দু'য়ের রসায়নে সৃষ্ট ব্যক্তির স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। গ্রন্থভুক্ত প্রায় প্রতিটি রচনাই মূল্যবান। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স ক্লাসে অধাপক দাসের কাছে পাঠগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল একদা। সঙ্কলন গ্রন্থে লেখার সুযোগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারাটা ব্যক্তিগত সন্তোষের কারণ হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর উদ্দেশে সঙ্কলিত গ্রন্থের পরিচিতি লেখাটাই বা কম কীসে।

(আজকাল পত্রিকা, ২৫ জুলাই ১৯৯৮)

মননশীল গবেষককে শ্রদ্ধার্ঘ্য

পবিত্রকুমার সরকার

সমালোচকের দৃষ্টি হওয়া উচিত নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক। তবে কোনও লেখক বা সাহিত্য গবেষককে চেনা-জানার সুযোগ থাকলে তাঁর কাজের ধারা ও ব্যক্তিত্বের পরিসরটিকে সহজে বুঝে নেওয়া যায়। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্গে আমার তিন দশকের ওপর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আমি মানুষটিকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' যে জাতীয় গ্রন্থ তাতে সেটির আলোচনায় এই ব্যক্তি সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ষাটের দশকের প্রায় শেষাশেষি মওলানা আজাদ কলেজে এক ঝাঁক উজ্জ্বল অধ্যাপক যুক্ত ছিলেন। মধ্য কলকাতায় কোলাহলের মধ্যেও একটা শান্ত পরিবেশে পড়াশুনা হত তখন এই কলেজে। ছাত্র ও শিক্ষকদের দিকটা ছিল উল্লেখ করার মত। সে সময় এ কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন খ্যাতকীর্তি কবি বিষ্ণু দে, অর্থনীতির প্রধান ছিলেন ধীরেশ ভট্টাচার্য, একই বিভাগে অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সহ উপাচার্য (শিক্ষা) প্রবুদ্ধনাথ রায়। ইতিহাস, দর্শন, উর্দু, পদার্থবিদ্যা, গণিত সহ বিভিন্ন বিভাগেও নামী অধ্যাপকরা ছিলেন। অল্প সময়ের এই সময়ে আমরা কলেজে ভর্তি হয়েই শুনলাম বাংলা বিভাগের প্রধান ক্ষুদিরাম দাস 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা সাহিত্যে ডি লিট পেয়েছেন। অবশ্য এর আগে রবীন্দ্রনাথ ও গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি-লিট পেয়েছেন। কিন্তু কোনও লিখিত গ্রন্থের জন্য অধ্যাপক দাসই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রথম ডি-লিট। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৩ সাল নাগাদ নগণ্য এক ছাত্র হিসাবে অধ্যাপক দাসের সান্নিধ্যে আসি। তিনি বেশ কড়া ধাঁচের অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রখর পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধ বিচারবোধ ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর এই আপাত কাঠিন্যের খোলস সরিয়ে আমার মত বহু ছাত্রই তাঁর স্নেহ-বৃত্তে স্থান করে নিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থে 'স্যরে'র প্রিয় ছাত্র শঙ্খ ঘোষ ও আরও অনেকে এ বিষয়েই জোর দিয়েছেন।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রথমেই বলে রাখি, আমি অধ্যাপক দাসের লেখা সব কটি গ্রন্থ পড়ে ওঠার সুযোগ পাইনি। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, বৈষ্ণব

রস প্রকাশ, সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার- এই চারটি গ্রন্থ পাঠ করেছি। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী (সম্পাদনা), বানান বানানোর বন্দরে, দেশকাল সাহিত্য, ১৪০০ সাল ও চলমান রবি (এই বইটির জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত), বাংলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য, ব্যাকরণ (তিন খণ্ড), সাঁওতালী বাংলা শব্দসাম্য (অভিধান), A Linguistic Dictionary of Bengali Words , অতএব গ্রন্থ তালিকার বিষয় বৈচিত্র্যে চোখ রাখতেই দেখা যায় বাংলা ভাষা সাহিত্যের মৌলিক গবেষণায় ও অনুসন্ধানী বীক্ষণে তিনি সতত ক্রিয়াশীল। আশি বছর পেরিয়ে ব্যাধি-বার্ধক্যে ও বয়সের ভারে যখন শরীর ন্যুব্জ হয়ে পড়ার কথা, তখন ক্ষুদিরাম দাস কিন্তু বাংলা ভাষা বিজ্ঞানের প্রায় এক অনালোকিত দিকে আলোক্ষেপণের চেষ্টায় রত। জন্মসূত্রে তিনি রাঢ় বাঁকুড়ার মানুষ। ঐ জেলায় বিপুল সংখ্যক জনজাতির মানুষের বাস। দীর্ঘপথ পেরিয়ে ডঃ দাস আবার তাঁর সেই উৎস মূলে ফিরে আসতে চাইছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্রটি বর্তমানে বাংলাভাষায়, সাঁওতালি (অর্থাৎ কোল মুন্ডা) প্রভাবের মাত্রা নিরূপণে ব্যস্ত। ডঃ দাস তাঁর সাঁও-বাংলা অভিধান বিষয়ক 'প্রস্তাবনা'য় যে মন্তব্য করেছেন তা নিশ্চিতভাবে আমাদের ভাষায়- 'ভারতের চিরাচরিত গ্রাম-প্রধান ও পঞ্চায়েতি প্রশাসন ব্যবস্থাও কোল মুন্ডাদের সমাজ-বিন্যাসেরই প্রতিরূপ।' সাধারণভাবে ভাষাতত্ত্বের দূরূহ পথে অনেকেই প্রবেশ করতে আগ্রহী নন। সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, গোপাল হালদারের পর এ বিষয়ে তেমন কোনও নাম আর শোনা যায় না। যাই হোক অতিপ্রাপ্ত বয়সে ও বয়সের বাধা ঠেলে ডঃ দাসের এই নতুন পথযাত্রা যদি নবীনতর প্রজন্মের একজনকেও উদ্‌বুদ্ধ করে তাতেও সার্থকতা ।

অধ্যাপক দাসের আশি পূর্তিতে 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কন্যা ও জামাতাদের উৎসাহে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্য বিভাগের বর্তমান প্রধান ও অধ্যাপক দাসের একদা ছাত্র মানস মজুমদার এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষুদিরামবাবুকে যাঁরা চেনেন ও জানেন এমন কিছু নামী ও বড় মাপের মানুষদের স্মৃতিচারণ এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান দখল করেছে। টুকরো টুকরো স্মৃতির মন্তাজে একটি মানুষের পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টির চেষ্টা বলা যায় একে। অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখের কথা রয়েছে প্রথমভাগ জুড়ে। মানস মজুমদারের 'প্রশ্নত্তরের মাধ্যমে সেই অন্তরঙ্গ মানুষটি' ব্যক্তি ক্ষুদিরামকে চেনাতে বিশেষ

সাহায্য করবে। বামফ্রন্ট সরকারের বৃহৎ দলের সঙ্গে ডঃ দাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুবিদিত। তবু তিনি স্পষ্ট কথায় নিজের দ্বিধাহীন মত প্রকাশ করেছেন- আমাদের বাংলায় বাম গরিষ্ঠতা আছে এটা শুভলক্ষণ মাত্র, তার বেশি কিছু নয় কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসাজশ করে তাকে চলতেই হবে। এরই মধ্যে বেশ কিছুদিন গত হওয়ার ফলে ক্রমে যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থাৎ অধ্যাপক, চাকুরে জাতীয় মানুষ এর সংলগ্ন হয়েছেন, তাঁরা আসলে সুবিধাবাদী ভূমিকা নিয়েছেন ও নিচ্ছেন।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বর্তমানে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা সঠিক পথে চলেছেন বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তরঃ কখনোই না। তাঁদের অধিকাংশেই বুর্জোয়া সুবিধাবাদের পথে চলেছেন। কেউ কেউ বামপন্থী মুখসও পরে নিয়েছেন। এ কারণে বামপন্থী আন্দোলনও বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

এই গ্রন্থের একটি রচনায় বাংলা ভাষা সাহিত্যে ক্ষুদিরাম দাসের অবদান প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্ত বলেছেন, ' ভাষাতত্ত্ব এবং ছন্দতত্ত্ব নিয়েও তাঁর মৌলিক চিন্তার কথাও যথাযোগ্য ব্যক্তিরা জানেন। ভাষাতত্ত্বের কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুকুমার সেনেরও বিরোধী হয়েছেন; ছন্দতত্ত্বের কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রতিবাদ করেছেন। এইসব বিরোধিতা বা প্রতিবাদের মূল্য কি ভবিষ্যৎ পাঠক তার পরিমাপ করবেন।' মহাশ্বেতা দেবী অধ্যাপক দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 'তিনি একদিকে রবীন্দ্র গবেষক। অন্যদিকে ভাষাতত্ত্ববিদ। যদিও আমি সাঁওতালি সমাজের সঙ্গে জড়িত আছি, আজ পর্যন্ত তাঁদের ভাষা ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারিনি। শব্দকোষ রচনা করা তো দূরের ব্যাপার। সেদিক থেকে তাঁর এই অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।' প্রবীণতর অন্নদাশঙ্কর রায়ের জিজ্ঞাসা, 'বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক প্রাণশক্তি ও যুবজনোচিত উদ্যমশীলতা তিনি কোথায় পান তা একটা রহস্য হয়ে রইল।'

'আমাদের মাস্টারমশাই' তাঁর এককালের ছাত্র কবি শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণ 'দেখেছিলাম, বুঝেছিলামঃ সংস্কৃত, ইংরেজি আর বাংলা এই তিন সাহিত্যেই তাঁর যাওয়া-আসা কত স্বচ্ছন্দ, কত অনায়াসে স্মৃতি থেকে তুলে আনেন কোনও সংস্কৃত শ্লোক অথবা কোনও ইংরেজি কবিতা ....।' কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও তাঁর 'সরল পাণ্ডিত্যে'র উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে চিঠিপত্র, প্রশংসাপত্র, ক্ষুদিরাম দাসের আত্মকথা, শঙ্খ ঘোষের একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯৪৫ সালে ক্ষুদিরাম দাস বাংলার অধ্যাপকরূপে যখন যোগ দেন তখন সে সময় অন্যান্যদের মধ্যে ছাত্র ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক আবিরলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও তাঁকে যেভাবে দেখেছেন সংক্ষেপে তা তুলে ধরেছেন মাত্র কয়েকটি কথায়। শুনেছি বাংলাদেশেও ডঃ দাসের কয়েকজন কৃতী ছাত্র আছেন। তাঁদের কারও লেখা পাওয়া গেল না?

অধ্যাপক দাসের জীবনের বড় সময় কেটেছে ও কাটছে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে- অন্তত পঞ্চাশ বছর শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে ও টেমার লেনে। কলেজ স্ট্রিটে থেকেও আবার কৃষ্ণনগরে ছায়া ঘেরা বসতবাড়ি গড়েছেন। সেও চল্লিশ বছর হল। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয় শনিবার ক্লাস শেষ করে বা কোনও ছুটির আগের দিন দ্রুতপায়ে কৃষ্ণনগরের ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন তিনি- এ দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। কেউ কেউ গল্প করতে করতে তাঁর সহযাত্রী হয়েছেন। এই গ্রন্থে চেনা পথের চলমান মানুষটির খোঁজ পাওয়া যায় না। 'ছায়াছবি'তে কেন বাদ থাকবে 'স্যারে'র দীর্ঘ পরিচিত পথ কলেজ স্ট্রিট-বউবাজার স্ট্রিট- যে পথে একদিন রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর দিনের পর দিন হেঁটেছেন? আর যে কৃষ্ণনগরকে ঘিরে অধ্যাপক দাসের চার দশকের আনন্দ বেদনা ঘন স্মৃতি ও সত্তা, সে অধ্যায়ই বা কেন অনুপস্থিত ? অতএব ছায়াছবির এই দিকগুলোর প্রায় অনুপস্থিতি গ্রন্থের ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা। ভবিষ্যতে এই অপূর্ণতা দূর হবে আশা রাখি।

কোনও প্রবন্ধকার বা সাহিত্য গবেষককে চেনা ও জানার সবচেয়ে বড় উপায় তাঁর সৃষ্টকর্ম। ক্ষুদিরাম দাসের কৈশোরের কিছু অস্ফুট কবিতা তুলে ধরে তাঁর বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের প্রতি সুবিচার করেননি সম্পাদক। স্মৃতি চিত্রণমূলক এই সব গ্রন্থে প্রকৃত ছায়াচিত্র অর্থাৎ ফটোগ্রাফির গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রন্থে কেন একটিও ফটো নেই তা বোধগম্য হল না।

(কালান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬)

চমকপ্রদ তথের উজ্জ্বল উপস্থিতি

তুষারকান্তি মহাপাত্র

সমাজসেবক হিসাবে যাঁদের দেশজোড়া খ্যাতি তাঁদের মূর্তি বসিয়ে অথবা সাহিত্যসেবকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। তবে যাঁরা যথার্থ সাহিত্যপ্রেমী তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর রীতিটা একটু অন্য ধরনের। তাঁরা সাহিত্যসেবকের জন্মদিনে অথবা তাঁর বিশেষ বয়সে সংবর্ধনা ও আলোচনা-সভার আয়োজন করেন। কখনও-বা এই উপলক্ষে প্রকাশ করেন প্রবন্ধ – সংকলন। কোনও কোনও বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী জীবদ্দশায় তা দেখে যাওয়ার সুযোগও পেয়ে যান।

সম্পতি হাতে এল ‘পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস’ গ্রন্থটি। ক্ষুদিরামবাবুর আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে বইটি প্রকাশিত। তিনি থাকেন কলেজ স্ট্রিট বই পাড়াতেই। নিত্য যাতায়াতের পথে তিনি দেখতে পাবেন দোকানে দোকানে তাঁকে নিয়ে লেখা একটি বই। ভাবলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়।

আরও বিস্মিত হতে হয় লেখকের তালিকায় চোখ বুলোলে। এ-বাংলায় যাঁরা প্রাবন্ধিক হিসাবে অতি যশস্বী ক্ষুদিরামবাবুর প্রতি অনুরাগে তাঁদের অনেকেই সম্পাদক ডঃ মানস মজুমদারের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। দায়সারা গোছের রচনা দিয়ে নয়, নিজেদের খ্যাতির সঙ্গে মানানসই প্রবন্ধ দিয়ে। ফলে এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে পাওয়া যায় চমকপ্রদ অনেক তথের সঙ্গে সমালোচক ক্ষুদিরামবাবুর যথার্থ পরিচয়।

গ্রন্থটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলির দুটি বিভাগ। প্রথমভাগে মুদ্রিত রচনাগুলি ক্ষুদিরামবাবুর আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সংকলনের জন্যেই লিখিত। আর দ্বিতীয় ভাগের প্রবন্ধ তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে লেখা –বর্তমান উপলক্ষে পুনমুদ্রিত। এতে সুবিধা হয়েছে এই যে দুই বিভাগে অন্নদাশঙ্কর রায়ের দুটি প্রবন্ধকে স্থান দেওয়া গেছে, ক্ষুদিরামবাবুর নিজের মোট আটটি রচনাও স্থান করে নিতে পেরেছে। লেখক সংখ্যাও যে এজন্য বাড়ানো গিয়েছে সে তো বলাই বাহুল্য। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রসিদ্ধি মননশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে। তিনি অতি স্বল্প পরিসরে ক্ষুদিরামবাবুর কৃতিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছেন। গুরুভার প্রাবন্ধিক হিসাবে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি। তিনি তাঁর লেখায় ‘বুদ্ধি ও যুক্তির প্রকোষ্ঠ’ অটুট রেখে রসের মোড়কে তথ্যের শাঁস উপহার দিয়েছেন।

তাঁর গদ্যে এমন রসের মিশাল সচরাচর দেখা যায় না। শঙ্খ ঘোষ নিজের লেখায় স্বীকার না করলে কে বিশ্বাস করতে পারত যে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর লেখা প্রবন্ধ পড়ে ক্ষুদিরামবাবুর 'নিরিহতম' মন্তব্য হতে পারে 'চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না'? কে জানত 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে দিনের পর দিন সাহায্য করেছেন শঙ্খ ঘোষ গুরু-শিষ্যের বলা ও লেখার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে একটা গোটা বই। ব্যক্তি ক্ষুদিরামবাবুকে তো বটেই অধ্যাপকের কটু মন্তব্য, সস্নেহ প্রশ্রয় ও স্বচ্ছ আলোচনায় রবীন্দ্রভাবনা সম্পর্কে ছাত্র শঙ্খ ঘোষের ধারণা কিভাবে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে তার ইতিহাস জানতে খুবই সাহায্য করে 'আমাদের মাস্টারমশাই ' লেখাটি। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসকে চেনাতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ তাঁর রবীন্দ্র প্রীতি সম্পর্কে অনেক নাজ্না তথ্য আমাদের জানিয়ে দিলেন। ক্ষুদিরামবাবুর 'পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা নিয়ে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ ভবতোষ দত্তের 'অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস'। আর অধ্যাপকের সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু ' ক্ষুদিরামবাবুর সমীপে' প্রবন্ধে। ভবতোষবাবুর পথই বেছে নিয়েছেন অরুণকুমার বসু অন্যপক্ষে শঙ্করীবাবুর পথ রবীন্দ্র গুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী, শিশিরকুমার দাশ। 'পাণ্ডিত্যের পরিমাপ ' অথবা সান্নিধ্য এ-দুয়ের কোনও এক দিকে না ঝুঁকে ক্ষুদিরামবাবুর প্রতিভা ও ভাষাচর্চার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও মহাশ্বতা দেবী। সংকলন গ্রন্থটিতে সাতাশ জন লেখকের চুয়ান্নটি লেখা স্থান পেয়েছে। এছাড়া আছে ক্ষুদিরামবাবু রচিত সাতটি কবিতা ও বিভিন্ন জনের করা তাঁর গ্রন্থ সমালোচনা। এত মণিমুক্তা হাতে পেয়েও এমন অগোছলো হার গাঁথা হল কেন জানি না। সাধারণত পারিপাট্যের প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ছাপা ও কাগজ। এখানে কাগজ চলনসই, ছাপা সুদৃশ্য। কিন্তু বইটি খুললেই সামনে পড়ে 'মুখ্য ঘটনাপঞ্জী' ক্ষুদিরামবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বইটির প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে যখন খুশিতে মন ভরে ওঠে দেখা যায় মানস মজুমদারের 'প্রশ্নত্তরের মাধ্যমে সেই অন্তরঙ্গ মানুষটি। প্রশ্ন ও উত্তর শব্দদুটি বোল্ড-এ ছাপা – ধরনটা কোন বাজারচলতি পত্রিকার আইন আদালত সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনের স্টাইল। বইটির দ্বিতীয় ভাগেও এমন একটি লেখা স্থান পেয়েছে। সেটি আবার শঙ্খ ঘোষের 'সাক্ষাৎকার'। লেখা দুটিকে অন্যভাবে সাজানো যেত না? সংকলন গ্রন্থের নামটি কে দিয়েছেন জানি না। আকর্ষণীয় হয়েছে কি ?পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস/ সম্পাদনা ডঃ মানস মজুমদার

(বঙ্গলোক ১ জুন ১৯৯৬ ১৮ জৈষ্ঠ ১৪০৩)

বিদ্যাতীর্থের তাপস

একজন শিক্ষক বোধহয় তখনই যথার্থ শিক্ষক হয়ে ওঠেন যখন তার ছাত্ররা তাঁকে নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। ছাত্ররা তাঁকে ছড়িয়ে দেন। এরকমই একজন প্রবাদতুল্য শিক্ষক ক্ষুদিরাম দাস। এই মানুষটি অশীতিতম বয়ঃপূর্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মানস মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে একটি বই- 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস'। তাঁর ছাত্র, সহকর্মী এবং অন্যান্য যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে- তাঁর সুনিবিড় পাণ্ডিত্য, পঠনশৈলী, নিজস্ব বাচনভঙ্গি, ছাত্রবাৎসল্য, আন্তরিকতা, নিরহঙ্কার ব্যবহার, সহজ সরল জীবনচর্চার কথা।

একদিন লালকালিতে যাঁদের খাতা লাঞ্ছিত হত, যাঁদের তিনি পরীক্ষায় বড়ই কম নম্বর দিতেন, যাঁরা ক্লাসে মানতে পারতেন না তাঁর বক্তব্যকে- সেইসব ছাত্ররাই পরবর্তীকালে আসতে চেয়েছেন, আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন তাঁদের মাস্টারমশায় ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়কে। প্রেসিডেন্সি, মৌলানা আজাদ কলেজের সেইসব দিনগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, শিশিরকুমার দাশ, মানস মজুমদার, রবীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের লেখায়। আজ তাঁর ছাত্ররা প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ অবসরগ্রহণ করেছেন, তবু এখনও তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রকৃত শিক্ষক-ছাত্রের, শ্রদ্ধার, ভালবাসার।

তাই শঙ্করীপ্রসাদ বসু আন্তরিকতার সঙ্গে বলেনঃ

'শিক্ষক ও বিদ্বান হিসাবে তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ফুটন্ত জীবন এবং শিশু সারল্য নিয়ে একান্তই ভালবাসার পাত্র। সে ভালবাসা আমার। তাকে ত্যাগ করতে রাজি নই'

কিংবা শঙ্খ ঘোষ লেখেনঃ

'একদিন যে-ছাত্রকে লালকালির লাঞ্ছনায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন মমতা ভরেই, সেই ছাত্রের উপর একটা দায়িত্বের ভার দিয়ে দেওয়া। সেও তো একরকমের শিক্ষাই, সেও তো একজন মাস্টারমশাইয়েরই কাজ। ক্ষুদিরাম দাস আমাদের সেই মাস্টারমশাই।'

আবার অরুণকুমার বসু আলোচনা করেছেন তাঁর মাস্টারমশায়ের বইগুলি নিয়ে, বিশেষত 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় নিয়ে। এই বইটি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আজও উচ্ছ্বসিত। সেই প্রথম যুক্তিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা হল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ডি. লিট. গ্রন্থটিকে নিয়ে অরুণকুমার বসু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তঃ

'অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় হয়ে উঠেছে সমগ্র রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মাচন শিল্প-'

জ্যোতির্ময় ঘোষ লিখেছেন, মফস্বল থেকে এসে তিনি কিভাবে পণ্ডিত মানুষটির সাহচর্য পান। সুধীর চক্রবর্তীর লেখা ক্ষুদিরাম দাসের কৃষ্ণনগর বাস নিয়ে। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, পুরো মেঘদূতটাই সংস্কৃতে তাঁর মুখস্ত।

মহেশ্বেতা দেবী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রকাশ চক্রবর্তী, ভারতী দাস প্রমুখের রচনা থেকে অধ্যাপক মানুষটির নানান দিকের কথা জানতে পারা যায়।

বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের যুক্তিপূর্ণ-তথ্যনিষ্ঠা আলোচনায় উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

' আর্দ্র মাটির দেশ এই বাংলা, মন সহজেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে, ভক্তি স্রোতে বুদ্ধি-বিবেচনা দিগন্তে ভেসে যায়। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তার এক বিরল ব্যতিক্রম।'

বইটিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের তিনটি সাক্ষাৎকার আছে। এর মধ্যে দুটি পুনমুদ্রিত। একটি প্রেসিডেন্সি কলেজের একশ পঁচাত্তর বছর উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় শঙ্খ ঘোষের নেওয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ সম্পর্কিত এবং অপরটি গণশক্তি পত্রিকায় আবদুস সাত্তারের নেওয়া তাঁর রবীন্দ্র-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা। আশি বছর বয়সে মানস মজুমদার যে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন তাতে শুধু বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিয়েই নয় জীবনের অতীতদিনের নানান ঘটনা, বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশ দেশকাল-সবকিছু নিয়ে স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন।

বইটিতে আশিবছর বয়স উপলক্ষে লেখা ছাড়াও সত্তর বছর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে, ডি. লিট. প্রাপ্তি, বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে যেসব লেখালেখি হয়েছে তার একটা অংশ সংকলিত হয়েছে। সংকলিত হয়েছে ক্ষুদিরামবাবুর নিজের কিছু লেখাও। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র সেন, জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখদের লেখা চিঠি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই চিঠিতে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছিলেনঃ

‘আপনার চণ্ডীমঙ্গল সম্পাদন একটি মহৎ কাজ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি সমস্ত জাতির পক্ষে একটি বৃহৎ কর্তব্য সাধন করেছেন। এতদিন এই কবির প্রতি আমাদের জাতীয় কর্তব্য নিষ্পন্ন হল। আপনি সমগ্র জাতির আশীর্বাদভাজন হয়েছেন।’

তবে বইটিতে অধ্যাপক দাসের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রের স্মৃতিচারণা থাকলে বইটি আরও প্রামাণ্য হত। কয়েকজন লেখক আরেকটু আন্তরিক হলে ভাল লাগত। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে ‘পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস’ বইটিতে অশীতিপর কর্মযোগী জ্ঞানী মানুষটির প্রামাণ্য চিত্র ফুটে উঠেছে। আমরা যারা এই প্রজন্মের মানুষ, তাঁকে তেমনভাবে জানার সৌভাগ্য হয়নি। তাদের কাছে এই বইটি বিশেষ মূল্যবান। আর সেই কাজটি করবার জন্য বইটির সম্পাদক মানস মজুমদার ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন।

কুন্তল মিত্র

(নন্দন, নভেম্বর ১৯৯৬)

পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর গুণগ্রাহীরা এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। সম্পাদক ডঃ মানস মজুমদার রচনাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে সাজিয়েছেন। প্রথম ভাগে রয়েছে অধ্যাপক দাসের আশি বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে সদ্যরচিত কতকগুলি নিবন্ধ এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পূর্বপ্রকাশিত কিছু লেখার পুনর্মুদ্রণ। তার মধ্যে অধ্যাপক দাসের নিজেরও বেশ কয়েকটি লেখা (গদ্য এবং পদ্য দুইই) আছে।

বাংলা সাহিত্যের পঠন পাঠনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের কাছে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের নাম অজানা নয়। বিশেষতঃ তাঁর দুটি বই রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ও বৈষ্ণব রস প্রকাশ তো সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও অধ্যাপকদের হাতে হাতে ঘোরে। এই বই দুটিতে এবং অন্যান্য সব বইতেই লেখক যে পাণ্ডিত্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা সাহিত্য সমালোচনার জগতে দুর্লভ। কিন্তু শুধু পণ্ডিত বলে নয়, মানুষ হিসাবেও অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস যে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এই বইটি পড়লে তা জানা যায়।

সাধারণতঃ এই ধরনের উপলক্ষ্যজাত প্রশস্তিভিত্তিক বইগুলি খুব উচ্চমানের হয় না; এবং আত্মীয় বন্ধু প্রিয় পরিজনের সীমানার বাইরে খুব একটা আদৃতও হয় না। কিন্তু বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি সে জাতীয় নয়। সূচীপত্রে চোখ বোলালেই অনেকগুলি অত্যুজ্জ্বল নাম দেখতে পাই। যেমন অধ্যাপক দাস তাঁর দুই প্রাতঃ স্মরণীয় শিক্ষকের সৃতিতর্পণ করেছেন। তাঁরা হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আবার অধ্যাপক দাসের বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আজকের দিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধানেরা অনেকেই আছেন, যেমন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুধীর চক্রবর্তী, রবীন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি। এঁরা কেউ সহকর্মী কেউবা ছাত্র। লেখাগুলি পড়লে বোঝা যায় কেউই দায়সারা লেখা লেখেননি। যত্ন করে ভালোবেসে লিখেছেন। যেহেতু এঁরা সকলেই লেখক, বিশেষতঃ প্রবন্ধ রচনার কারুকর্মে অভিজ্ঞ তাই প্রতি লেখাই উচ্চমানের সুপাঠ্য লেখা হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে এই সংকলনটিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ ধরা পড়ে। সব মিলিয়ে এই সংকলনটিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের

একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ ধরা পড়ে। যামিনী রায়ের স্মৃতিধন্য বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামের গরিব ঘরের একটি মেধাবী ছেলে সংস্কৃতে স্নাতক হয়ে কলকাতায় এম. এ. পড়তে এসেছিল। এম. এ ক্লাসে ভর্তি হবার আগে তার মনে দ্বিধা জেগেছিল এবার কোন বিষয় নিয়ে পড়া ভাল হবে, বাংলা না সংস্কৃত। বাংলা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দুটি সার কথা বলে দিয়েছিলেন-এক, বাংলা পড়ে চাকরি পাওয়া যায় না। দুই, ওতে খেটে পড়ে শেখার আর তেমন কী আছে, দু চার মাস খাটলেই যথেষ্ট। এই প্রকার উত্তরে দমে না গিয়ে সেই মফস্বলী ছেলেটি বাংলা নিয়েই পড়া শুরু করল। এবং যেহেতু, শুধু পাঠ্যটুকু আয়ত্ত করতে তার সত্যিই খুব বেশী খাটতে হত না। তাই সকাল সন্ধ্যা টিউশানির মাঝখানে ODBL সহ বাংলা ভাষাতত্ত্বের যাবতীয় কূটকচালি মুখস্থ করে ফেলেন। খাটতে যে ভালোবাসে খাটবার যোগ্য বিষয়ের অভাব তার হয় না। এবং এই পরিশ্রমের আনন্দে বিভোর হয়ে ক্ষুদিরাম দাস আশি বছর পার করে দিলেন। এখনও তিনি অক্লান্ত।

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন তাঁদের দু একটি মন্তব্য উদ্‌ধৃত করে আলোচনা সমাপ্ত করা যেতে পারে। এই মন্তব্যগুলিকে অধ্যাপক দাসের ব্যক্তিত্বের দিগদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা গেল।

“ক্ষুদিরামবাবু তখন থাকতেন (১৯৪৬-৪৭) মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটা মেসবাড়িতে। সেখানে হানা দেবার অবাধ অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে জমিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতুম। স্যারের কাছে পড়ব সেখানে পয়সার কথা আসে কোথায়?

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

“ ছাত্রদের মঙ্গল যিনি চান তিনি চান না কোনো সহজ জনপ্রিয়তা। আমাদের এই মাস্টারমশাইও তা চাননি।”

শঙ্খ ঘোষ

" ক্ষুদিরাম দাস বুদ্ধি ও যুক্তির প্রকোষ্ঠ থেকে রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিচারে প্রস্তুত হয়েছেন তাতে হয়তো ভক্তেরা সায় দেবেন না, কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির সমর্থন থাকবে।"

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

" বিভাগীয় রুটিন করাবার সময় ক্ষুদিরামবাবু সহকর্মীদের নির্দেশ দিতেন। যেখানে ক্লাস করবার অসুবিধে হবে সেখানেই লিখবেন KD। আর সিলেবাসে নিজেদের পছন্দমত বই নিয়ে যেসব বই পড়ে থাকবে দিয়ে দেবেন KD র নামে। কোনো অসুবিধে নেই আমার।"

সুধীর চক্রবর্তী

" যাঁদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক, তাঁরা সকলেই যে তাঁর সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করবেন, সম্পর্করক্ষার এমন কোনও শর্তও তিনি কখনও আরোপ করেননি। "

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আজকের দিনে ছাত্র শিক্ষক ক্রমেই যখন পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে যাচ্ছেন তখন মানস মজুমদার এইরকম একজন শিক্ষকের জীবনচরিত প্রকাশ করে পুণ্যকর্ম করলেন সন্দেহ নেই।

(পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস , একসাথে ভাদ্র ১৪০৩)

বই পাড়ার খবর

অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে ‘পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস’ নামের একটি রচনা সংকলন। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডঃ মানস মজুমদার। গ্রন্থ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন- ‘প্রথম ভাগে মুদ্রিত রচনাগুলি অধ্যাপক দাসের আশি বছর পূর্তিতে লেখা। দ্বিতীয় ভাগের রচনাগুলি ডঃ দাসের জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত। বর্তমান উপলক্ষে পুনমুর্দ্রিত হলো।’ গ্রন্থের প্রথমেই অধ্যাপক দাসের জীবনের মূখ্য ঘটনাপঞ্জী, প্রাপ্ত পুরস্কারের তালিকা, কর্মসূত্র জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখ ও তাঁর রচিত গ্রন্থাদিরও একটি তালিকা আছে। যাঁদের স্মৃতিচারণায় গ্রন্থটি উজ্জ্বল তাঁরা হলেন, অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, রবীন্দ্র গুপ্ত, অরুণকুমার বসু, শিশিরকুমার দাস, নীরেন চক্রবর্তী, মহাশ্বেতাদেবী, জ্যোর্তিময় ঘোষ, মানস মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ এবং আরও অনেক বিশিষ্ট খ্যাতনামা ব্যক্তি। অধ্যপক দাসের কয়েকটি লেখাও সংযোজিত হয়েছে। তা হলো, ‘সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে অধ্যাপক দাসের মতামত’, ‘সাঁও-বাংলা অভিধান বিষয়ক প্রস্তাবনা’ এবং ‘সশ্রদ্ধং প্রতিবচনম্’। গ্রন্থটি অধ্যাপক দাসের জীবন ও কর্মের এক মূল্যবান দলিল হয়ে উঠেছে। সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্থান; মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

প্রজ্ঞাপারমিতা রায়

(গণশক্তি, ১৪ই জানুয়ারি, রবিবার, ১৯৯৬)

ভালো লাগা বই

শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৯৪৩ থেকে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত গবেষক ক্ষুদিরাম দাস। অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা মূল্যবান বই। রবীন্দ্র-প্রতিভা পরিচয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, সাঁওতালী বাংলা, বৈষ্ণব রস প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে এই বাংলার বেশ কয়েকজন কৃতী ছাত্রও। অধ্যাপক দাসের ৮০ বছর পূর্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও একদা তাঁর ছাত্র মানস মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই বইটি

আসলে অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিন অধ্যায়ে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে তাঁর জীবন ও কর্মধারা। অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ, অধ্যাপক দাসের সাক্ষাৎকারে তাঁর রচনার মূল্যায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্কলিত চিঠিপত্র, প্রশংসাপত্র ছাড়াও অধ্যাপক দাসের আত্মকথা বইটির মূল্য বাড়িয়েছে।

(সঙ্কলন- দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস)

(আজকাল, ৩ নভেম্বর ১৯৯৬)

চতুর্থ অধ্যায়

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের ডি লিট উপাধি লাভে ছাত্র ও অধ্যাপক বৃন্দের মিলিত অভিনন্দন উৎসব।

।। অনুষ্ঠান সূচি ।।

১) উদ্বোধন সঙ্গীত ।। অধ্যাপক শ্রীভাস্কর দেব মিত্র।
২) উদ্বোধন।। অধ্যাপক শ্রী ভূপেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৩) মাল্যদান ও অতিথিবরণ।
৪) মান পত্র পাঠ।। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (প্রাক্তন ছাত্র)
৫) বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের ভাষণ।
ক) অধ্যাপক ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।
খ) শ্রীযতীন্দ্র সেন কবি ও সংবাদিক। সহঃ সম্পাদকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা
গ) অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য -কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৬) "রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়" গ্রন্থের অংশবিশেষ পাঠ।।
অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র গনাই।
৭) রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন।। শ্রীঅশোক সরকার।
বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক কথাকলি।
৮) কবি ও অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণু দে র ভাষণ।
৯) সমিতির পক্ষে থেকে।। অধ্যাপক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।
১০)প্রধান অতিথির ভাষণ।। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।
১১) উর্দু সাহিত্য সমিতির পক্ষে হ'তে অভিনন্দন জ্ঞাপন।–
উপহারঃ নিয়াজ্ আমোদ খান্।
ভাষণঃ আব্বাস আলি খান্।
১২) বাঙলা সাহিত্য সমিতির পক্ষে থেকে।। প্রহ্লাদ মুখোপাধ্যায়।
১৩) সভাপতির ভাষণ।। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী।
১৪) অধ্যাপক দাসের প্রতিভাষণ।।
১৫) সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।। ছাত্রদের পক্ষে থেকে।।
১৬)সমাপ্তি সঙ্গীত।।
১৭)সমাপ্তি।। ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।

সেদিন সকালে সংবাদপত্র ঘোষণা করল অধ্যাপক দাসের জয়বার্তা । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সম্মান ইতঃপূর্বে কাউকে দিতে চাননি সেই অভূতপূর্ব সম্মান , ডি লিট্ উপাধি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অভিনন্দিত করেছেন শ্রীদাসের গবেষণাকে ।

বিপুল আনন্দের সঙ্গে সংবাদপত্রে বিঘোষিত সংবাদটি পাঠ করলাম। দীর্ঘদিন নিকট পেয়েছি অধ্যাপক দাসকে। কৃষ্ণনগর কলেজে একত্রে কাজ করেছি, পরে আবার মিলিত হয়েছি এই কলেজে। এখানে সে প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে।

বিস্ময়কর সংবাদ সেদিন অভিভূত ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন একটি সভায় ক্ষুদিরামবাবুকে । কিন্তু সেদিন বাংলা বিভাগের সাম্মানিক ও ঐচ্ছিক মানের ছেলেরা সঙ্কল্প করলেন তাঁদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে তাঁরা পরে একটি সাড়ম্বর সম্বর্দ্ধনা সভা করবেন তাঁদের প্রিয় অধ্যাপকের জন্য। সে আন্তরিকতার টানে যোগ দিলেন প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান ছাত্র-সাধারণ, অধ্যাপকবৃন্দ। প্রেরণা পাওয়া গেল শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট হতে। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের বিশেষ প্রচেষ্টা ,এই সভার পিছনে। তাঁরা চান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন –পাঠন যারা করেন অন্যান্য কলেজে, তাঁদের সকলের শ্লাঘ্য উপস্থিতিতে তাঁরা অধ্যাপক দাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এই বড় কাজ করতে গিয়ে ছাত্রবন্ধুরা কোথাও যদি ত্রুটি বা পরিচালনায় কিছু অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন তাহলে আমার মহান বন্ধুরা নিজগুণে স্বল্প সংখ্যক ছাত্রের অকৃত্রিম ভাবাবেগের কথা স্মরণ করে সে সকল দোষ ক্ষমা করবেন।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের সঙ্গে যার পরিচয় ঘটেছে তিনি দেখেছেন একটি পরিণত বয়সের বহিরাবরণের অন্তরালে একটি আবেগ স্পন্দিত সরল শিশুকে। কি অদ্ভুত নিরহঙ্কার । কি অনির্বাণ জিজ্ঞাসা । বিদ্যা যে সত্যই বিনয়-শ্রী মণ্ডিত করে মানুষকে- তার পরিচয় ক্ষুদিরামবাবু। অন্যত্র দেখেছি যাঁদের প্রাপ্তি সামান্য , তাঁদের অপপাণ্ডিত্যের দৃপ্ততা কি অসামান্য। ক্ষুদিরামবাবুকে দেখলে মনে হয় যিনি অনেক জানেন তাঁর এ উপলব্ধি গভীর হয় যে কি অসীম তাঁর অজানা। সেই কথাই হচ্ছিল সেদিন বন্ধু ডক্টর অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বলছিলেন তিনি ক্ষুদিরামবাবুর নিবন্ধ-পরীক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমতের কথা। কলিকাতায় এসেছিলেন অমিয়বাবু কিছুদিন পূর্বে। কথা প্রসঙ্গে অসিতবাবুর কাছে ক্ষুদিরামবাবুর নিবন্ধ

সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তিনি; তাঁর মতে এমন নিবন্ধ নাকি বিদেশে ও সুদুর্লভ।

বন্ধুবর মনীষী হিসাবে পণ্ডিতজনের চিত্ত জয় করুন। তাঁর মত মনীষা সুদুর্লভ কিনা বিচারের ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু তাঁর মত মানুষ যে শিক্ষক সাধারণের মধ্যে অসাধারণ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাছে তাঁকে পেয়েছি ,কাজের মধ্যে তাঁকে জেনেছি। আমার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এই উপলব্ধি স্পষ্ট হয়েছে যে শিশুর সারল্য ও পরিণত বুদ্ধির এমন গভীরতা বাংলার অধ্যাপক মহলে সহজে নজরে পড়ে না। জয় হোক তাঁর। তাঁর মনীষা আমাদের নিত্যকালের সম্পদ হয়ে থাকবে- এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রার্থনা করি , মানুষ হিসাবে , তিনি আমাদের চিত্তলোকের সম্পদ হয়ে থাকুন।

ডঃ সুধাকর চট্রোপাধ্যায়

সভাপতি

অভিনন্দন সমিতি

মৌলানা আজাদ কলেজ

এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, আমাদের সহকর্মী, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান; বাংলা সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক দাসই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভের অধিকারী হইলেন। তাঁহার সহকর্মীগণ, ছাত্রগণ- এককথায়, সমগ্র মহাবিদ্যালয় তাঁহার গৌরবে গর্ব্বিত। আমরা অধ্যাপক দাসের যশমণ্ডিত সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। গবেষণাক্ষেত্রে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব এই সাফল্য যদি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করিতে পারে, তবেই আমার মনে হয়, অধ্যাপক দাস সর্ব্বপেক্ষা আনন্দিত হইবেন।

ভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, মৌলানা আজাদ কলেজ

আর একটি সাহিত্য পুরস্কার ও পত্রিকা শতবার্ষিকী

কলকাতা, ১৯ মে- অমৃতবাজার পত্রিকা এবং তার সহযোগী সংস্থা যুগান্তর ও অমৃতের পক্ষে থেকে সাহিত্য সেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আরও একটি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হবে বলে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ আজ ঘোষণা করেছেন। সাংবাদিকতা বিষয়ে দুটি পদক পুরস্কারের কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন।

সাহিত্য বাসরের পক্ষে থেকে প্রতি বছর সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক ও সাহিত্যনুরাগীদের যে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই দিন সেই অনুষ্ঠানে শ্রীঘোষ তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন পুরস্কারের টাকাটাই বড় কথা নয়। এর দ্বারা মানী ব্যক্তিদের সমাজ যে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয় সেটাই এই ব্যবস্থার আসল কথা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

তিনি বলেন, এত দিন ঐ সংস্থাগুলির পক্ষে থেকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হত। আগামী বছর থেকে নাট্য সাহিত্যের জন্য একটি বাড়তি পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। তার সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিষয়ে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী স্বর্ণ পদক ও রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হবে।

আজ থেকে একশ বছর আগে সাধারণ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মহাত্মা শিশিরকুমার যে অবদান রেখে গেছেন, নতুন পুরস্কারটি হবে তারই স্মারক।

সভাপতির ভাষণে প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বলেন, দেশে ব্যক্তি, বাক্, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি সর্বাত্মক বিপ্লবেরই পরিচয় বহন করে। সকলেই চান যে, এই সব স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকুক।

তিনি বলেন, কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতা বা সমাজসেবীরা এই ব্যাপারে উদ্যোগী হলে চলবে না। সাহিত্যসেবীদেরও এই ব্যাপারে অসামান্য ভূমিকা আছে। তাঁরা সে ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত তিনি যাঁদের স্মরণে পুরস্কারগুলি দেওয়া হয় এবং যাঁদেরকে দেওয়া হবে তাঁদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, সাহিত্য, সংবাদিকতা ও সংস্কৃতির অনুশীলনে তুষারবাবু দীর্ঘকাল ধরে যেভাবে সহায়তা করে যাচ্ছেন, তার জন্য তিনি সকলের কাছথেকেই সাধুবাদ পাবেন। এর জন্যই তিনি এত জনপ্রিয়। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তাকল্পে তুষারবাবু অন্য রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেও পুরস্কার করে থাকেন, ছাত্রদেরও প্রতি বছর পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেন। তাই তিনি এত জনপ্রিয়। আজকের মহতী সমাবেশ তাঁর সেই জনপ্রিয়তায় সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

বিবেকানন্দবাবু আরো বলেন, আমেরিকা পুলিংজার পুরস্কারের মত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করায় জন্য তিনি তুষারবাবুকে অনুরোধ জানান।

বিভিন্ন পুরস্কার – এ বছর অমৃতবাজার, যুগান্তর ও অমৃত প্রদত্ত শিশিরকুমার এবং মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনিষদের দর্শন, রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব এবং ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ বইগুলি রবীন্দ্র চর্চার ক্ষেত্র এক নতুন পথ-পদর্শক। প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীচন্দ্র রচিত অবিস্মরণীয় বইটি বাংলা বিপ্লববাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ফাঁক স্মরণীয় সংযোজন।

রোমাঞ্চরর কাহিনী ও বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থাদির অনুবাদের জন্য মৌচাক পত্রিকার দেওয়া সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন কৃতী শিশু সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়।

প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির দেওয়া প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি শ্রীমিত্র।

এই দিনের অনুষ্ঠানে আরও অনেকের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভবানী মুখার্জি, দীনেশ দাস, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমল মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সাগরময় ঘোষ, সুশীল রায়, বাণী রায়, সুধারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সুমথনাথ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, মণীন্দ্র রায়, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্য রচয়িতা শ্রীনাসের আলী ও তাঁর কন্যা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডলি।

(যুগান্তর, রবিবার, ২০ মে ১৯৭৩)

সাহিত্য বাসরে সাহিত্যসেবীদের সম্মাননা

স্টাফ রিপোরটারঃ সমাজবিপ্লবকে সার্থক করে নতুন যুগের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য সেবীদের ভূমিকা কারও চেয়ে কম নয়। শনিবার কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এক সাহিত্য বাসরের সভাপতিরূপে প্রধান বিচারপতি শ্রী শঙ্করপ্রসাদ মিত্র এই মন্তব্য করেন।

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শিশিরকুমার পুরস্কার, প্রাক্তন বিপ্লবী ও সাহিত্যসেবী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র 'মতিলাল পুরস্কার', অনুবাদ ও শিশু সাহিতে খ্যাতিমান শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় 'সুধীন চন্দ্র (মৌচাক) পুরস্কার' এবং রামতনু অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস 'প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার পান। স্বর্গত ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক শ্রীঘটকের স্মৃতিতে তাঁর পরিবারবর্গ এবার পুরস্কারটি প্রবর্তন করলেন।

নাট্যসাহিত্য ও সংবাধিকতার জন্য আরও কয়েকটি ভবিষ্যত পুরস্কার বা সন্মান মূল্য দেওয়া কথা অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান বিচারপতি শ্রী শঙ্করপ্রসাদ মিত্র তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সাহিত্যিকদের ভূমিকার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আজকের সমাজ আমূল পরিবর্তনের মুখে। আজ ব্যক্তি, বাক্, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নতুন করে যাচাই হতে চলেছে। এই সমাজবিপ্লবকে সার্থকতার পরিণত করতে রাজনীতিবিদ প্রভৃতির মত সাহিত্যসেবীদের ভূমিকাও অসামান্য। সাহিত্যিকরা দেশকে এগিয়ে যাওয়া পথের নির্দেশ দেন। দিন যাপনে গ্লানি থেকে মুক্তি দেন। তাই তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধেয়।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ২১ মে ১৯৭৩)

বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কলকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর- শনিবার রবীন্দ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে ১৯৮৪ সালের বিদ্যাসাগর পুরস্কার তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ। এই দিনটি ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৬৪ তম জন্মদিবস।

বিগত ৪০ বছরে গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এই পুরস্কার পান। প্রেমেন্দ্র মিত্র পান শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ অনুষ্ঠানে বলেন, ভারতীয় ঐতিহ্য আছে- গুরুস্থানীয়দের শ্রদ্ধা জানানো, স্মরণ করা। বামফ্রন্ট সরকার রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ মনীষীদের নামে পুরস্কার দিয়ে তাদের স্মরণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা মহৎ অবদান রেখেছেন, তাদের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সমস্ত দিক দিয়ে গুরুস্থানীয়- তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, ঋত্বিক, যিনি বাংলা ভাষার সিংহদ্বার সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত শুধু করেননি, সচেতন জাতিকে নিজের ভবিষ্যতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শুধুমাত্র পুরস্কার প্রদানের মধ্যেই তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে সীমাবদ্ধ থাকবেনা বামফ্রন্ট সরকার। গণমুখী শিক্ষণব্যবস্থায় সমগ্র জনগণকে সচেতন করতে ও প্রয়াসী এই সরকার।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাস ফদিকার বলেন, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি মানবতা ও সত্য বস্তুনিষ্ঠ সৎ শিল্পের সপক্ষে। সেই শিল্পকার্যকে স্বীকৃতি দিতে, প্রেরণা যোগাতে এই পুরস্কার।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস পুরস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'যোজনা বহির্ভূত' খাতে খরচ না করার নির্দেশ উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের সরকার যে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতির এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে তা অভিনন্দযোগ্য। আগে ছিল শুধু রবীন্দ্র পুরস্কার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতির পরিধি তাই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ এই সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে

অনেকগুলি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, এতে শিল্পী, গবেষক-পণ্ডিতরা অনুপ্রেরণা পাবেন, দেশ যথার্থভাবে জাগরিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, বিদ্যাসাগর এক দিক দিয়ে অতীতের নয়, ভবিষ্যতের মানুষ। এমন যে একটি মানুষ এখানে জন্মেছিলেন, তাঁর স্মৃতির মর্যাদা রাখা সহজ নয়।

(গণশক্তি, ৩০ শে সেপ্টেম্বার, ১৯৮৪)

বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রদান

স্টাফ রিপোর্টারঃ এ বছর বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার পেলেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাংলা গদ্য সাহিত্যে নিরবচ্ছিন্ন অবদানের জন্য ডঃ দাস আর শিশুসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভূষিত হন ঐ সম্মানে। শনিবার রবীন্দ্রসদনে এক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এ দিনের সভাপতি ও রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ রাজ্য সরকারের পক্ষে ঐ দুই কৃতী প্রবীণ সাহিত্যিকের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন।

এদিন পুরস্কার গ্রহণ করে দুই প্রবীণ সাহিত্যিকই আনন্দ প্রকাশ করেন। উভয়েই ঘোষণা করেন, বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বলেইত' পুরস্কার অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিককে মর্যাদা দিতে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় হলেও রাজ্য সরকার বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে এসেছেন- তা অবশ্যই লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, দেশ যথার্থভাবে জাগরিত হোক- জনকল্যাণ মূলক কর্মের দ্বারা উজ্জীবিত হোক। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, অনেক দেরিতে পেলেও ঐ পুরস্কারের দাম অনেক বেশী। কারণ বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে ঐ পুরস্কার জড়িত। তিনি শুধু অতীতের নন, ভবিষ্যতেরও।

রাজ্য সরকারের পুরস্কার-নীতি ঘোষণা করে প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাস ফদিকার জানান, শিল্প ও সংস্কৃতি

ক্ষেত্রে যারা বিশেষ অবদন রাখছেন, তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়াই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। সত্যনিষ্ঠ বস্তু-আশ্রয়ী ও সৎ শিল্পের বিকাশের অংশীদার হওয়াই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য বলে শ্রী ফদিকার উল্লেখ করেন।

শম্ভু ঘোষ বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র জাতীয় পথিকৃৎই শুধু নন, তিনি গুরু স্থানীয় ও ঋত্বিক- তার ঋণ কোন দিনই শোধ করা যাবে না।

(দৈনিক বসুমতী, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪)

কলমের পুরস্কার পেলামঃ প্রেমেন

স্টাফ রিপোটারঃ বলার জন্য পুরস্কার পাইনি। কলম চালাতে পেরেছি বলেই এই পুরস্কার পেলাম। শনিবার বিদ্যাসাগর পুরস্কার পাওয়ার পর, তাঁর ভাষণে প্রেমেন্দ্র মিত্র একথা বলেন। তাঁকে শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হল। এদিন ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকেও গদ্য সাহিত্যে বিশিষ্ট গ্রন্থ্ রচনার জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শম্ভু ঘোঘ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী প্রভাস ফাদিকার। এই পুরস্কারের সম্মান মূল্য ১০,০০০ টাকা। এই সংগে একটি করে তাম্রপত্রও প্রদান করা হয়।

প্রভাস ফাদিকার তাঁর ভাষণে বলেন, শ্রেয়কে স্মরণ করা, প্রেয়কে বরণ করাই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য বামফ্রণ্ট সরকার এই জাতীয় ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে যাচ্ছে। শিক্ষা সংস্কৃতিতে স্থায়ী অবদান যাঁরা রাখছেন তাঁদের পুরস্কার করার কথা আমরা ভেবেছি। সেই অনুযায়ীই প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে এই পুরস্কার দেওয়া হল।

উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ বলেন, যাঁর নামে এই পুরস্কার তাঁকে কিন্তু আমরা ভুলে গেছি। নাহলে আজ যে ভাষার জন্য আমরা গর্ব করি সেই ভাষার সিংহদ্বার যিনি খুলে দিয়েছেন তাঁর ১৬৪ জন্মদিনে বাংলা সংবাদপত্রগুলি তাঁকে নিয়ে একটিও বিশেষ রচনা প্রকাশ করেননি।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেন, দেশ আজ আবিল এক অপসংস্কৃতির স্রোতে ভেসে যেতে চাইছে। এখন আমাদের আরো বেশী করে বিদ্যাসাগরের মত

মহাপুরুষদের স্মরণ করা উচিত। তিনি এরপর বলেন, এই পুরস্কার যে তাঁকে দেওয়া হল, এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

(সত্যযুগ, ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪)

Vidyasagar Memoria' Awards presented

By a staff Reporter

The West Bengal Government's Vidyasagar Memorial Awards for this year were given to Mr Premendra Mitra and Mr kshudiram Das at a function in Calcutta on Saturday. The award carried Rs 10000 in cash and a copper plaque. Mr Mitra was awarded for his contribution to children's literature and Mr Das for his work in Bengali prose.

Mr Sambhu Ghosh, Minister for Higher Education , said that the State Government paid homage to Vidyasagar through the presentation of the award on his birth anniversary. He regretted that the country's great men were not duly remembered.

(The Sunday Statesman ,September 30 1984)

ঐক্য সংহতির সাধক শ্রীচৈতন্য

গত ২৬শে মার্চ রাত ৮টায় উপরোক্ত শিরোনামায় ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস কোলকাতার আকাশবাণী থেকে শ্রীচৈতন্যের পাঁচশোতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক মূল্যবান কথিকা পাঠ করে শোনান। মূল্যবান এই কারণে যে এই কথিকায় তিনি এমন সব তথ্য তুলে ধরেছেন যা সাধারণ হিন্দু এমনকি শ্রীচৈতন্যভক্ত হিন্দুদেরও অজানা। ডক্টর দাস বলেন যে, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্ররাশিই এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাবধান সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানদের প্রতি ছিল

ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত সমাজের নিদারুণ ঘৃণা। শ্রী দাস দাবী করেন যে শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ্যসৃষ্ট এই ঘৃণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। মুসলিম ও শুদ্রের বিরুদ্ধে সৃষ্ট ঘৃণাকে দূর করার জন্যেই তিনি যবন হরিদাস ও শুদ্রদের কোলে টেনে নিয়েছিলেন। কবীর খাস ও দবীর মল্লিক নামক দুই বিশিষ্ট মুসলমানের সাহায্য তিনি এই সংগ্রাম পরিচালনায় তাই স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

ডক্টর দাস অসংকোচে এই সত্য ব্যক্ত করেছেন। হোসেন শাহের আমলে বর্ণ হিন্দুদের উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত করা হতো। তিনি এও স্বীকার করেন যে এটা শুধু হোসেন শাহের আমলের একক বৈশিষ্ট্য ছিলনা বরং এটাই ছিল তুর্কী – পাঠান যুগের বৈশিষ্ট্য। আর এটাই হয়েছিল এদেশের সাধারণ মানুষের জন্যে কাল। রাজদরবারে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করে তাদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার বেড়ে গিয়েছিল। এরা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়ে বল্লালী আমলের মানবতা বিরোধী জাতিভেদ প্রথাকে কঠোরভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্য এর বিরোধিতা করেছিলেন কীর্তনগানের সহজ পথে। তিনি শুদ্র হিন্দুদের ব্রাহ্মণদের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করেছিলেন। এতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজ চটে গিয়েছিল। যেহেতু রাজদরবারে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব ছিল, তাই তারা শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে কাজীর কান ভারি করে। তাঁর কীর্তনের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে বলে নানা অভিযোগ তুলতে থাকে। কাজী এতে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হন। শ্রীচৈতন্য সদলবলে কাজীর হাজির হয়ে তাঁর ভুল ভাঙান। রক্ষণশীলরা ছাড়া তাই সবাই তাঁকে স্বগত জানান।

শ্রীচৈতন্যের এই মানবিকতার আদর্শের প্রভাব সমাজে পড়েছিল। ইসলাম যেহেতু মানবিকতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল তাই অমানবিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যের এই সংগ্রাম মুসলিম সমাজের সমর্থন লাভ করেছিল। নাসীর মামুদ, লালন ফকীর প্রমুখ মুসলমানেরা এই কারণেই তাঁকে স্বাগত জানান। তাঁর আন্দোলনের ফলে হিন্দু কবিরা নবীজীবনের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলেও ডক্টর দাস দাবী করেন।

হোসেন শাহের সংগে উড়িষ্যার হিন্দুরাজার রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দেয়। সুবর্ণ নদীর দুই পারে হিন্দু মুসলমান সৈন্য পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার নদীপার হয়ে পুরী যেতে কোন অসুবিধা হয়নি। মুসলমান সেনাপতি ফেয়ার পথে তাঁকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলেন। হোসেন শাহের রাজ্যের সর্বত্র তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল।

মুসলমান সুলতান ও তাদের প্রশাসন সামাজিক কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন না কারণ তারা ষ্টেটাসকো বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন কারণ ষ্টেটাসকো বর্তমান থাকলে নিরুপদ্রব্যে রাজ্যশাসনের সুবিধা হয়। শ্রীচৈতন্য এই উদার শাসনতান্ত্রিক পরিবেশে সমাজসংস্কারে হাত দেন ও সফলতালাভ করেন।

উপরোক্ত সত্য ইতিহাসকেও আজ ব্রাহ্মণরা বিকৃত করে ফেলেছে। তারা এখন কাজীকে চৈতন্য বিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। কিছু ব্রাহ্মণাতন্ত্রী সংস্থা শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শ বিরোধী কাজ করছে।

(গীঘান ৩০শে মার্চ ১৯৮৬ ১৬ই চৈত্র ১৩৯২ ১৪বর্ষঃ ৪০ সংখ্যা)

চৈতন্যের নতুন বিশ্লেষণ করলেন ক্ষুদিরাম দাস

মানবিক বোধের উদগাতা চৈতন্যদেবের ৫০০ তম আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ ও মায়াপুরে বিরাট ধর্ম মেলা চলছে। বুধবার আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ কথিকা প্রচারিত হলো। নির্যাতিত মানুষের পরিত্রাতা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বললেন, নৈসগিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র ধরেই তাঁর আবির্ভাব। দুর্যোগ ও সংগ্রামের পথ ধরেই তিনি এলেন। তিনি মানবতার বন্ধনকে ছিন্ন করলেন। অন্তরঙ্গ অনুরাগের বন্ধনে তিনি সকলকে বাঁধলেন। তিনি জ্ঞান চান নি, শাস্ত্র চান নি। তিনি নিঃশব্দে ভাববিপ্লব করলেন। বর্তমান ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী মাথা চাড়া দেওয়ায় চৈতন্যদেবের মানুষে মানুষে মিলন স্মরণীয়। ডঃ দাসের বাস্তব বিশ্লেষণ বেতারের শ্রোতারা উপকৃত হয়েছেন।

(সত্যযুগ, রবিবার ৩০ মার্চ ১৯৮৬)

Simple teaching methods to promote Sanskrit

Calcutta june 17 (Staff Reporter): The importance of Sanskrit was emphasised by the different speeches at a function organised by Howrah Pandit Samaj yesterday. Eminent scholars explained the excellence of Kalidas works.

The Chief Guest Dr. kshudiram Das president of Bangiya Sanskrita Siksha Parishad said that according to Kalidas the prime concern of the king should be the welfare of his citizens. Dr Das also said Sanskrit should not be neglected because it was an ancient language. He felt it could be made easy with simple teaching methods.

Pandit Murari Mohan Vedantaditirtha Sastri. President of howrah Pandit Samaj, welcomed the guests. Announcing the award of "Sahitya Ratna" to Dr Kshudiram Das, he said that the Samaj honoured talents irrespective of caste and creed Scrolls of honour were given to Mr. Rathin Sen Gupta, Chief Secretary, Government of West Bengal, Mr Ramkrishna Shastri, Mr prabuddha Laha, Mr Haradhan Bandopadhaya and Mr Sachidulal Baisnab.

Mr Partha Sarathi Choudhury, Secretary Information, Government of West Bengal, Mr Tusher Kanti Kabyatirtha, Dr Narayan Bhattacharya, Professor Pranab Roy and Mr Arun Sircar also spoke on the occasion.

(Amrita Bazar Patrika, Friday 19 june 1987)

সমাবর্তন

রবীন্দ্রচর্চাভবন

(টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট)

সকাল দশটা। ২৪ শে মার্চ ১৯৯১

শিশির মঞ্চ। কলকাতা তথ্যকেন্দ্র।

প্রস্তাব- মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মেঘদূতের সঞ্জীবনী টীকাকার মল্লিনাথ টীকার আরম্ভে বলেছিলেন, এখানে মূলের সঙ্গে যোগহীন কিছু লেখা হয়নি, অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত কিছু বলা হয়নি। এই আদর্শকে সম্মুখে রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস দীর্ঘকাল রবীন্দ্রসাহিত্যের, বিশেষভাবে রবীন্দ্রকবিতায় আলোচনা করে চলেছেন। মূল রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে যোগ রেখে, অনপেক্ষিতের আশ্রয় না নিয়ে, তিনি রবীন্দ্রকবিতার সৌন্দর্যলোকের পথ পাঠকের জন্য অবারিত করেছেন। পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার আলোয় রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি, কল্পনা ও মননের স্বরূপ তিনি দেখান নি। কবিকে তাঁর স্বরূপে তিনি দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রকবিতায় দেশীবিদেশী প্রভাব নির্ণয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতি তিনি পরিহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বধর্মের প্রেরণায় কিভাবে দেশীবিদেশী সাহিত্য ও মননের বিপুল সম্পদকে আত্মস্থ করতে করতে অগ্রসর হয়েছেন, কিভাবে এই স্বীকরণ প্রক্রিয়ার তাঁর অনন্যপরতন্ত্রতার পরিচয় পাই, কিভাবে তথাকথিত প্রভাব তাঁর ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত স্বভাব হয়ে ওঠে- এই সবই অধ্যাপক দাসের অতন্দ্র মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তিনি জানেন, ভাব ও রূপ দুয়েরই আলোচনা কবিতার আস্বাদনের জন্য অপরিহার্য। কবিতার শব্দার্থময় কথা শরীরেই তার আত্ম ভাবরূপ পায়। এভাবেই নির্বিশেষ নিরাকার ভাব একটি বিশেষ রূপের মধ্যে ধরা দিয়ে কবিতা হয়ে ওঠে। তাই কবিতার বিশেষ শব্দ, ছন্দ, স্তবকগঠন, মিল বিন্যাস, অলংকারের সঙ্গে কবিতা। বিশেষের ভাবের অন্তর্গূঢ় যোগ বিষয়ে তিনি আমাদের অবহিত করেছেন। এজন্যই কবিতার রূপসৃষ্টির আলোচনায় তিনি উৎসাহী হয়েছেন। পরিণামমুখী রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার ঐক্যসূত্র নির্ণয়ও তিনি যেমন করেছেন, কবিতা ধরে ধরে তার সৌন্দর্য আলোচনাও তেমনি করেছেন। আবার একই সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের মননের দিগন্তও তাঁর আলোচনায় আলোকিত হয়েছেন। কিন্তু সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের উপরই গুরুত্ব পড়েছে। তিনি বারবার দেখাতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি- মর্ত্যপ্রেমিক জীবনপ্রেমিক কবি। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর তাঁরই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আমাদের পরিচিত কোনও ধর্মের ঈশ্বর নন, কোনও প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থের ঈশ্বর নন। দেশ, সমাজ ও অর্থনীতির প্রগতিবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী ভাবনাচিন্তা ও কর্মের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান রবীন্দ্রকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছেন নব নব রূপসৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের মহাজাগতিক কল্পনার মূলে ছিল মহাকাশবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অধ্যায়ন।

অধ্যাপক দাস আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবির অধ্যায়ন তাঁর কবিতা ও গানকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে- এ বিষয়ে আলোচনায় এক স্বল্পালোচিত দিকে আমাদের জিজ্ঞাসু করে তুলেছেন। তাঁর এইসব বহু বিষয়ে অধ্যয়ননিষ্ঠ, অনুভববেদ্য রবীন্দ্রচর্চায় স্বীকৃতিতে আজকের সমাবর্তনে আপনি তাঁকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করুন।

সভাপতি- অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, আপনি রবীন্দ্রচর্চাকে গভীর করেছেন, মননের দৃঢ়ভূমির উপর স্থাপন করেছেন, আবার তাকে নানা দিকে প্রসারিত করেছেন। আপনি সংস্কৃতসাহিত্যে কৃতবিদ্য রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগের প্রসঙ্গটি যথাচিত গুরুত্বের সঙ্গে আপনার রচনায় আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের উদ্‌ধৃতি রবীন্দ্রনাথ মূল অর্থে নেন নি, তিনি তাঁর নিজের মত করে নিয়েছেন। বৈষ্ণব কবিতার ভাষাভঙ্গি ও রূপনির্মাণকৌশল তাঁকে আকৃষ্ট করলেও বৈষ্ণবদর্শন থেকে রবীন্দ্রভাবনার দুস্তর দূরত্ব। এইসব অভিমত আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে আপনি আধুনিক মন দিয়ে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দর্শনের সঙ্গে আপনি সুপরিচিত। রবীন্দ্রসমকালীন সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ে আপনি মনোযোগী। আবার আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণেও আপনি আগ্রহী। তার আলোকে রবীন্দ্রকবিতা ও সংগীতের আলোচনায় আপনি ব্রতী হয়েছেন। এদেশের দুর্গতি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনা আপনার সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগিয়েছে। ভাষা, ছন্দ, অলংকার, কাব্যতত্ত্ব সাহিত্য সংশ্লিষ্ট এ সব ক্ষেত্রে আপনার অভিনিবেশ রবীন্দ্রকবিতার মর্মলোকে প্রবেশের সহায়ক হয়েছে। জীবনচরিতের আলোকে, সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য বিচার কিছুদূর অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু এসব পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা আছে। আপনি তা মানেন। কবিতা তত্ত্ব নয়। প্রতিটি সৃষ্টির অনন্যতা তার রূপে। সেই অনন্যতা সন্ধানেই আপনার আগ্রহ। 'শব্দার্থের সাহিত্য' প্রদর্শনই আপনার লক্ষ্য। আপনার রবীন্দ্রগবেষণা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হোক্। আপনার রবীন্দ্রচর্চার আরও নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হোক্। আপনার নিরলস সাধনার বিনম্র স্বীকৃতির সুযোগ পেয়ে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট গৌরব বোধ করছে। আমি আপনাকে আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করছি।

রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন ক্ষুদিরাম দাশ, অশোক মিত্র

স্টাফ রিপোর্টারঃ রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন ক্ষুদিরাম দাশ ও অশোক মিত্র। '১৪০০ সাল ও চলমান রবি' বইটির জন্য পুরস্কার পাচ্ছেন ক্ষুদিরাম দাশ। 'তিন কুড়ি দশ' বইয়ের জন্য পুরস্কৃত হলেন অশোক মিত্র।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন গৌরীপ্রসাদ ঘোষ (মহাবিশ্বে মহাকাশ)। অন্যান্য ভাষা বিভাগে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে অতুল কুমার শূরকে (হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব বেঙ্গল)।

রাজ্য শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রতিবছর সেরা রচনার জন্য তিনটি বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেকটির নগদ অর্থমূল্য ১৫ হাজার টাকা। পুরস্কার দেওয়া হবে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব মঞ্চে।

ক্ষুদিরাম দাসঃ টেমার লেনের বাড়ির দোতলার ছোট ঘরে নাতিকে নিয়ে বসেছিলেন। একগাদা বই কাগজপত্র ছড়ানো। এলেন ওঁর পুত্রবধূ। মেয়ে এসে প্রণাম করে গেল। কিছুক্ষণ আগেই খবর পেয়েছেন। সবে প্রকাশক মল্লিক ব্রাদার্সের দোকান ঘুরে এসেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এখনও কর্মব্যস্ত। বয়স হয়েছে। কিন্তু অক্ষম নন।

পুরস্কারের কথা তুলতেই বললেন, খুশির ব্যাপার তো বটেই। বললেন, আমি সব থেকে খুশি অশোক মিত্রের 'তিন কুড়ি দশ' পুরস্কৃত হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে।

তবে রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর অনেক মূল্যবান বই ডঃ দাস আগেই লিখেছেন। সেই ১৯৫৩ সালে বেরিয়েছিল রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের পঠন-পাঠনে আজও যা অপরিহার্য। তারপর বেরিয়েছে চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার, সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব রস প্রকাশ, বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি, বানান বানানোর বন্দরে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী এবং বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ছাপা চলছে দেশকাল সাহিত্য। পুরস্কৃত 'চোদ্দশ' সাল ও চলমান রবি' "আমার প্রৌঢ় রচনার পরিচয় পাবেন।" নিঃসংকোচে স্বীকার করেছেন ডঃ দাস। মোট ২৪ টি আলোচনা আছে এই গ্রন্থে।

রোমান হরফে বাঙলা অভিধানে সম্পূর্ণ অভিনব একটি রচনার কাজ শেষ করেছেন। এখন তৈরী করছেন প্রেস কপি।

(প্রতিদিন, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪)

রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন ক্ষুদিরাম দাস, অশোক মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা, ২৮ শে এপ্রিল- এবছর রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন ৪ জন। বাংলা সাহিত্য বিভাগে পুরস্কার পাচ্ছেন যুগ্মভাবে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস এবং অশোক মিত্র। '১৪০০ সাল ও চলমান রবি' এই বইটি লেখার জন্য ক্ষুদিরাম দাস এবং 'তিন কুড়ি দশ' বইটি লেখার জন্য অশোক মিত্রকে পুরস্কার দেওয়া হবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা 'মহাবিশ্ব মহাকাশে' বইটির জন্য পুরস্কার পাচ্ছেন গৌরীপ্রসাদ ঘোষ এবং বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় হিস্টরি অ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল' বইটি লেখার জন্য পুরস্কার পাচ্ছেন ডঃ অতুলকুমার সুর। প্রতিটি পুরস্কার মূল্য নগদে ১৫ হাজার টাকা এবং একটি তাম্রপত্র। আগামী ৯ই মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে এই পুরস্কার প্রধান করা হবে। ঐ দিন রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপকদের পুরস্কৃত করা হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের এখবর জানান।

(গণশক্তি ২৯ শে এপ্রিল, শুক্রবার, ১৯৯৪)

রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন চারজন

স্টাফ রিপোর্টারঃ বৃহস্পতিবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ১৯৯৪ সালের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারের প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন। এ বছর বাংলা সাহিত্য বিভাগে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ও অশোক মিত্র (আই এ এস), বাংলা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় গৌরীপ্রসাদ ঘোষ এবং বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় লেখা সাহিত্যের জন্য ডঃ অতুল কুমার সুর রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মোলনে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী এক সাংবাধিক সম্মেলনে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করে বলেন, রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য পনেরো হাজার টাকা। এছাড়াও পুরস্কার প্রাপকদের তাম্রপত্র দেওয়া হবে। আগামী ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকে রবীন্দ্র জন্মোৎসব মঞ্চে পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। তিনি জানান ডঃ ক্ষুদিরাম দাস '১৪০০ সাল ও চলমান রবি' বই-এর জন্য, অশোক মিত্র 'তিন কুড়ি দশ' বই-এর জন্য, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ 'মহাবিশ্ব মহাকাশে' বই-এর জন্য এবং ডঃ এ কে সুর 'হিষ্টি অ্যান্ড কালচার অফ বেঙ্গল' লেখার জন্য এবার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন।

(বর্তমান, শুক্রবার ১৫ বৈশাখ ১৪০১)

রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন ক্ষুদিরাম দাশ, অশোক মিত্র

স্টাফ রিপোর্টারঃ ১৯৯৪ সালে রাজ্য সরকারের দেওয়া রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন চার বিশিষ্ট ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পুরস্কার যুগ্মভাবে দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদিরাম দাশ ও প্রাক্তন আই সি এস অশোক মিত্রকে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার ক্ষেত্রে এই পুরস্কার পাচ্ছেন গৌরীপ্রসাদ ঘোষ। বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় এই পুরস্কার পাবেন ডঃ অতুল শূর। আগামী ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক ক্ষুদিরাম দাশ এই পুরস্কার পাচ্ছেন '১৪০০ সাল চলমান রবি' বইটি রচনার জন্য। ডঃ অশোক মিত্রকে তাঁর 'তিন কুড়ি দশ' এই বইটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। গৌরীপ্রসাদ ঘোষ পুরস্কার পাবেন 'মহাবিশ্ব মহাকাশে' বইটির জন্য। এছাড়া ইংরাজিতে লেখা 'হিষ্ট্রি এ্যাণ্ড কালচার অফ বেঙ্গল'- এই বইটির জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে ডঃ অতুল শূরকে। এই পুরস্কারের মূল্য ১৫ হাজার টাকা ও একটি তাম্রপত্র।

এইদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যসাধনবাবু জানান, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে পর্ষদ গঠন করার প্রস্তাব এখনও চুড়ান্ত হয়নি। তবে এই পর্ষদের হাতে কোন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না। তিনি বলেন, পর্ষদ গঠন করা হবে বিভিন্ন শিক্ষক প্রতিনিধি, অধ্যাপক প্রতিনিধি, উপাচার্য অর্থ ও শিক্ষাসচিবসহ বিশিষ্ট

ব্যক্তিদের নিয়ে। মন্ত্রী জানান, এবার থেকে রাজ্যস্তরে অধ্যাপকদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

(যুগান্তর, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪)

১৯৯৪ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার

স্টাফ রিপোর্টারঃ ১৯৯৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন ডঃ অতুল সুর গৌরী প্রসাদ ঘোষ এবং যৌথভাবে ক্ষুদিরাম দাস ও অশোক মিত্র। আগামী ২৫ বৈশাখ রাজ্য সরকারের পক্ষে এই পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে এখবর জানানো হয়েছে।

এবার বাংলা সাহিত্যের জন্য যৌথভাবে এই পুরস্কার পাচ্ছেন '১৪০০ সাল ও চলমান রবি' গ্রন্থের জন্য ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এবং 'তিন কুড়ি দশ' গ্রন্থের জন্য প্রাক্তন আই সি এস অশোক মিত্র।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'মহাকাশে মহাবিশ্ব' এর জন্য গৌরীপ্রসাদ ঘোষ এবং বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল' গ্রন্থের জন্য অতুল সুর এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন।

(ওভারল্যাণ্ড, শুক্রবার ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪)

রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হলো

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা, ৯ই মে- পঁচিশে বৈশাখের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে ময়দানে এক অনুষ্ঠানে এবছরের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হলো চার ব্যক্তিত্যকে। এরা হলেন, ক্ষুদিরাম দাস, অশোক মিত্র,(প্রাক্তন আই সি এস), অতুল সুর এবং গৌরিপ্রসাদ ঘোষ। গৌরিপ্রসাদ ঘোঘ অবশ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেনি। ক্ষুদিরাম দাস ও অশোক মিত্র যুগ্মভাবে এই পুরস্কার পেলেন তাঁদের লেখা যথাক্রমে '১৪০০ সাল ও চলমান রবি' এবং 'তিন কুড়ি দশ' বইয়ের

জন্য। 'হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব বেঙ্গল' বইটির জন্য পুরস্কার পেলেন অতুল সুর। গৌরীপ্রসাদ ঘোষ পুরস্কার হয়েছেন 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' বইটির জন্য। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত তিন পুরস্কার প্রাপকের হাতে স্মারক পুরস্কার তুলে দিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষে ভূমি ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী এবং রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী বলেন, এই সম্মান জানাতে পেরে রাজ্য সরকার গৌরবান্বিত। যদিও যাঁরা এবছর পুরস্কার পেলেন, তাঁদের স্বীকৃতি এই সম্মানের উপর নির্ভর করে না। পাঠক সমাজে অনেক দিনই তাঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তবুও এই দিনটিতে তাঁদের রবীন্দ্র পুরস্কার ভূষিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত তিন পুরস্কার প্রাপকও বক্তব্য রাখেন। ৯১ বছর বয়সে সরকারী তরফে কেন এই পুরস্কার পাওয়া সে জন্য হয়তো বা কিছু অভিমান ছিলো অতুল সুরের। তাঁর বক্তব্যে তিনি তা প্রকাশও করেন। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে ড. অতুল সুরের কাছে অভিমান না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, সমাজের কাছে চিন্তা-বুদ্ধি-মননশীলতায় অবদানের জন্য আপনাদের স্বীকৃতি মিলেছে বহুদিন আগেই। তবুও বলি, রাজ্য সরকার তো পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঠিক করে না। এজন্য আলাদা বিচারক কমিটি আছে। তাঁদের সিদ্ধান্তই রাজ্য সরকার কার্যকর করে। ড. ক্ষুদিরাম দাস তাঁর ভাষণে বলেন, কাব্য সাহিত্য চর্চার গতি কম হলেও ক্ষতি নেই যদি তা ইতিহাস-সমাজ-বিজ্ঞানমুখী হয়। সেজন্য আমাদের খেয়াল রাখা দরকার। অশোক মিত্র রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার পেয়ে নিজে গৌরবান্বিত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন।

এর আগে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমানে সুকৌশলে যখন নানা দিক থেকে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার বিজ্ঞান-বিরোধী চেতনা প্রবেশ করানো হচ্ছে তখন সাহিত্যিকদের সমাজ ও বিজ্ঞানমুখী অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যসাধন চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান সঙ্কটের সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের লেখা ও কাজের দৃষ্টান্ত আমাদের বিচার বিবেচনায় চিন্তার খোরাক যোগায়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উচ্চ শিক্ষাসচিব দিলীপ ভট্টোচার্য।

(গণশক্তি, ১০ মে ১৯৯৪)

Rabandra purashkar awarded

News Bureau

West Bengal Minister for Land and Land Reforms Benoy Chowdhury said yesterday that people should develop the habit of reading books on diverse subjects in order to understand each other better.

Chowdhury was speaking at the award-giving ceremony of Rabandra Purashkar, 1994. He said the books, written by the receipients of the awards, were not only topical and informative, but reflected the depth of knowledge of the writers.

The Rabindra smriti Purahkar, for Bengali literature, was awarded jointly to Ashoke Mitra and Khudiram Das for their books, 'Tin Kori Das' and 'Choddosho Sal O Chalaman Rabindranath' respectively. Atul Sur and Gouri Prasad Ghosh were awarded prizes for their books 'History and culture of Bengali' and ' Mahabiswe Mahakashey ' Ghosh, however, could not attend the function.

(Amrita Bazar Patrika 10, May 1994)

আজকালের আয়না

সংবর্ধনা

রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ও ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন যে কয়জন বিশিষ্ট মানুষ, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তাঁদের অন্যতম। বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়েও তাঁর কাজ শুধু বিদগ্ধ মহলেই নয়, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পড়ুয়াদের মনেও বড়সড় জায়গা করে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি, কৃষ্ণনগর, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি কলেজ হয়ে তাঁর অধ্যাপনার জীবন ছড়ানো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও। এখানে তিনি একসময় রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকও ছিলেন। কাজের স্বীকৃতিতে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্র পুরস্কার। সম্প্রতি এই বিদগ্ধ মানুষটি পা রাখলেন ৮০ বছরে। এখনও তিনি

সমান কর্মঠ। এই বয়সেও হাত দিয়েছেন 'বিজ্ঞানভিত্তিক বাংলা অভিধান' ও সাঁওতালি বাংলা অভিধান' তৈরির মত কঠিন অথচ দারুণ কাজে। আগামী ৫ জানুয়ারী দুপুর ২টোয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে তাঁকে জানানো হবে সংবর্ধনা। ওই দিনই প্রকাশিত হবে 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' নামে একটি বইও।

(আজকাল, ১ জানুয়ারি ১৯৯৬)

শিক্ষক

কিছুকাল আগেও শিক্ষকতা বা অধ্যাপনার জীবন এক বিদ্যার্থীর কাছে ছিল পরমকাঙিক্ষত । কারণ, সেখানে মানবিক শক্তি নিয়েই তো অধ্যাপকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই লুপ্তপ্রায় ঈর্ষাযোগ্য নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী গুরুকুলের অন্যতম অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস সম্প্রতি আশি বছর পূর্ণ করলেন। বাঁকুড়ার নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ঘরের সন্তান ক্ষুদিরাম দাস বহুৎ লড়াই করে ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন; পকেটে মাত্র ন-আনা পয়সা সম্বল করে এই শহরে এসেছেন স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের আশায়। সাম্মানিক সংস্কৃত সহ গ্রাজুয়েট ক্ষুদিরাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়েছেন, পাঁচটি স্বর্ণপদক একটি রৌপ্যপদকও লাভ করেছেন। গবেষণায় আগ্রহ দেখাতে আচার্য সুনীতিকুমার যথার্থ বলেছিলেন, উনানে হাঁড়ি চড়িয়ে যাকে তণ্ডুলের সন্ধান করতে হয় তার পক্ষে গবেষণা সম্ভব হবে না। বিশ বছর পরে ক্ষুদিরাম দাস বাংলা সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি-লিট পেলেন। চল্লিশ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, বাংলা বানান ইত্যাকার বিষয়ে সুপ্রচারিত গ্রন্থাদি রচনা করেছেন; একাধিক পুরষ্কার এবং অভিনন্দনে বৃত হয়েছেন; আপাতত তিনি আকৈশোরের বাসনাপূরণের সাঁওতালী বাংলা শব্দসাম্য রচনায় ব্রতী। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে অধ্যাপনার কালে বেশ কিছু প্রতিভাবান ছাত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, গতকালের বহু মনস্বীর সংস্পর্শেও এসেছেন। সম্প্রতি মানস মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস’ গ্রন্থে তাঁর সহকর্মী, প্রাত্তন ছাত্র এবং গুণমুগ্ধদের রচনা সংকলিত হয়েছে; তৎসহ আছে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের কিছু রচনা, স্মৃতিচর্যা ভাষণ এবং সাক্ষাৎকার। স্বভাবতই অধ্যাপকের জীবনচর্যা আর স্মৃতিকথা অধিক সুখপাঠ্য, সেইসঙ্গে বলা যায় এমন গ্রন্থ এই বঙ্গের বিগতকালের বিদ্যাচর্চার এক রক্ষণযোগ্য দলিল হয়ে রইল।

(কলকাতার কড়চা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭৪ বর্ষ ৩০৮ সংখ্যা সোমবার ৮ মাঘ ১৪০২)

ক্ষুদিরাম দাস সম্বর্ধিত

স্টাফ রিপোর্টারঃ শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে থেকে রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ও ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। সম্প্রতি ক্ষুদিরামবাবু আশি বছর বয়স পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ এদিনের সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল। সভায় বক্তা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, সহ উপাচার্য প্রবুদ্ধনাথ রায়, কবি নীরেন চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সভাতে উপাচার্য বাংলার বিভাগীয় প্রধান মানস মজুমদার সম্পাদিত 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ সহ ডঃ দাসের বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সভাতে উপস্থিত ছিলেন।

(প্রতিদিন, শনিবার ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬)

প্রবীণ গবেষক ক্ষুদিরাম দাস সংবর্ধিত

স্টাফ রিপোর্টারঃ ক্ষুদিরামবাবু কখনো ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াননি। অধ্যাপক হিসাবে যেমন আকর্ষক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তেমনি ছিলেন ব্যক্তি মানুষটিও। ছাত্রছাত্রীদের তিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনের অনুভবে নির্বিচারে কাছে টেনে নিতেন। ক্রান্তিকালের বাংলার অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যথার্থ মর্যাদাবোধ গড়ে তুলেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে খ্যাতনামা রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ও ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে শুক্রবার এক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত গুণমুগ্ধরা একথা বলেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্পতরু সেনগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, ডঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ।

(কালান্তর, ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬)

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সংবর্ধিত

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা জানায়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, শ-উপাচার্য ডঃ প্রবুদ্ধনাথ রায়, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(বর্তমান, মঙ্গলবার ২৪ পৌষ ১৪০২)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতাঃ প্রখ্যাত রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীদের পক্ষে থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে একটি সংবর্ধনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ডঃ প্রবুদ্ধনাথ রায়। তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতির রোমন্থন করে অধ্যাপক দাসের পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ শক্তির প্রশাংসা করেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ক্ষুদিরামবাবু যে সাঁওতালী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেছেন, তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইহিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করলো। বিশিষ্ট অতিথি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, এই সময়ে আমরা যারা লেখাপড়া করে চলেছি, তারা কোনও না কোনওভাবে অধ্যাপক দাসের ছাত্রতুল্য। কল্পতরু সেনগুপ্ত বলেন, এই সংবর্ধনাসভাই প্রমাণ করে দিল যে সমাজে প্রকৃত শিক্ষাবিদের আজও সম্মান আছে। সাংবাদিক কৃষ্ণ ধর অধ্যাপক দাসের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করে বলেন, পাণ্ডিত্য অধ্যাপক দাসের হৃদয়বত্তাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। মানুষ হিসাবেও তিনি অতুলনীয়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ক্ষুদিরামবাবুর শিক্ষণ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি তুলে ধরেন। সংবর্ধনাসভা উপলক্ষে ‘পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশ করে উপাচার্য ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু বলেন, অধ্যাপক দাসকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে তাঁর ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীরাই সম্মানিত হলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, কনক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

(যুগান্তর, রবিবার ৭ জানুয়ারি ১৯৯৬)

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের সংবর্ধনা

সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের আশি বছর বয়ঃপূর্তিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও গুণমুগ্ধ অনুরাগীবৃন্দ। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' নামক স্মারক গ্রন্থের উদ্বোধন করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু।

প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের এই সংবর্ধনা সভায় বিশিষ্ট বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ডঃ দাসের রবীন্দ্র গবেষণা, ভাষাজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ, মধ্যযুগ নিয়ে তাঁর আলোচনা প্রভৃতি বিষয় সবিস্তারে তুলে ধরছিলেন। তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের আলোচনায় তাঁর অধ্যাপনা, নিরহঙ্কার ব্যবহার, পাণ্ডিত্য, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথাই বারবার আলোলিত হচ্ছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাংবাদিক কৃষ্ণ ধর, অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখসহ আরও অনেকেই। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় পৌরোহিত্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ডঃ প্রবুদ্ধনাথ রায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মানস মজুমদার।

এই সংবর্ধনা সভায় গুণমুগ্ধ অনুরাগী ও ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের হাতে দানপত্র সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেন। উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু তাঁর কলেজজীবনের মাস্টারমশায় অধ্যাপক দাসের হাতে সাঁওতালি-বাংলা অভিধান প্রকাশের সহায়তার জন্য এক হাজার এক টাকার চেক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে তুলে দেব।

অনুষ্ঠানে প্রকাশিত 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' বইটি স্মৃতিচারণা এবং তাঁকে তাঁর লেখালেখি নিয়ে একটি সুন্দর সংকলন। বইটির লেখকদের মধ্যে আছেন, অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ অরুণকুমার বসু, ডঃ শিশিরকুমার দাশ, ডঃ সুধীর চক্রবর্তী, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, ডঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, ভারতী দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। বইটির সম্পাদনা করেছেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক মানস মজুমদার।

সংবর্ধনার উত্তরে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন যে, তিনি এই সম্মান ও সংবর্ধনা পেয়ে অভিভূত। বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখায় তাঁর সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে ,তা তাঁর মতে তথ্যনিষ্ঠ ও যথাযথ।

(যুবমানস ফেব্রুয়ারি ৯৬)

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস আশি বছর

গত জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে বিশিষ্ট রবী্ন্দ্র বিশেষজ্ঞ, ভাষাতত্ত্ববিদ ও প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের আশি বছর পূর্তিতে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীরা তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' নামে একটি স্মারক গ্রন্থের উদ্বোধন করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু।

প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের এই সংবর্ধনা সভায় বিশিষ্ট বক্তা ও তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা তাঁর রবীন্দ্রচর্চা, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা, ছাত্রপ্রী্তি, অধ্যাপনা, নিরহঙ্কার ব্যবহার, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন সবিস্তারে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত ও কবি কৃষ্ণধর প্রমুখ অনেকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ডঃ প্রবুদ্ধনাথ রায়। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ মানস মজুমদার।

এই সংবর্ধনা সভায় ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের গুণমুগ্ধ অনুরাগীরা তাঁর হাতে মানপত্র সহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক দাসের ছাত্র, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু অধ্যাপক দাসের সাঁওতালি- বাংলা অভিধান প্রকাশের সহায়তায় জন্য তাঁর হাতে এক হাজার এক টাকার একটি চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রকাশিত 'পথের ছায়াছবিতে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস' বইটিতে স্মৃতিচারণ এবং তাঁর লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শিশিরকুমার দাস, শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ অরুণ কুমার বসু, ডঃ সুধীর চক্রবর্তী, ডঃ জ্যোতির্ময়

ঘোষ, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, ডঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বইটির সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক মানস মজুমদার।

সংবর্ধনার উত্তরে ডঃ দাস আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন যে, তিনি অভিভূত। তাঁর সম্পর্কে বক্তৃতা ও লেখায় যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা তাঁর মতে অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ ও যথাযথ।

(নন্দন, মে ১৯৯৬)

গুণী সংবর্ধনা

আজকালের প্রতিবেদনঃ আজ বইমেলা মঞ্চে বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি প্রসার সমিতির উদ্যাগে গুণিজন সংবর্ধনা। সংবর্ধিত হচ্ছেন, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, সুধী প্রধান, ক্ষুদিরাম দাস, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণলাল দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতি শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রধান অতিথি আজিজুল হক। অনুষ্ঠানের শুরু দুপুর দুটোয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অশোক পালিত, শৈবাল মিত্র।

(আজকাল, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬)

বই মেলায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা ৩রা ফেব্রুয়ারী- শুক্রবার বইমেলা ছিল উপচে পড়া ভিড়। বইপ্রেমীরা এক স্টল থেকে আর এক স্টলে ঢুঁ মেরেছিল বই-র সন্ধানে। এর পাশাপাশি বইমেলার অডিটোরিয়ালে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি প্রসার সমিতির উদ্যোগে এদিন অনুষ্ঠিত হয় গুণীজন সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধী প্রধান, অরুণ মিত্র, ক্ষুদিরাম দাস, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

(গণশক্তি, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬)

বিশিষ্ট লেখক ও শিশু চিত্র শিল্পীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ কলকাতাঃ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে ১২ই আগস্ট নাগরিক সম্মেলনের ৪০নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুচিত্র শিল্পী সম্রাট চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে এবং শিশু শিল্পী সম্রাট চ্যাটার্জিকে স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন যথাক্রমে মণীন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরী এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ আবিরলাল মুখার্জি। অনুষ্ঠানে সংগঠিত আবৃত্তির সকল প্রতিযোগিতাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পীদের গান ও একটি গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ৪০ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান হয় ৩১ শে জুলাই।

(গণশক্তি, ১৩ আগস্ট ১৯৯৬)

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙঘঃ ২৫

আজকালের প্রতিবেদনঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে পঁচিশ বছর পেরিয়ে এল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙঘ। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রসদন চত্বরে সঙেঘর চতুর্থ(নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হল। এর আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক শোভাযাত্রা রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে এসে পৌছোয়। মুক্তমঞ্চে সঙেঘর সভাপতি ক্ষুদিরাম দাশের মেরুন পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘নানা প্রতিকুলতার মধ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে সম্বল করে সেই ১৯৭২ সাল থেকে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি।’ অন্য আর-এক সাধারণ সম্পদক নেপাল মজুমদার ‘যেখানে অন্যায় সেখানেই প্রতিরোধ’- এই মূলমন্ত্র আজও অব্যাহত বলে জানালেন। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল সমাজের প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে লেখক-শিল্পীদের এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তায় কথা। কবি অরুণ মিত্র বললেন, সমাজের অশুভ বিষয়কে প্রতিরোধ করতে না পারলে মানবধর্ম বিলীন হয়ে যাবে। উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানালেন, নজরুলের মত দীপ্ত কণ্ঠস্বর চাই এখনকার কবিদের। এদিন রজতজয়ন্তী উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন জোছন দস্তিদার, রাজেশ্বর

ভট্টচার্য, শুভেন্দু মাইতি, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, শুভ নন্দী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অজিত পাণ্ডে-সহ আরও বহু মানুষ।

(আজকাল, ২৩ মে ১৯৯৭)

রাজ্যের সব টোল মুমূর্ষু, আধুনিক গুরুকুলই মাথা তুলে

ড. ক্ষুদিরাম দাস বললেন, 'আমি নিজে টোলে পড়েছি। এখন সেই চরিত্র নেই। সংস্কৃত শিক্ষার আদি স্থান হল গুরুকুল। আগের আমলে রাজা, জমিদাররা গুরুকুল চালাতে সাহায্য করতেন। এখন সেই দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। এলাকায় যত্রতত্র গড়ে ওঠা ৮-১০ টোল নিয়ে করতে হবে একটি সংস্কৃত স্কুল আর যে সব সাধারণ স্কুলে দুপুরে ক্লাস হয় সেখানে ওই সংস্কৃত স্কুল সকালে বসবে। পাঠ্যসূচিতে আধুনিক বিষয়ও রাখতে হবে। সব শিক্ষক, তাঁদের উওজুক্ত বেতনহার, নিয়মিত পরীক্ষা, স্কুলে পরিদর্শনের জন্য দুটি জেলা-পিছু একজন পরিদর্শক দরকার। এছাড়া এখনই চালু করতে হবে ডঃ ভবতোষ দত্ত এবং ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ। অর্থাৎ স্কুলে বাংলা ভাষার জন্য বরাদ্দ ২০০ নম্বর থেকে ৫০ নম্বর সংস্কৃতে আবশ্যিক করা। না হলে সংস্কৃত হারিয়ে যাবে শুধু নয়, বাংলা ভাষার ভিত দূর্বল হবে। সরকারি অনুরোধে এ ব্যাপারে বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়েছি। কোনও সাড়া মেলেনি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুকোমল চৌধুরির সাফ কথা, 'স্কুল থেকে আবশিক সংস্কৃত শিক্ষা তুলে দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত। ক্লাস এইট থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আবার সংস্কৃত আবশ্যিক করতে হবে। অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশমত সংস্কৃতের জন্য কম নম্বরের ব্যবস্থা-সংস্কৃত বাঁচানোর এটাই অক্সিজেন।

(আজকাল, বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই ১৯৯৭)

সংস্কৃত কলেজ ১০ জন বিশিষ্টকে সম্মান জানাবে

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সংস্কৃত কলেজের ১৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হবে। এঁদের মধ্যে আছেন ভি বালসারা, উস্তাদ আমজাদ আলি, জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস।

বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কলেজের পক্ষে ডঃ সুকোমল চৌধুরি জানান, ১৭৫ বর্ষে এই সরকারি কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ কলেজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন। রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করছে। উল্লেখ্য, আগে এটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ থাকলেও ১৯৫০ সাল থেকে সংস্কৃত কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

ডঃ চৌধুরি জানান, ১৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভাশঙ্কর মিশ্র। ২২ মার্চ কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের শতবর্ষ পালন করা হবে।

(বর্তমান , বৃহস্পতিবার ৫ চৈত্র ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ১৯ মার্চ ১৯৯৮)

Sanskrit College felicitations

Calcutta, March 18: Sanskrit College will endow special titles on 10 eminent personalities in different spheres including Ustad Amjad Ali and V Balsara for music on March 22 on the occasion of its 175 th foundation day celebrations. Other recipients of tha special titles include Dr Pratap Chandra Chander, former central minister in-charge of education, Prof. Khudiram Das, a Bengali scholar, and Prof. Hemanta Kumar Ganguly , a Sanskrit scholar.

The principle of the college Dr S. Chaudhuri, said the three-day celebrations beginning from March 21 will include an exhibition on the history of the college. He also said the college had submitted a proposal to the government a few months ago to grant it autonomy. At present Sanskrit College is attached to Presidency College and only offers Honours and Pass courses in Sanskrit, Pali, Linguistics and Ancient Indian History and world History. For the rest of the subjects, students have to go to Presidency College.

(The Telegraph, 19 march, 1998)

১৭৫ বছরে প্রেসিডেন্সির কবলমুক্ত সংস্কৃত কলেজ?

আজকালের প্রতিবেদনঃ পৌনে দুশো বছরের প্রাচীন সংস্কৃত কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে একটি পৃথক কলেজের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তাব পাঠানো হল রাজ্য সরকারের কাছে। ১৭৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে এই প্রস্তাব রাখলেন সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ। বুধবার এক সাংবাধিক বৈঠকে কলেজের অধ্যক্ষ সুকোমল চৌধুরী একথা জানিয়ে বলেন, ১৮২৪ সালে একটি পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৫০ সালে তা প্রেসিডেন্সি কলেজের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তিনি জানান, প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান সংস্কৃত কলেজ থেকে টোল উঠে যাচ্ছে বলে যা রটছে, তা আদৌ ঠিক নয়। বরং এই প্রাচীন ধারাকে ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। স্নাতকস্তরে সংস্কৃত, পালি, ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস পড়ানোর পাশাপাশি চতুষ্পাটিতে প্রাচীন প্রথায় সংস্কৃতশিক্ষার ধারা সমান গুরুত্বের সঙ্গেই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই কলেজে। ২১ মার্চ শুরু হচ্ছে কলেজের ১৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠান। তিনদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রভাশঙ্কর মিশ্র। ১৯৩১ সালে কলেজের অষ্টম প্রতিষ্ঠাবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'কবি সার্বভৌম' উপাধির মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনের সূচনা হয়েছিল। এরপর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, দিলীপকুমার রায়, সত্যেন বসু, রমেশ মজুমদারসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে কলেজের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়েছে। এবার ১৭৫ বছর পূর্তিতে এই তালিকায় রয়েছেন ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এঁরা হলেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, হেমন্তকুমার গাঙ্গুলি, বই এন মুখার্জি, রমারঞ্জন মুখার্জি, মুরারিমোহন বেদান্ততীর্থ, শ্রী মোহনতর্কতীর্থ, ভি বালসারা, আমজাদ আলি খান, ক্ষুদিরাম দাস ও জেনেরেল শঙ্কর রায়চৌধুরী।

(আজকাল, বৃহস্পতিবার ৫ চৈত্য ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ১৯ মার্চ ১)

সংস্কৃত কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা, ২২ শে জুন- সংস্কৃত কলেজকে 'ডমড্' বিশ্ববিদ্যালয় করতে চায় বামফ্রন্ট সরকার। এ ব্যাপারে ইউ জি সি-র অনুমোদনের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী নিজে এ ব্যাপারে ইউ জি সি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা

করেছেন। সংস্কৃত গবেষণা ও প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারকে যথাযথভাবে উন্মোচন ও বিশ্লেষণের জন্যেই রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সংস্কৃত কলেজে এক অনুষ্ঠানে সত্যসাধন চক্রবর্তী সংস্কৃত শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে এই খবর জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের মোট ৩১০ জন বিশিষ্ট ও প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিতকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। মানপত্র ও ১২০০ টাকার চেক। সত্যসাধন চক্রবর্তী বিশিষ্ট ৭ জনকে সংবর্ধনা জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক ক্ষুদিরাম দাস, সংস্কৃত সাহিত্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুরারীমোহন বেদান্ত তীর্থ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুকোমল চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তা পীযূষকান্তি গাঙ্গুলি।

(বর্তমান, ২৩ শে জুন ১৯৯৮)

পড়ে গিয়ে আহত ক্ষুদিরাম দাশ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা, ২৩ শে এপ্রিল- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ দুঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। গত শনিবার কৃষ্ণনগরের বাড়িতে হঠাৎই পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের হাড়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তাঁকে কৃষ্ণনগরে একটি নাসিং হোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁকে বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকতে হবে।

(গণশক্তি ২৪ শে এপ্রিল, বুধবার, ২০০২)

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মারা গেলেন

আজকালের প্রতিবেদনঃ রবিবার রাত ১১টা ১০ মিনিট মারা গেছেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস (৮৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ দাস ফিমার বোন ভেঙে কৃষ্ণনগরের কায়কল্প সদন নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। তাঁর ৭ মেয়ে ৩ ছেলে রয়েছে। ওঁর স্ত্রী অনেক আগেই মারা যান। ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম দাস। পেয়েছিলেন পাঁচটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্য পদক। এম এ পাস করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন। কৃষ্ণনগর সরকারী

মহাবিদ্যালয় ও ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল কলেজে পড়িয়েছেন। ওঁর বই 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' প্রথম ডি লিট প্রাপ্ত বাংলা বই। সাঁওতালি বাংলা শব্দ সাম্য ওরই কাজ। ওঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্খ ঘোষ, মানস মজুমদার প্রমুখ।

(আজকাল ২৯ এপ্রিল ২০০২)

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগরঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রবীন্দ্র গবেষক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস রবিবার গভীর রাতে কৃষ্ণনগরের এক বেসরকারী নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। তাঁর তিন পুত্র ও সাত কন্যা বর্তমান। সোমবার প্রয়াত ডঃ দাসের বাসভবনে এসে জড় হয়েছিলেন তাঁরই গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা। এদিন মরদেহে মালা দেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা সাহিত্যে ডি লিট উপাধি পান। ১৯৮৪ সালে তিনি বিদ্যাসাগর পুরস্কার এবং ৯৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

(বর্তমান, ৩০ এপ্রিল ২০০২)

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস চলে গেলেন

স্টাফ রিপোর্টারঃ প্রখ্যাত রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস রবিবার গভীর রাতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ক্ষুদিরামবাবুর তিন পুত্র এবং সাত কন্যা বর্তমান। প্রেসিডন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে তিনি পরবর্তীকালে একাধিক কলেজে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। ১৯১৬ সালে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে ক্ষুদিরাম দাসের জন্ম হয়। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম গবেষণাপত্র জমা দিয়ে তিনি ডি-লিট উপাধি পান। পরবর্তীকালে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪ সালে বিদ্যাসাগর পুরস্কার এবং ১৯৯৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করে। এছাড়াও ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক পুরস্কার পান তিনি। ১৯৯৫ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার পান তিনি। কিছুকাল আগে কৃষ্ণনগরের বাসভবনে পড়ে গিয়ে তাঁর কোমরের হাড় ভেঙে যায়। পরে কিডনি বিকল হয়ে যায়। রবিবার রাত ১১-২০ মিনিটে কৃষ্ণনগরের বাসভবনেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েন তিনি। তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, চিত্র গীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, বৈষ্ণব রসপ্রকাশ, সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ, সাঁওতালী বাংলা সমশব্দ অভিধান ইত্যাদি। প্রথম গবেষণাপত্র রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় লিখেই তিনি ডি-লিট পেয়েছেন।

(প্রতিদিন, মঙ্গলবার, ৩০ এপ্রিল ২০০২,)

Bengali scholar dies in Nadia

HT Correspondent

Ranaghat, April 29

Khudiram Das (87) , the first D Litt in Bengali Literature from Calcutta University, died at a nursing home following kidney and respiratory ailments in krishnanagar on Sunday night.

He has left behind three sons and seven daughters. State CPI (M) Secretary Anil Biswas and Left Front Chairman Biman Bose visited Das's residence to pay their last respects.

Family sources said Das, who was admitted to the nursing home in Krishnanagar some days back after a leg fracture, developed complication on Saturday.

Born on October 9, 1916, Das received a D Litt. From the Calcutta University for his Bengali book Rabindra Pratibhar Parichay (An introduction to Tagore's genius) in 1962.

ফুলমালা শ্রদ্ধায় শেষকৃত্য সম্পন্ন ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের

অমিত করঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া), ২৯ শে এপ্রিল- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গ্রন্থকার ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের শেষকৃত্য সোমবার সম্পন্ন হয়েছে নবদ্বীপ শ্মশানে। রবি্বার রাতে কৃষ্ণনগরের একটি নার্সিংহোমে তাঁর জীবনবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। রবিবার গভীর রাতে মাস্টারমশাই ডঃ দাসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গভীর শোকপ্রকাশ করেন সি পি আই (এম)-র রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ও বামফ্রণ্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এদিন সকালেই কৃষ্ণনগর রওনা হন অনিল বিশ্বাস।

ডঃ দাসের মরদেহ সোমবার সকালে নার্সিংহোম থেকে চৌধুরীপাড়ার বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। তাঁরই সযত্নে লালিত বাগানে তাঁকে শায়িত রাখা হয়। সেখানে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মৃদুল দে, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি রাধানাথ বিশ্বাস, প্রাক্তন সংসদ অজয় মুখার্জি, মন্ত্রী নয়ন সরকার, অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ লেখক শিল্পী সঙেঘর অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ডি ওয়াই এফ আই-র তাপস সিন্হা, অলকেশ দাস, এস এফ আই-র অরূপ দাস, সি আই টি ইউ-র এস এম সাদি, পার্টি নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক ব্যানার্জি, মহিলা সমিতির পক্ষে রমা বিশ্বাস, ছায়া চক্রবর্তী, রীতা চ্যাটার্জি, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে দিলীপ চক্রবর্তী, তাঁর কন্যা অধ্যাপিকা ভারতী বাগচী প্রমুখ।

দীর্ঘদিন ডঃ দাস ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর সভাপতী। এছাড়া আমৃত্যু তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগর নাগরিক সমিতির সভাপতি। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সক্রিয় সদস্যও ছিলেন।

এদিন তাঁর মরদেহ পৌছানোর পর এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষের ভিড়ে ভরে যায় বাসভবন। সকলেই তাঁদের প্রিয় মাস্টারমশাইকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। দুপুরে তাঁর মরদেহ নিয়ে অনুরাগী মানুষের সুশৃঙ্খল শোকমিছিল

রওনা হয় নবদ্বীপ শ্মশানের দিকে। পথে শক্তিমন্দির, বিজয়লাল কলেজ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, জেলা পরিষদ দপ্তর ঘুরে নবদ্বীপের শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু তাঁর জরুরী কাজের জন্য কৃষ্ণনগরে না আসতে পারায় তাঁর শ্রদ্ধায় মাস্টারমশাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিতভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, প্রণোচ্ছল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের জীবনবসানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙঘ মর্মাহত, শোকস্তব্ধ। তিনি একজন আকর্ষক শিক্ষাবিদ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনা ও দর্শনের বৈজ্ঞানিক গবেষক ও বিশ্লেষক, সাঁওতালী ও বাংলা ভাষার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি নিয়ে বিশাল অভিধান রচনায় ক্লান্তিহীন বিশ্লেষক ছিলেন। বামপন্থার প্রতি একনিষ্ঠ ঝোঁক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে প্রদীপ্ত এক সত্তা বাংলার সমাজ-সাহিত্য-গবেষণা ও সংস্কৃতিক আন্দোলনে যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা দেশ ও সমাজের কাছে মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে।

(গণশক্তি ৩০ শে এপ্রিল)

ড. ক্ষুদিরাম দাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন

অমিতকুমার ঘোষঃ কৃষ্ণনগর, ২৯ এপ্রিল- সোমবার যথোপযুক্ত মযার্দার সঙ্গে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গ্রন্থকার ড. ক্ষুদিরাম দাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল নবদ্বীপে। এদিন সকালেই প্রয়াত ক্ষুদিরাম দাসের মরদেহ কৃষ্ণনগরের নার্সিংহোম থেকে নিয়ে আসা হয় চৌধুরিপাড়ায় বাসভবনে। সেখানে তাঁর প্রিয় বাগানে শায়িত ছিল শিক্ষাবিদের মরদেহ। সকালেই কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরের ছুটে আসেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তিনি ক্ষুদিরাম দাসের ছাত্র ছিলেন। অনিলবাবু মরদেহ মাল্যদান করেন। মালা দেন সি. পি. এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মৃদুল দে। মন্ত্রী নয়ন সরকার, জেলা সভাধিপতি রাধানাথ বিশ্বাস-সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। শিক্ষাবিদের মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল কৃষ্ণনগর নাগরিক সমিতির অফিস জেলা পরিষদ ভবন

প্রদক্ষিণ করে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এদিন নিজে কৃষ্ণনগরে আসতে না পারলেও তিনি লিখিতভাবে তাঁর শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, শিক্ষাবিদ ড. ক্ষুদিরাম দাসের জীবনাবসান হয়েছে রবিবার গভীর রাতে কৃষ্ণনগরের একটি নার্সিংহোমে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বুদ্ধিজীবী, গ্রন্থকার ক্ষুদিরাম দাস দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সক্রিয় সদস্য। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম দাস। বাঁকুড়া স্কুল এবং বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়া শেষ করে ১৯৩৯ সালে বি. টি. পাস করেন। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি পান। ক্ষুদিরাম দাসই প্রথম শিক্ষাবিদ যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনও গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ, সিটি কলেজ, উইমেন্স কলেজ, হুগলি কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন ১৯৭৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার-সহ বহু সম্মান লাভ করেছেন। কিছুদিন আগে পা ভেঙে যাওয়ায় কৃষ্ণনগরের একটি নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। শনিবার থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

(আজকাল, ৩০ এপ্রিল ২০০২)

ক্ষুদিরাম দাসের স্মরণসভা

আজকাল প্রতিবেদনঃ প্রয়াত ডঃ ক্ষুদিরাম দাস যেমন একদিকে ছিলেন সুপণ্ডিত কৃতী অধ্যাপক, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন একজন বলিষ্ঠ চিন্তার অধিকারী। সোমবার অবনীন্দ্র সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ আয়োজিত ক্ষুদিরাম দাসের স্মরণসভায় একথা বললেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক এবং ডঃ দাসের ছাত্র অনিল বিশ্বাস। অনিলবাবু বলেন, অধ্যাপক দাস কোনওদিন কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন প্রতিবাদী, সমাজসচেতন মানুষ। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তিনি বার বার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। কখনও নিজেকে গুটিয়ে রাখেননি। অন্যায় দেখে নিজেকে গুটিয়ে রাখাটা তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন। কৃষ্ণনগরে দেখেছি,

সরকারি কলেজের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও নির্ভয়ে বন্দী মুক্তি সভায় যোগ দিয়েছেন। আমি যখন বলতাম, স্যার, আপনার চাকরি চলে যাবে না? উনি বলতেন, চাকরি চলে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। জরুরি অবস্থার সময় অনেক অধ্যাপক আমাদের দেখলে সরে যেতেন, কিন্তু অধ্যাপক দাস আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরতেন। শরীরের খোঁজ নিতেন, কাজ কেমন চলছে জানতে চাইতেন। বামপন্থী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুসময়ে তিনি পড়াশোনায় নিবিষ্ট থাকতেন। আর দুঃসময়ে পথে নেমে আসতেন প্রতিবাদী হয়ে। গরিব মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ছিল। নিজের সাংসারিক অবস্থা ভাল না হলেও তিনি দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। আশাকরি তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকাশের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হবে। সি পি এমের আর এক পলিটব্যুরো সদস্য এবং প্রয়াত অধ্যাপক দাসের অন্যতম ছাত্র বিমান বসু বলেন, 'ক্ষুদিরাম দাস একজন ধর্মনিরপেক্ষ, কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তমনের প্রকৃত মানুষ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদ পাওয়ার সময় তাঁকে বারবার আঘাত করা হয়। তিনি প্রত্যাখ্যত হন। এমনকি নির্বাচকমণ্ডলীর কেউ কেউ তাঁর সম্প্রদায় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই সময়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঠেকানো যায়নি। তিনি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হন। বেলিয়াতোড়ে তাঁর উদ্যোগে একটি কলেজ হয়েছে। কিছু সমস্যা হয়েছিল। আমি সেই সমস্যার সমাধান করেছিলাম। আমি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাব, বেলিয়াতোড়ের কলেজ যেন প্রয়াত অধ্যাপকের নামে করা হয়।' ভাষণ দিতে উঠে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী বিমানবাবুর এই আবেদন বাস্তবায়িত করার জন্য সচেষ্ট হবেন বলে জানান। শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার বলেন, তাঁর বই বার বার আমাদের পড়তে হয়। তিনি ছিলেন একজন বর্ণময় বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বাংলা আকাদেমিতে মাঝেমধ্যে মতবিরোধ হত। কিন্তু মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে পারিনি। এদিনের সভায় প্রয়াত ক্ষুদিরাম দাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ আবিরলাল মুখার্জি, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, সনৎ চট্টোপাধ্যায়।

(আজকাল, ২৮ মে ২০০২)

স্মরণসভায় অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু

শুধু কৃতী শিক্ষকই নন, বড়োমাপের মানুষও ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা, ২৭ শে মে- প্রয়াত অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসকে শুধু কৃতী শিক্ষকই নয়, বড়মাপের মানুষ বলে বর্ণনা করলেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এবং বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস যখন মৌলানা আজাদ কলেজে শিক্ষকতা করতেন তখন বিমান বসু ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে অধ্যাপক দাস যখন কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করছেন, তখন অনিল বিশ্বাস সেখানকার ছাত্র।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস বাংলা আকাদ্রেমি এবং রাজ্য পুস্তক পর্ষদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালে। সোমবার অবনীন্দ্র সভাঘরে রাজ্য পুস্তক পর্ষদের উদ্যেগে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর স্মরণসভা। সেখানেই স্মতিচারণায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অরুণকুমার বসু, পবিত্র সরকার, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ আবীললাল মুখার্জি প্রমুখ। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী,

সভায় অনিল বিশ্বাস বলেন, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস নিজে কখনো রাজনীতি করেননি। কিন্তু অন্যায় দেখলে কখনো চুপ করে থাকতেন না। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী চরিত্রের। কৃষ্ণনগরে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে তিনি নীরবে সমর্থন জুগিয়েছিলেন। গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের মুক্তির জন্য আমরা যখন সেখানকার টাউন হলে সভা করি তখন সরকারী কলেজের শিক্ষক হয়েও নির্ভয়ে তিনি আমাদের সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

বিশ্বাস বলেন, পরে জরুরী অবস্থার সময়েও তিনি আমাদের ত্যাগ করেননি। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর হয়ে মিছিল সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন।

বিমান বসু বলেন, অধ্যাপক দাস ছিলেন পণ্ডিত, আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ মানবদরদী এবং দৃঢ়চেতা এক ব্যক্তি। জীবনের শেষভাগে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে, যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে একটি কলেজ গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করবো ঐ কলেজটিকে তাঁর স্মরণ তাঁর নামঙ্কিত করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে।

তিনি বলেন, অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মতো ব্যক্তির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রামতনু লাহিড়ীর নামাঙ্কিত শিক্ষাকপদে নিয়োগ অস্বীকার করেছিল। নির্বাচকরা তিনবার তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আজেবাজে যুক্তি দেখিয়ে। পরে ১৯৭৪ সালে তিনি অবশ্য ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছিল।

(গণশক্তি ২৮ শে মে, মঙ্গলবার, ২০০২)

ক্ষুদিরাম দাসের নামে কলেজ করার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টারঃ প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের যেসব পাণ্ডুলিপি তাঁর জীবিতকালে ছাপা হয়নি এমন সব পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করে রাজ্য সরকার ছাপানোর ব্যবস্থা করবে। সোমবার চারুকলা ভবনে প্রয়াত ক্ষুদিরাম দাসের স্মরণসভায় তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস একথা বলেন।

তিনি বলেন, ক্ষুদিরাম দাসের গুণগুলোকে ধরে রাখতে এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য সরকার এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বাঁকুড়ার বেলিয়াতড়ে কলেজের নাম পরিবর্তন করে ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের নামে কলেজটির নামকরণ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখেন। অনিল বিশ্বাস বলেন, ক্ষুদিরাম দাস সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন না। তবে, তিনি বামপন্থী মনস্ক ছিলেন। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী বলেন, বেলিয়াতড়ে কলেজের নাম পরিবর্তনের যে প্রস্তাব বিমান বসু দিয়েছেন কলেজের গর্ভনিং কমিটির সঙ্গে কথা বলে তা ঠিক করা হবে। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মানস মজুমদার। অরুণকুমার বসু প্রমুখ। স্মরণসভাটির আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

(কালান্তর, ২৮ মে ২০০২)

ক্ষুদিরাম দাস স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগরঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও কৃষ্ণনগর নাগরিক কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত ক্ষুদিরাম দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। কৃষ্ণনগর টাউন হলে শনিবারের এই সভায় শহরের শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত হয়ে প্রয়াত বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষাবিদকে শ্রদ্ধা জানান।

(প্রতিদিন, রবিবার ১২ মে ২০০২)

লোকায়ত ও ধ্রুপদী

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙেঘর উদ্যোগে ক্ষুদিরাম দাস স্মরণ অনুষ্ঠানটি গত আঠারো তারিখে জীবনানন্দ সভাঘরে সম্পন্ন হয়ে গেল। বক্তারা ছিলেন যথাক্রমে সুধীর চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময় ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন পবিত্র সরকার। সুধীর চক্রবর্তী ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলেন। কলেজ জীবনে তাঁর নিয়ম নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ক্ষুদিরাম দাসকে অনেকটাই চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেন শ্রোতাদের। ক্ষুদিরাম দাসের সাহিত্যিক কাজকর্ম তাঁর বক্তৃতার মধ্যে উঠে এসেছিল।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় সংগঠনের সঙ্গে ক্ষুদিরাম দাসের যোগাযোগকেই বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ঋজু ভাষায় অধ্যাপক দাসের জীবনের সংগ্রামী দিকটিকে তুলে ধরেন। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্যেও ক্ষুদিরাম দাস নিজেকে যে স্বতন্ত্র ভূমিকায় স্থাপন করতে পেরেছেন তার কেন্দ্রে ছিল তাঁর ঋজু ও নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। সংগঠনেরও তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী।

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, সংগঠনে তাঁর সঙ্গে অনেক বিতর্ক হলেও এমন আন্তরিক মানুষ তিনি খুব কম দেখেছেন। এরপর তিনি ক্ষুদিরামবাবুর ‘রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়’ গ্রন্থটি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এই বইটির মধ্যে যুক্তিসিদ্ধভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা রয়েছে। ক্ষুদিরাম দাসের অন্যান্য সাহিত্যিক কাজকর্ম নিয়েও তিনি আলোচনা করেন।

পরবর্তী বক্তা সুত্রাকারে কতগুলি কথা বলেন। যেমন ১। ক্ষুদিরামবাবুই প্রথম বলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নয়, মুকুন্দ চক্রবর্তী। ২। কথাবার্তায় তিনি অগোছালো, বললেন অনেকেই, কিন্তু কলম হাতে নিলেই মানুষটি হয়ে উঠতেন অত্যন্ত সচেতন। ৩। লোকায়ত ভাবনা আর ধ্রুপদী ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি। অনায়াস স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল তাঁর সাহিত্য জগতের বিভিন্ন ধারায়। ৪। আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ প্রকৃত আধুনিক মানুষ ছিলেন তিনি। ৫। গতিশীল পথিক- প্রেমিকের সত্তাটিই বাঁকুড়ার এই ধ্রুপদী পণ্ডিত ও গ্রামীণ লোকায়ত চেতনাবিশিষ্ট মানুষটির সংগ্রামী জীবনের সারাৎসার।

সভাপতির বক্তব্যে পবিত্র সরকার ক্ষুদিরাম দাসের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের কথা বলেন। ক্ষুদিরামবাবুর রসিকতার দিকটিও তিনি তুলে ধরেন। এরপর তিনি অধ্যাপক দাসের সাহিত্য জগৎ তাঁর চিন্তা-ভাবনা, সাঁওতালি ভাষায় শব্দকোষ রচনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ধারার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে উদ্যম প্রয়োজন ক্ষুদিরামবাবু তার নজির হয়ে রইলেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক পদের জন্য চারপাশের যে বিরোধিতার মধ্যে হাঁটতে হয়েছিল তাঁকে, তাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। সবশেষে ক্ষুদিরাম দাসের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সত্যপ্রিয়

(গণশক্তি ১৪ই জুলাই , রবিবার, ২০০২)

শতবর্ষে

৯ অক্টোবর শতবর্ষ পেরোলেন ক্ষুদিরাম দাস (১৯৯৬-২০০২)। প্রায় বিস্মৃত এই আদর্শ শিক্ষক ও মেধাবী গবেষক বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ের প্রান্তবর্গীয় পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। প্রথম শ্রেণিতে সংস্কৃত অনার্স, এম এ–তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, পাঁচটি স্বর্ণপদক প্রাপ্তি। ১৯৪২ থেকে চার দশক শিক্ষকতা, শেষ পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এর 'বেঙ্গলি লিঙ্গুইস্টিক ডিকশনারি ফর বোথ বেঙ্গলিজ অ্যান্ড নন-বেঙ্গলিজ ' নামে একটি ত্রিভাষিক অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত) রচনার কাজ শেষ করেন, যদিও তা আজও আলোর মুখ দেখেনি। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়-এর জন্য ১৯৬২-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ডি লিট। বিদ্যাসাগর

ও রবীন্দ্র পুরস্কার সহ নানা সম্মান পেয়েছেন। লিখেছেন বহু উল্লেখ্য গ্রন্থ। তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন ১৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩ টেয় মহাবোধি সোসাইটি হলে। শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ মনীষয়া দীপ্যতি প্রকাশ করবেন তাঁরই ছাত্র শঙ্খ ঘোষ। স্মারক বক্তৃতা দেবেন আর এক ছাত্র মানস মজুমদার। এ ছাড়াও উজ্জল মজুমদার থাকবেন বক্তা হিসাবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতার কড়চা, ১২ ডিসেম্বর ২০১৬)

পঞ্চম অধ্যায়

PRABODH CHANDRA SEN
'Ruchira' Purvapalli
EMERITUS PROFESSOR VISVA –BHARATI
SANTINIKETAN : 731-235
FORMERLY RABINDRA PROFESSOR IN BENGALI
West Bengal India
AND ADHYAKSHA RABINDRA BHAVANA
২০/১০/১৯৭৮
VISVA-BHARATI UNVERSITY

পরম প্রীতিভাজনেষু

আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠি পেয়ে অশেষ আনন্দ লাভ করলাম। আপনার ২৩/৯ তারিখের চিঠি পেয়েছিলাম ২৫/৯ তারিখে। তার দু'একদিনের মধ্যেই মহাবর্ষণে এখানে দেখা দিল চরম দূরবস্থা। ক্রমে তাই পরিণত হল অচল অবস্থায়। দীর্ঘকাল আমরা বর্হিজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বোলপুর অঞ্চলটা প্রায় একটা জলবেষ্টিত দ্বৈপায়ন ভূমির রূপ ধারণ করল। পথঘাট বিপর্যস্ত । ফলে ট্রেন বাস টেলিগ্রাম টেলিফোন চিঠিপত্র সব বন্ধ। দু-সপ্তাহের অধিককাল বন্ধ থাকার পর বাস চলাচল শুরু হয়। বাসে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন ধরতে হয় এখনও। কিছুদিন হল বাসেই খবরের কাগজ আসছে। তিন-চার দিন যাবৎ সাধারণ চিঠিপত্র আসাও শুরু হয়েছে- মানি অর্ডার , রেজিস্টার্ড চিঠিপত্রদি আসছে না। তাই এতদিন পরে আপনার চিঠির উত্তর দেবার সুযোগ পেলাম।

আপনি আমার বিজয়ায় প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভকামনা গ্রহণ করুন। আপনারা সব কুশলে আছেন তো ? কলকাতা এবং কৃষ্ণনগরও তো এবার বন্যার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। আপনাদের কুশল সংবাদ পেলে নিরুদ্বিগ্ন হব।

এখানে প্রভাতবাবুর বাড়ীতে নেহাত কর্ম উপলক্ষ দেখা হলেও অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার সৌহার্দ্যপূর্ণ সান্নিধ্য পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। ৮২ বছর বয়সে এখন সংসারের প্রতি সব আসক্তি স্বভাবতই শিথিল হয়ে গেছে-মানুষের প্রীতিই একমাত্র কাম্য এবং ইহজীবনের শেষ সম্বল। মানুষের প্রীতির মধ্যেই পাই অমৃতের আস্বাদ। রবীন্দ্রনাথ কেন বলেছেন 'ভালবাসার অমৃত' তা এখন বুঝি। আমার পরমায়ুর কাম্যতম শেষ সীমাও (৮০) তো অতিক্রম করে গিয়েছি।

এখন আছি Extension Service- এ । তাই নিরসক্ত মন নিয়ে নেহাতই বেঁচে থাকার কর্তব্য হিসাবে কাজ করে চলেছি। সংসারটাকে এখন একটা ওয়েটিং রুম বলেই বোধ হচ্ছে। এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পেছনের দিকে তাকিয়ে সুদীর্ঘ জীবনটাকে স্বপ্নের মতো মনে হয়- বিচিত্র এক স্বপ্নের খেলা। মনের এই অবস্থার মধ্যেই পেলাম আপনার প্রীতির স্পর্শ – জীবনের এক অমূল্য সম্পদ লাভ। শুধু আপনার নয়। এখনও মাঝে মাঝে নূতন মানুষের প্রীতির স্বাদ পেয়ে নিজেকে চরিতার্থ মনে হয়- 'যা পেয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী।'

"ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে,

নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে।

কী পেলে না , কী হল না,

কে তব শোধেনি দেনা,

সে সকলই মরীচিকা , মিলাইবে পিছে।।"

কবির এই বাণী অহরহ অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। -মনের প্রেরণার অনেক কথা বললাম। এই প্রেরণার মূলে রয়েছে আপনারই অল্পসময়ের প্রীতি সান্নিধ্যের স্মৃতি এবং প্রীতিপূর্ণ চিঠিখানির আন্তরিকতা । এবার কাজের কথা, আপনার চিঠির উত্তর।

আপনার সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বইটি পেলে বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হব। আপনার মত কৃতবিদ্য ব্যক্তির মতামতের প্রতি আমি সর্বদাই সশ্রদ্ধ। আপনার সম্পাদিত বইটিকে মূল্যবান সম্পদ বলেই গ্রহণ করব। আপনি ৭ +৭+ ৯ মাত্রার ত্রিপদীগুলিকে চিহ্নিত করে দেওয়াতে আমার খুবই উপকার হবে। আমার বইতেও দাগ-দেওয়া আছে। এবার মিলিয়ে দেখার সুবিধা হবে। যদি কোনো লেখায় ব্যবহারের সুযোগ পাই তবে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে উল্লেখ করব।

ছন্দ সম্বন্ধে আপনার বই-এর কথা আমার জানা ছিল না। নূতন সংস্করণ ছাপা হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। যথা সময়ে পাঠিয়ে দিলে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করব।

আমি তো কখনও নিজেকে অভ্রান্ত মনে করি না। সারা জীবনে কত ভুল করেছি (ছন্দের ব্যাপারেও) তা আমি ভুলি না। অন্য সবাই ভূল করছে

কিংবা সকলেই আমার মত গ্রহণ করুক, এমন মনোভাব আমার নয়। এরকম মনোভাব তো মূঢ়তার লক্ষণ। সবাই কোনো বিষয়ে একমত হলে দুনিয়ার অগ্রগতিই তো রুদ্ধ হয়ে যাবে। নানাজনের নানামতের আলোতেই তো সত্যের রূপ প্রকাশিত হয়। আপনার মতামতও আমি শ্রদ্ধাসহকারেই বিবেচনা করব এবং প্রয়োজন মতো তার আলোতে নিজের চিন্তাশোধন করব। এই কাজ আমি সারাজীবনই করে আসছি। বিনা বিচারে অন্য কারও মতকে আগ্রাহ্য করা চরম মূর্খতা বলেই মনে করি। আপনার মতো প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত সম্পর্কে কি উদাসীন থাকতে পারি ? –আপনার বই পাবার অপেক্ষায় রইলাম।

আবার যদি আপনার সান্নিধ্য পাই দীর্ঘতর সময়ের, তাহলে বিশেষ আনন্দিত হব। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করুন।

ইতি-

প্রীতিমুগ্ধ

প্রবোধ চন্দ্র সেন

আমি একে তো জরাজীর্ণ, তায় প্রায় অন্ধ। লেখায় ভুলচুক হয়। শুধরে নেবেন। চিঠি কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় লিখলাম। প্রাপ্তিসংবাদ পেলে খুশি হব।

PRABODH CHANDRA SEN
'Ruchira' Purvapalli
EMERITUS PROFESSOR VISVA –BHARATI
SANTINIKETAN : 731-235
FORMERLY RABINDRA PROFESSOR IN BENGALI
West Bengal India
AND ADHYAKSHA RABINDRA BHAVANA
১৮/১১/১৯৭৮
VISVA-BHARATI UNVERSITY

শ্রী ক্ষুদিরাম দাস

পরম প্রীতিভাজনেষু ,

আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠিখানি (১৩/১১) পেলাম কাল (১৭/১১)। আপনার চিঠি পেয়ে একটি প্রায় – পরোক্ষ উক্তিতে আমি বড়ই বেদনাহত ও বিচলিত হয়েছি। সেটি আপনার পত্নী বিয়োগের সংবাদ। আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থলটি হারিয়েছেন তা আমি জানতাম না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম পুরোপুরি অনুভব করা যায় না। আমার সেই অবস্থা। কিন্তু বিপত্নীকদের কি অবস্থা হয় তা দেখে দেখে অনুমান করতে পারি তাদের জীবন কতখানি নিরাশ্রয় হয়ে যায়।অনুমান করতে পারলেও অনুভব করতে পারি না। মনে হয় মানুষের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় আঘাত। অথচ এও বিশ্ব-বিধানের এক বেদনাবহ সত্য যে, দুজনের একজনকে একদিন না একদিন এই আঘাত পেতেই হবে।– আপনার পত্নী-বিয়োগ কবে হয়েছে কিভাবে হয়েছে কিছুই জানি না। আপনি লিখেছেন শুধু একটি প্রাসঙ্গিক কথা- "পত্নীর লোকান্তরের পর থেকে এই ভাবেই চলছে –একাদিক্রমে শারীরিক দুর্ভোগ ভুগেই চলেছি। অথচ সবই করতে হচ্ছে।" এই একটি উক্তির গভীরতাই অতলস্পর্শ । তাতে আপনার বেদনা যে কত অপরিমেয় তা আমার মর্মগত হয়েছে এক নিমেষে। শুধু একটি মর্মান্তিক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো। আপনাকে আমি আর কি বলতে পারি- সান্ত্বনা দেবার অধিকার কারও নেই। বোধ করি স্বয়ং বিশ্ববিধাতারও নয়।

আপনি পত্রের উপসংহারে ওই একটি উক্তি করেছেন। তার আগে লিখেছেন সব কাজের কথা। অর্থাৎ সব কাজের মধ্যেও ওই একটি কথা আপনার অন্তরে জেগে রয়েছে। আমার কাছে সে কথাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে

দেখা দিয়েছে, অন্য সব কথা ছোট হয়ে গেছে। তাই ওই কথা দিয়েই চিঠি শুরু করেছি। কাজের কথাগুলি ছোট করেই লিখব।

আপনার চণ্ডীমঙ্গল সম্পাদন একটি মহৎ কাজ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি সমস্ত জাতির পক্ষে একটি বৃহৎ কর্তব্য সাধন করেছেন। এতদিনে এই কবির প্রতি আমাদের জাতীয় কর্তব্য নিষ্পন্ন হল। আপনি সমগ্র জাতির আশীর্বাদভাজন হয়েছেন। তবু দুঃখের কথা এই যে, একাজ আপনাকে করতে হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় । সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং অর্থ সাহায্যে এই জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন হওয়াই উচিত ছিল। তা হয়নি, এটাই দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তাতে আপনার কৃতিত্বই আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এইজন্য আমি একক অভিযাত্রী হিসাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আর এই দুঃসাধ্য কাজের জন্য উত্তরাধিকারীরা সবাই কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে আশীর্বাদ জানাবেন- দেশমাতৃকার আশীর্বাদ । এ বই যদি আমি আরও কিছুদিন আগে পেতাম তাহলে বড় উপকৃত হতাম- বড় কাজে লাগত। আশা করছি এখনও কিছু কাজে লাগতে পারে।

ছন্দচর্চা করছি ৫৬ বৎসর যাবৎ অবিরতভাবে। কিন্তু তবু বুঝি বহু কথা এখনও বলা হয়নি, বহু সত্য এখনও অনুদ্‌ঘাটিত । 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?' আমি শেষ কথা বলিনি, অভ্রান্ত ও নই। তাই উৎসুক চিত্তে অন্য সকলের লেখা পড়ে থাকি পরম শ্রদ্ধা সহকারে, সেটাই আমার স্বভাব। অনেক লেখায় বহু সত্যের সন্ধান পাই, নিজেকে পুনর্বিচারের সুযোগ পাই। সকলের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। আপনার বই পেলেও আমি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে পড়ব।

ডাকের সময় হয়ে গেছে। তাই শেষ করছি। আমার আন্তরিক প্রীতি ও কল্যাণ কামণা জানাচ্ছি।

ইতি-

প্রীতিমুগ্ধ

প্রবোধচন্দ্র সেন

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ ফোনঃ ২৪৪১/৬৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী
বাংলাদেশ

সংখ্যা ব মা ১৯/বাবি তারিখ ২৮/৪/৭৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ১৭ই মার্চের চিঠি পেয়ে ২১শে মার্চ তারিখে কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় জবাব দিয়েছি। কিন্তু তারপর আপনার আর কোন চিঠি পাই নি। আপনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং এপ্রিলের শেষ দিকে নতুন পদে যোগ দিতে পারেন বলে জানিয়েছিলেন। আজাদ কলেজ থেকে হুগলী কলেজে যাচ্ছেন বলেও লিখেছিলেন। এখন আপনার অবস্থান সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। এদিকে আপনার সংগে যোগাযোগ করা একান্ত দরকার। কাজেই এ-চিঠি দুটি ঠিকানায় – কৃষ্ণনগর ও কোলকাতা পাঠাচ্ছি।

আমাদের বিভাগে বক্তৃতা দেওয়া সম্পর্কে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, কিন্তু সুনিশ্চিত তারিখ জানাতে পারছিলাম না। কারণ টাকাটা হাতে না নিয়ে আমি কাজ শুরু করতে চাচ্ছিলাম না। সে বাধা গেছে। টাকা হাতে এসে গেছে।

আপনি মেহেরবাণী করে জানালে বাধিত হবো যে, আপনার পক্ষে সেপ্টেম্বর মাসটা আমাদের সংগে থাকা সম্ভব হবে কিনা। আমরা আপাতত পাঁচ মাসে পাঁচজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমাকে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম তৈরী করে কাজ শুরু করতে হবে। কাজেই কে কোন মাসে আসতে পারবেন সেটা জানা আমার পঙ্গে একান্ত দরকার। আমরা জুলাই মাস থেকে বক্তৃতামালা শুরু করতে চাই। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর এই পাঁচমাসে পাঁচজন বক্তৃতা দেবেন। অক্টোবর মাসটা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।

আপনার বক্তৃতার বিষয় কি হবে সেটাও অনুগ্রহ করে পত্রোত্তরে জানাবেন। আমাদের প্রোগ্রাম ছাপাতে হবে। যে সব কলেজে অনার্স ও এম-এ পড়ানো হয় সে সব কলেজের বাংলার শিক্ষকগণকেও আমরা আপনাদের বক্তৃতা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই।

আপনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গেলে আমার জন্য খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে।

শুভ সংবাদের অপেক্ষায় আছি।

২৫শে এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত আমাদের গরমের ছুটি। আমি মে মাসের শেষ দিকে ঢাকা যাবো এবং ১৫/২০ দিন থাকবো। আপনি কবে কোন ঠিকানায় থাকবেন মেহেরবাণী করে জানাবেন।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

প্রীতিধন্য

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস

(কাজী আবদুল মান্নান)

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ এম. এ. পি এইচ ডি দুরালাপনিঃ ২৮২৯১৩
এসোসিয়েট প্রফেসর,
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ১৬/৭/৮০
বুধবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কলিকাতা থেকে ফিরে এসেই ডঃ সিরাজুল ইসলামের 'পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট ইন বেঙ্গল' এবং বদরুদ্দীন উমরের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলা কৃষক' বই দুখানি সংগ্রহ করে রেখেছি।বুক্‌পোস্টে পাঠালে খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য অপেক্ষা করছি, কলিকাতা কেউ যায় কিনা। বাংলাদেশের অনেক স্কলার সেখানে আছেন, তাঁদের মারফত পাঠাতে পারব বইটি আশা করছি। আপনার জানামত কেউ এখানে এলে বলবেন, স্যার, আমি তাঁর হাতে পাঠিয়ে দিব।

আপনার আশীর্বাদে আমরা ভাল আছি। আপাততঃ নতুন কাজে হাত দেইনি। ডি.লিট থিসিস মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে গেলে নতুন কাজে হাত দিব। অফিসিয়াল চিঠিপত্রের অপেক্ষায় আছি। সেটি যত তাড়াতাড়ি হয়, আমার জন্য ততই মঙ্গল। আপনি তুষার মহাপাত্রকে বলে একটু খোঁজ নেবেন, স্যার। তুষার আমার সহপাঠী। ও সব ব্যাপারটা জানে। উপরন্ত পরীক্ষকগণের সাজেশ্‌সান গুলি জানতে পারলেও আমার জন্য উপকার হয়। সেগুলির ট্‌রুকপি বা জেরোক্স কপি পাওয়া কি সম্ভব হবে না স্যার!

আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার মনে আছে। চর্বিত চর্বন করা আমার আদৌ ইচ্ছা নয়। আমি অভিনব কিছু করতে চাই। নতুন বিষয় নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে চাই। আমার জন্য উপযোগী কাজ কি থাকতে পারে, জানাবেন, স্যার। আমি চেষ্টা করব এক্সপ্লোর করতে। আমার বিশ্বাস, আমি এখনও কাছ করতে পারব। আপনার আশীর্বাদ কামনা করে শেষ করছি।

ইতি

ক্ষুদিরাম দাস
ওয়াকিল আহমদ

Asit k. Bandyopadhyay , M.A. Ph.D
Bankimchandra Chattopadhyay Research Professor of
Bengali Language and Literature
Asiatic Society Calcutta
Formerly Professor and Head of the Department of Bengal
The University of Calcutta

1/2/96

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস,

সুহৃদবরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে। আমার প্রবন্ধ- সংকলনের কোনো কোনো প্রবন্ধ যে আপনার ভালো লেগেছে, তা আমার কাছে একটি দুর্লভ সংবাদ। আপনার মতো রসজ্ঞ সমালোচকের প্রশংসা আমার কাছে অতি লোভনীয় ব্যাপার।

আমি এবং বিনীতা এই শনিবার (৩/২/৯৬) আমেরিকা যাত্রা করছি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে আরিজো্না বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সংস্কৃতি বিভাগের ভার গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, গবেষনার বিষয় নির্দেশ এবং আরো নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। মনে হচ্ছে, আড়াই মাসের মধ্যে ফিরতে পারব। কর্তৃপক্ষ একজন অধ্যাপক, রীডার, লেকচারার, গ্রন্থাগারিক ও গবেষক- মোট এই কয়টি পদে উপযুক্ত প্রার্থী চান। সে বিষয়ে আমার উপদেশ চেয়েছেন।

আপনার শুভেচ্ছা আমাদের পাথেয় হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের দু'জনের নমস্কার নেবেন। ইতি

ভবদীয়

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

A1/6 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস

68/1 বাগমারি রোড

কলকাতা 700054

15 জানুয়ারি 1994

সবিনয় নিবেদন,

শুভদুশেখর মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবর আপনি জানেন। তাঁর অবর্তমানে রবীন্দ্ররচনাবলী সম্পাদনার কাজ এখন ঠিক কী অবস্থায় আছে, বাকি কাজটুকু কীভাবে পরিচালিত হবে, এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর একটি জরুরি সভার আয়োজন হয়েছে আগামী ২০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা তিনটেয়। বৈঠকটি হবে উডবার্ন রোডের রচনাবলী অফিসে। এই সভায় আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

বিনীত

শঙ্খ ঘোষ

শ্রী ক্ষুদিরাম দাস

সমীপে

5 Satyen Datta Road

Calcutta 700029

সবিনয় নিবেদন, নবেম্বর ১৪, ১৯৮৩

যাদবপুরে পুনর্নিযুক্ত হয়েও পয়লা ডিসেম্বর থেকে আমি শহরত্যাগ করছি, যাচ্ছি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে। তিন বছর আগেই এই প্রস্তাব এসেছিলো, তখন অবসর নেবার পুর্বেই যাদবপুর ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ছিলো না। এখন কর্মস্থল পরিবর্তন করারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ডিসেম্বর থেকে আমার ঠিকানা হবে

রবীন্দ্রভবন
শান্তিনিকেতন
পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১২৩৫

যদি কখনো শান্তিনিকেতনে আসেন, খোঁজ করবেন। যাদবপুরে আপনার সহযোগিতা বছর পরে যাদবপুর ছেড়ে যাবার সময় সকৃতজ্ঞ ভাবে সে কথা স্মরণ করছি। আমার প্রীতি নমস্কার জানবেন। ইতি

নরেশ গুহ

১৬২/১৬৫, লেক গার্ডেনস
কলিকাতা ৪৫ ১/১১/১৯৮৫

কল্যাণতমেষু

চিঠি পেলাম। আপনি সপরিবারে আমার ঁবিজয়ার স্নেহাশীষ নেবেন। আমার মাঝে মাঝে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যায়। দৃষ্টিও ক্ষীণ। ঐ দীর্ঘ জীবন বহন করা দুবিষহ হয়ে উঠেছে। যদি পারেন, একবার আসবেন। ইতি

শুভার্থী

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

Block k, Flat 3/1, Karunamoyee

Housing Estate, Calcutta-700064

21.10.84

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ডি লিট, শ্রীচরণেষু,

বিজয়ার প্রণাম ও শুভকামনা জানবেন। আপনার 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' লাভের সংবাদ জেনে অতীব সুখী হয়েছি। আপনার মত একজন eminent scholar কে বাঙ্গালী সমাজের মাথার মনি করে রাখা উচিত। পূজোয় কি আপনি কৃষ্ণনগরে অবকাশযাপন করছেন? আপনার জ্ঞানময় জীবন আমাকে প্রেরণা দিক।

বিনীত

মঞ্জুভাষ মিত্র

'আনন্দমঠ' / পূর্বপল্লী/ শান্তিনিকেতন
731235

1 মে 1994

শ্রীচরণেষু,

আপনার রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্তি সংবাদে ব্যক্তিগতভাবে আমি উচ্ছ্বসিত আনন্দ অনুভব করছি। অনেক দিন পর আবার এক যথার্থ যোগ্য ব্যক্তির হাতে এই পুরস্কার পৌঁছলো। এতে পুরস্কারেরই মর্যাদা বাড়লো। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকুন, আপনার সারস্বত সাধনা অব্যাহত গতিতে চলুক, আমরা যতদিন আছি ততদিন আপনি আমাদের কাছে থাকুন- ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। মার্চ থেকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নিতে হয়েছে এখানে। প্রণাম নেবেন। স্নেহধন্য

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

Dr. Harekrushna Mahtab Phone-52002

Ekamra Nivas
Bhubaneswar-71520

12-03-83

Dear Dr. Das,

I am happy to know all about you from Sri Mohan kali Biswas. I was just going to write to you requesting you to favour us with your visit to our writers conference to be held on 12th, 13th, and 14th. Of April. This conference is about fifty years old and was founded by me. In the conference all oriya writers meet and discuss subjects as planned every year. According to the rule of conference we invite a learned scholar from non-oriya areas so that our literature will be in touch with

development of other Indian literature. This year we invite you and join our discussion on the 14th. the concluding day. I think your participation in our discussion will be a great value to us. Your to and fro travelling and other expenses will be born by us. We will make arrangement for your stay here. I hope you will not disappoint us. Dr. Suniti Kumar Chatterjee, Dr. Sukumar Sen and many other Bengali literatures were on occasions have associated themselves with our conference, known as Visura Milan because it is held on the Visuva Milan because it is held on the Visuva Sankranti day.

Yours sincerely

(H. Mahtab)

Dr. Kshudiram Das, M.A.,

18 C-Tamer Lane- Calcutta,

Dr. Harekrushna Mahtah

Phone-52002

Ekamra Nivas

Bhubaneswar-71520

28-03-83

Dear Dr. Das,

Many thanks for your letter dated 21st March '83. I will be glad to see you during your stay in Orissa. The closing ceremony of Vishub Millan will start at 10 A.M. on the 14th April 83. But your express arrives early in the morning at Cuttack. So it may not be convenient to you to attend the function. Therefore I would suggest you that you may start for Cuttack on the 12th and resch on the 13th . All arrangements have been made for your stay alone with your family members at Puri. For your stay at Cuttack, Circuit House has been arranged. We have also sent rupees five hundred to meet the expenses from Calcutta to Cuttack. We will also arrange all expenses to be incurred for your way back. Kindly confirm whether you are reaching Cuttack on the 13th.

Yours sincerely

(H. Mahtab)

Dr. Kshudiram Das, M.A.,

D. Litt (Cal), W.B.S,E.S. (Retd),

18/c , Tamerlane, Calcutta-9

INTERNATION CONFERENCE SEMINAR OF TAMIL STUDIES

(MADURAI-JANUARY 4 TO 10, 1981

President:

The Hon'ble Chief Minister Thiru M.G. RAMACHANDRAN

Secretary & Treasurer:

Thiru R. Muthukumaraswamy

Dr. Kshudiram Das, Ramtanu Lahiri,
Professor and Head of the Dept. of
Modern Indian Languages,
Calcutta University,
Ashutosh Building, Calcutta-73

Dear Dr. Das,

It has been suggested by Dr. A. Kamatchinathan that you can present a research paper on 'A Comparative study of the language, literature and culture of Bengali and Tamil at the V International Conference Seminar of Tamil studies to be held at Madurai from January 4 to 10, 1981. The following are enclosed:-

1) Invitation
2) Style sheet with Bulletin no-3

Yours faithfully,

(R. UTHUKUMARASWAMY)
Secretary & Treasurer

Shri B.C. Mukherjee
Joint Secretary,

West Bengal Secretariat
Home Department (press)

D.O. No 1264-Pr/9B-3/70 Calcutta, The 1st November 1971

Dear Dr. Das,

The State Government have a Board styled as the Board of Review of Publications , attached to the Press Branch of the Home Department. The Board consists of a Chairman, a Member and a Member-Convenor. It was constituted for the purpose of helping the State Government in the scrutiny of obscene scurrilous or otherwise objectionable publications.

It has been proposed to appoint you as Chairman of the Board. I shall be greatful to know if you would agree. I would also add that an honorarium of Rs 50/- (Rupees fifty only) is paid to the Chairman of the Board, for each actual sitting of the Board as and when necessary.

An early reply will be very much appreciated.

With kind regards,

Yours sincerely

B C Mukherjee

1.11.71

Dr. Kshudiram Das,

Head of the Deptt. Of Bengali,

Maulana Azad College, Calcutta,

54, Sree Gopal Mullick Lane,

Calcutta-12

Shri A.K. Banerji West Bengal, Secretariat

Assistant Secretary Home Department (Press)

Calcutta, The 3rd Dec. 1971

D.O. No 1381-Pr/9B-3/70,

Dear Dr. Das,

I am enclosing herewith a copy of Government Order No. 1379 Pr dated the 3rd December, 1971 together with a copy of Government order No. 354 Pr dated the 27 th April, 1970, appointing you as Chairman of the Board of Review of Publications.

It is hoped that you would lend your valuable Service and co-operation in carrying out the function of the Board.

We propose to call a meeting of the Board shortly to discuss the working procedure of the Board and other items.

Yours sincerely,

A. K. Banerji

Dr. Kshudiram Das, M.A.

(Gold Meda.)D. Lit (Cal),

Head of the Deptt. Of Bengali,

Maulana Azad College, Calcutta,

54, Sree Gopal Mullick Lane,

Calcutta-12

Government of west Bengal

School Education Department

Primary Branch

Bikash Bhawan, Salt Lake, Calcutta-91

No. 355-SF(Pry). Dated, Calcutta, the 5th April, 1999.

NOTIFICATION

Whereas an ad-hoc Committee for the Bangiya Sanskrita Siksha Parishat (hereinafter referred to as the Parishat) was constituted under this Department's Notification No. 509-SE(Pry), dated 23.07.87 for a period of five years with effect from 18.09.1993.

And, whereas the term of the said ad-hoc committee has been expired on 17.09.1998.

And, whereas whereas it is expedient to re-constitute the ad-hoc Committee for the Parishat for a further period of one year with effect from 19.09.1998.

Now therefore, after careful consideration, the Governor has been pleased to reconstitute the said ad-hoc Committee of the parishat for a further period of one year with effect from 18.09.1998 with the following members, to exercise, perform and discharge all the powers , functions and duties of the Parishat:-

1 . Dr. Kshudiram Das. Chairman

2 . Dr. Rabi Sankar Banerjee, Deptt. of Sanskrit(J.U) Member

3 . Dr Sukamal Chowdhury, Member

4 . Dr. Dipak kumar Ghosh, Deptt. of Sanskrit (C.U) Member

5 . Director of School Education, Govt. of W.B Member

6 . Seretary , Bangiya Sanskrit Sikha Parishat Member Secretary

By order of the Governor, Joint Secretary to the Govt. of West Bengal

SUNITI KUMAR CHATTERJI

ASUTOSH BUILDING

M.A(CALCUTTA) D.LIT. (LONDON), F.R.A.S.B.,
THE UNIVERSITY

Honorary Member, Society Asiatique, Paris,
CALCUTTA

and American Oriental Socirty,

khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics,

and Head of the Department of Comparative Philology,

Residence: 'SUDHARMA' 16, Hindusthan Park,

P.O. Ras-Bihari Avenue, Calcutta-29
DATE: 19 July 1950

Sri khudiram Das , M.A., B.T., now Professor of Bengali in Presidency College, Calcutta, is an old pupil of mine in the University M.A. Classes in Modern Indian Languages (Indian Vernacular) who passed out M.A. from the University in the subject in the year 1939. He studied with me for two years , attending my classes in Indian Linguistics (Bengali Philology). He was one of the best students of his year and one of the best , who have passed through my hands. He has always been a very good student, and he had first class Honours in Sanskrit at the B.A. Examination, and at the M.A. he topped the list of candidates in Modern Indian Languages (with Bengali as his principal language), with a first class. He is also a Kavyatirtha in Sanskrit, and a B.T. He has had good experience as teacher of Bengali in some premier Government Colleges

in West Bengal, having been attached to the Presidency College since 1945. He has done some work on Kalidasa and on Rabindranath , and now he is engaged in a study of the Bengali versions of the Ramayana. Sri Khudiram Das is a highly intelligent and very Industrious scholar , and he ought to create a name for himself both as a teacher and a researcher , I shall be happy to hear that he has obtained facilities for better and higher work, and I wish him all success in life.

Suniti Kumar Chatterji

SENATE HOUSE

CALCUTTA

The 22nd. July ,50

I have great pleasure in certifying that Sri kshudiram Das M.A. is very well known to me. He attended his M.A classes under me and passed the examination in Bengali in the first class standing first in order of merit. Sri Das had passed the BA examination with first class Honours in Sanskrit. This gave him an additional advantage . He was selected as a research Assistant in the university. He worked on a very interesting subject on kalidas and Rabindranath -a comparative study. His researches were published particularly in some of the well known Bengali journals. He gave up this post under me to accept an appointment in government Education Service. For some time he served as a sub inspector of schools and so far as I know very creditably performed his work in that capacity. He has been working now as a lecturer in Bengali at Presidency College for about five years. Sri Das is a talented scholar and has experience in

administrative work. I have every confidence that he will acquit himself creditably either as a teacher or as an inspective officer in whichever capability he may be employed. Sri Das has very good manners and bears, from all reports ,an excellent character.

Khagendranath Mitra

Emeritus Professor, Calcutta University

Late Inspector of School, Presidency Division

Ashutosh Mallick

Deputy Speaker

Legislative Assembly West Bengal 20/07/1950

This is to certify that Sri Kshudiram Das, Lecturer of Presidency College, Calcutta is well known to me. His student-career had been one of great hardship, but by dint of his merit and perseverence he came out with excellent results at every examination . He is known at Bankura, his native District, as an all-round scholar and a sincere worker connected with social and economic upliftment of the masses. It gives me much pleasure to note that in addition to his work of teaching and writing on literary topics, in both of which he has already gained reputation, he devotes his spare time for the country's immediate needs. He possesses a trained mind and intelligence and an unblemished character, and as such, I hope, he is sure to make a successful officer in any branch of Government employment. He has my sincerest blessings.

Ashutosh Mallick

20/07/1950

CHAIRMAN

LEGISLATIVE COUNCIL

WEST BENGAL

CALCUTTA

February 26, 1960

I have very great pleasure in testifying to the high opinion I entertain about the character and attainments of my former pupil in the University, Prof. Khudiram Das, M.A. He is one of the most brilliant students in Modern Indian Languages (with Bengali as his principal subject), and his academic career has been quite brilliant. After taking his M.A. in 1939 with the first place in the first class, he has been working as Professor of Bengali in Government Colleges in West Bengal, and is now in the Central Calcutta College. He is a very close student of Bengali Literature and language, and I understand he is anxious to go abroad, particularly England, with a view to make some researches in the teaching of the mother-tongue and its literature, and also teaching of English to foreign students. I think Prof. Das has got the requisite qualifications and aptitude for this kind of work, and I shall be very glad if he can obtain support of either the Government or some other Institution to achieve his purpose. I am sure that in every way Prof. Das will maintain the reputation of Indian scholars by both his personality and his academical attainments.

Suniti Kumar Chatterji

Emeritus Professor of Comparative Philology,

University of Calcutta, and Chairman, West Bengal

Legislative Council

Sushil Kumar De
M.A. (Calcutta) D. lit (London)
Professor Emeritus, Jadavpur University, Calcutta-4
Calcutta and Honorary Fellow of the Royal Asiatic Society

Phone: 55-2450
19A, CHAUDHURI LANE
Shyambazar,

25.02.60

I have known Mr Khudiram Das quite well for some years. He is interested in Bengali language and literature, and has written a book in Bengali on the poetical achievements of Rabindranath . He intends to study the methods of teaching of the mother tonque from my personal knowledge of him and his writings I am of opinion that he is well qualified to do it, if he is given a chance. I can confidently recommend him for a British Council Scholarship for studying aboard.

S.K. De

ষষ্ঠ অধ্যায়

A SEMINAR ON

THE RAMAYANA IN LIFE LITERATURE AND CULTURE IN EASTERN INDIA

পুর্ব ভারতের জীবন সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রামায়ণ

14th,15th, 16th March,1980

CENTENARY AUDITORIUM

UNIVERSITY OF CALCUTTA

আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

DEPARTMENT OF MODERN INDIAN LANGUAGES

CALCUTTA UNIVERSITY

WELCOME ADDRESS

Delegates, Scholars & friends,

It is unique privilege for the Bengali Department of this University to receive you on this occasion of a discussion about the Vernacular versions of the Ramayana current in the eastern region of India. The Rama-Story with its permanent influence on all Indians who still listen to it with absorbing interest naturally went through popular modifications throughout the east, the west, the south and the north in course of time, and although it would have been very much profitable for us to be acquainted with the details of the changes adopted in all these different areas, it is not possible perhaps , to tackle such problem of wide dimension at a single gathering and so the conveners have wisely decided to limit their attention to the eastern versions only this time.

Brethren, it is a happy sign that after independence and consequent growth of national consciousness, the eyes of the scholars are on our past achievements so long handled by the foreigners mainly, and it has been worthy of our national Government to extend a helping hand in

the matter of researches in Indology , still one may be constrained to admit that in matter as such our expectations are even now much below the mark, for who can argue that the materials suggested by the ancient and at the same time most popular epic is not fittest field for scientific and careful investigation.

The sources of the events presented in the Ramayana and the causes of the different versions are still shrouded in mystery. It is also not known what other forms of literary creations preceded the epic of Valmiki, for it is clearly laid down in the Adi-Kanda that the great poet after receiving advice from Narada concentrated in his own studies and at the same time sent messengers to collect a detailed account of the biography of the great hero and ideal king. Rama attained India-wide fame after his encounter with Ravana and it is presumed that Rama's character and achievements gave rise to folk songs and metrical narrations at least towards the second half of his life (cf. Kalidasa's observation about Raghu – Iksucchaya-nisadinyastasya gopturgunodayam/ Akumara Kathodhatap Saligopyo Jaguryasah) and both real and supernatural stories came to grow differently in different regions. Valmiki carefully collected all traditions and himself built a poetic history to be generally acceptable. But for the Rama episode Valmiki's systematic account only could not be thought of as the final and only truth. There might have been some other accounts too which the great poet could not fit in into his finished product, and hence remained unsaid in pen and paper. It is also likely that his creative talent worked as an incentive for later singers to develop similar narrations and join them with the mainstream, just as it happened in case of the Bengali Ramayanas. What even it might be, it is for us to determine whether differences in versions of episodes and characters were due to some pre-Valmiki stratum or how far the Rama-story has been true and historical.

In Bengal Krttibasa is held to be the first translator of Ramayana and flourishing at a time when the Ramayet scct had already made its

advent in the region. We have reasons to believe that although some interpolations in the form of new episodes entered into his original composition later, the poet himself was responsible for giving a Bengali colour to his Ramayana by freely incorporating form the adhyatma Ramayana, the jain version and the Hanumat-Natakam, as also the then floating stories all twisted by the Ramayet devotional scct. He deviated from the original to a certain extent in both incident and character, but none the less he was able to win the heart of all Bengalees irrespective of their social circumstances. The later Ramayana composers in Bengal went further, for in the mean while the Ragatmika Bhakti spirit introduced by Sricaitanya and his followers and later on a curious blend of Shakti-Bhakti engulfed all literary creations so much so that in the name of Ramayana the audience received big metrical narratives echoing some sort of religious mysticism. I have no doubt that such changes occurred in case of the Ramayanas of other regions too, but it is for us to find out the source of these novelties and influences or cross influences if any.

Then, again, the song forms for presenting the narrative before the audience. How do they differ from region to region? Did they have a source in the non-Aryan semi-aboriginal group-music? What form could the original poet, himself a producer and trainer of Lava and Kusa invent to attain such a success, etc. Here in Bengal we find Krittibasa as the introducer of the Pancali mode of singing in a group with one main singer and four assistants, already known as the pancalaka outside Bengal, may be a folk-pattern for old ballads. In my childhood I had occasion to listen to a Hafu pattern of Orissa tradition dealing with the reception of Rama in the house of Guhaka, the semi-aboriginal chief of a jungle of present Madhya Pradesh.

But, I must not elaborate any more matters and problems to be discussed by scholars and specialists, and at this moment I should rather express my feeling of elated happiness to have come in contact with you in connection with so grand an event.

Kshudiram Das
President
Reception Committee

সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন
স্থান- রবীন্দ্রভবন কৃষ্ণনগর, নদীয়া। তারিখ ১০/০৬/১৯৮৪

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

নদীয়া কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষকবর্গের এই রাজ্য-সম্মেলনে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। রাজ্যের শিক্ষার একটি বিশিষ্ট্য অধ্যায়কে উদ্দিষ্ট সার্থকতার অভিমুখে পরিচালিত করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত রয়েছে, এই দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই আপনাদেরও গর্বের কারণ। আশা করি, আপনারা মনে প্রাণে এই অনুভব রক্ষা করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়টি শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়গুলি থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশেষে আমাদের দেশে, যেখানে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতেরও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এই পর্যায়েই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হয়।

বৎসরান্ত আপনাদের এই সম্মিলন যেমন আপনাদের সমষ্টি জীবন ও ব্যক্তিজীবন নির্বাহ নিয়ে পর্যালোচনায় অনুপ্রেরিত করবে, তেমনি করবে বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষণ পদ্ধতির ভাবী অগ্রগতি বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সমূহ, যা রাজ্য শিক্ষাদপ্তরকে উদ্‌বুদ্ধ করে তদনুযায়ী চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত করবে। কিন্তু এর উপরেও কথা আছে। আপনারা দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর ও শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যবর্তী একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ। কেবল শিক্ষাব্যবস্থারই নয়, আপনারা চলমান জনসমাজেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এবং যেহেতু আমাদের অতিপ্রেত স্বদেশ প্রত্যাশিত উন্নতির অভিমুখে এখনও অগ্রগতী হয় নি, কার্যক্রম কেবল মৌখিক ভাষণেই পরিসমাপ্ত থেকে গেছে, বরঞ্চ এমন বলা যায় যে প্রগতি-বিরোধী স্বার্থচক্র প্রতিক্রিয়া-শক্তি অর্জন করে ভারতীয় সাধারণ মানুষকে প্রত্যাশা-বিমুখ করতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেইহেতু এই দুর্দিনে আপনাদের সামাজিক দায়িত্বও গিয়েছে অনেক পরিমাণে বেড়ে। শিক্ষকেরা নিজ নিজ অঞ্চলে নিরক্ষর ও সমস্যা জর্জরিত মানুষের পরামর্শদাতা, চালক ও বন্ধু। প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা, ইংরেজ

শাসনের সময়কার কথাই ধরা যাক। গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর ও অর্ধ-শিক্ষিত সমাজে শিক্ষকদের আসন অগ্রগণ্য ছিল। জমি জমার ভাগ-বাঁটোয়ারা, গৃহবিবাদ এবং কর্ত্তব্য নিরূপণের নানান্ ক্ষেত্রে শিক্ষক মশায়দেরই ডাক পড়ত এবং তাঁরা বিচক্ষনতার সঙ্গে যে বিধান দিতেন তাতে কোনো পক্ষেরই অসন্তোষের কোনো কারণ থাকত না। সম্প্রসারণ, উন্নয়ণ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও শিক্ষক-পণ্ডিত-গুরুমশায়দের আগে ডাক পড়ত। আমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারি যে প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের গ্রামীণ সমাজের অলিখিত বান্ধবতার দায়িত্বের সমাসীন এবং সুখের কথা এই যে আজ তাঁদের অনেকেই স্বাভাবিকভাবে পঞ্চায়েত মণ্ডলীতে স্থান নিয়ে সমাজ-উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রগতিমুখী সরকারের গ্রাম-উন্নয়ণের আদর্শ কাজে পরিণত করে চলেছেন।

বন্ধুগণ, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণগত ন্যায্যতা ও ব্যাপকতার বিষয় অনুধাবন করে শিক্ষনীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে শিক্ষনীয় বিষয়সূচী থেকে বর্জন এবং অন্যায্য প্রতিযোগিতার ও শ্রেণীবিভেদের মনোভাব থেকে স্বল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের রক্ষার ব্যবস্থা অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার। বলা বাহুল্য, এই দুটি বিষয়, বিশেষে প্রথমটি প্রতিক্রিয়া চক্রের রাজনৈতিক আক্রমণের বিষয়বস্তু হিসাবে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষণের তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক বাধলে তার সম্মুখীন হতে আমাদের বাধা নেই, কারণ, আমরা জানি যে সুস্থ বিচার-বিতর্ক সমাজকে উন্নতির দিকেই অগ্রসর করে দেয়। কিন্তু যা যুক্তিবিচারের ধার ঘেঁসেও যেতে চায় না, যা আক্রমণ মাত্র, যার উদ্‌ভব অবিমিশ্র গোষ্টিস্বার্থ ও বিদ্বেষ থেকে, যুক্তির পথে তাকে ঠেকানো যায় না। কিন্তু সুখবর এই যে, অসার-বক্তব্য-সম্বল কলহের চক্রান্তে দেশবাসী বিভ্রান্ত হয়নি। শিশুর কথা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইংরেজি শিখতে হবে, নইলে পরে সে ইংরেজি শিখতে পারবে না, এ যুক্তি যেমন অসার, তেমনি হাস্যকর, আর সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার সামিল দাস-মনোভাব থেকে উদ্‌ভূত। বিদেশী ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলিতে কুত্রাপি এই অবাস্তব নিয়ম নেই। তা ছাড়া নিতান্ত কচি বয়সে অশ্রুত অপরিচিত ভাষা চাপিয়ে এতে অন্যসব শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর কী আঘাত হানা হয়না? আর গ্রামীণ মানুষ ও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা যেখানে শতকরা আশি, তাদের বিপুল-সংখ্যক সন্তানদের অবহেলা করে কেবল বিত্তশালী মুষ্টিমেয় একটা শ্রেণীর সুবিধার্থে কোনো ব্যবস্থা নির্ধারণ করা সামাজিক অন্যায় নয় কি? যাই হোক, এ বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে

দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়েছেন তারজন্য তাঁরা অগণিত পল্লীবাসী ও বিচক্ষণ মানুষের সাধুবাদের পাত্র। আমাদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন্তু তা লক্ষ লক্ষ শিশুর বিকাশ-উন্মুখ জ্ঞানবুদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে নয়। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে নিবেদন, গলার জোরে চেঁচানোয় তাঁরা যেন কর্ণপাত না করেন। তারপর পরীক্ষার কথা। সর্বস্তরেই শিক্ষার সুচিন্তিত থিওরি অনুসারে পরীক্ষা নেওয়া, বিশেষে যে আকারে তা নেওয়া হয় তা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি যথার্থ পরিমাপক হয় না। শিশুরা জ্ঞাতব্য বিষয় ভালোভাবে জেনেও পরীক্ষার প্রশ্ন ধরতে পারে না এবং বাঁধা সময়ের মাপে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও পারে না। মৌখিক জিজ্ঞাসার জবাব বরং তারা কিছু দিতে পারে, যদি তাদের ভয় সংকোচ দূর করে দেওয়া যায়। আমাদের যাবতীয় পরীক্ষা বস্তুত মুখস্থবিদ্যায় কৃতিত্বের ও সেইসঙ্গে প্রাইভেট টিউটারদের কৃতিত্বের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে। এ আপদ বর্জিত হলেই ভাল, তবে চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে মানের শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক হওয়ায় আপদটা থেকেই গেছে। বলা বাহুল্য, এ উপরের শ্রেণীর কথা। প্রাথমিকের ক্ষেত্রে সেরকম বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ তো আর নেই। প্রাথমিকে প্রতিযোগিতামূলক অর্থাৎ কে ভাল কে মন্দ, কে বড় কে ছোট ইত্যাদি নির্ধারনে সরল শিশুচিত্তে যে সব মনস্তাত্ত্বিক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবি তার হাত থেকে শিশুদের বাঁচানোই যথোপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা তুলে দেওয়া হল এর অর্থ এই নয় যে শিশুদের অগ্রগামিতা অথবা তার অন্যথা পরীক্ষা করে তদনুযায়ী কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হবে না। সাপ্তাহিক বা মাসিক-বার্ষিক ক্লাস-টেস্ট অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, আর সেইসঙ্গে এও দেখতে হবে যে আদর্শ শিক্ষণের দ্বার শিশুদের জন্য যেন সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। প্রিয় শিক্ষক বন্ধুরা যাঁরা দেশ গঠণের ভিত্তিভূমি রচনা করছেন তাঁদের শিশুপ্রীতি ও সচেষ্ট অধ্যবসায়কে সর্বদা উন্মুখ ও জাগ্রত রাখতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

বন্ধুগণ, আজকের অবসরে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় স্মরণ করতে গিয়ে দেশের উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপারও অনায়াসেই স্মৃতিপটে এসে যাচ্ছে, যেহেতু শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলির কোনোটির অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষ গঠণের প্রয়োজনীয়তার সূত্রে সবগুলিই সোপান-পরম্পরায় ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। শিক্ষায় স্তরবিন্যাসের সঙ্গে কোন্ স্তর কিসের জন্য কোন্ দিক লক্ষ্য করে তা রচিত হবে- এবিষয়ে রাষ্ট্রর পরিষ্কার একটা চিন্তাদর্শন থাকা প্রত্যাশিত। তা যে নেই এমনও নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্যক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হচ্ছে না বা তা সম্ভবপরও হয়ে উঠছে না তীব্র বেকার-সমস্যার

আক্রমণে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, কাজকর্মের প্রয়োজনে যেসব ক্ষেত্রে উচ্চমান মাধ্যমিকই যথেষ্ট, সে সব ক্ষেত্রে স্নাতক এমনকি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলে সুযোগ আরও বেশি হবে এই ধারণায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলি অপরিমিত ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে ডিগ্রির পণ্যশালায় পরিণত হয়ে পড়েছে, এবং এতে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট সামাজিক মানুষ গঠন সম্ভবপর হচ্ছে না, গবেষণার মান গেছে নেমে, অর্থ ও শক্তির অপচয় ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অবহেলা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে এই কয়েক বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষায় অর্থনিয়োগের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করে তোলা হয়েছে, অথচ প্রাথমিক শিক্ষা তার আংশিক দাক্ষিণ্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষার প্রবাহটা বইছে উল্টো দিকে, 'আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা' কেবল কালি-কলমেই থেকে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করে দিয়েছেন, সেটা একটা স্মরণীয় কথা বটে কিন্তু শিক্ষার মাথা-ভারি ব্যবস্থার বিপর্যয় তাঁদের সাধ্যায়ত্ত হয়নি। এর একটা বস্তুগত প্রমাণ এই দেখুন না একজন বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষকের মাসিক বেতন একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন হারের চারগুণ। এর উপর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নানান রীতির বদান্যতাও দেখানো হচ্ছে। অথচ শিশু ও কিশোরদের ন্যায্য প্রাপ্য শিক্ষার উপকরণ থাকে না। নেই তাদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের ব্যবস্থা। দেশটাকে লাইসেন্স বানিজ্যের সঙ্গে মিলিয়ে এমন একটা মাথা-ভারি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যার নজির আগেকার বৈদেশিক প্রশাসন-নীতিতেই মিলবে। এর প্রতিবাদ আমাদের জানাতেই হবে। আমরা চাইব আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, আমরা চাইব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল সার্থক ও কার্যকর বৈশিষ্ট্য, ফলপ্রসু বৈজ্ঞানিক ও মানবিক গবেষণা অযোগ্য অপদার্থের সৃষ্টিতে ব্যয়রোধ করা হোক, দুর্বলতম মানুষ অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার পাক।

অন্য পাঁচটা ব্যবস্থার মত শিক্ষাব্যবস্থায় ও ভিত্তিমূলে বিদ্যমান যে আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতি স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে- যা দুর্বল ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনকে আজ গ্রাস করে ফেলেছে, আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তারও অবসান চাইছি। দুঃসহ বেকার, নৃশংস মূল্যবৃদ্ধি, ও সেইসঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির জঘন্য পরিস্থিতিকে আমরা একই বিষবৃক্ষের ফল বলে মনে করি। আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে, যে –সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ নীতির জন্য একদা আমরা বৈদেশিক প্রশাসনের বিপক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছি,

স্বাধীনতার পর সেই অভিশপ্ত শ্রেণীস্বার্থ নীতিই আজ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যন্ত রাজ্যগুলিকে অনিবার্য অবক্ষয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আজ দেখা যাচ্ছে, প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের নামে ভারতীয় সংবিধান এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যাতে ক্ষমতাশালীদের ব্যক্তিস্বার্থ ও বণিক্‌স্বার্থ বিপন্ন না হয়, বিত্তবানেরা যাবতীয় সুযোগ লাভে পরিস্ফীত হয়ে রাষ্ট্রিয় প্রশাসন-যন্ত্রকে সহজেই কুক্ষিগত করতে পারে। আমরা ভীত হয়ে লক্ষ্য করছি, বণিক-চক্রের সঙ্গে অশুভ রাস্ট্রীয় আতাঁতই ভারতীয় সাধারণ মানুষের যাবতীয় দুর্ভোগের মূলে। একই মৌলিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির স্বাধীনতা প্রায় সব দিক দিয়েই খর্ব্ব করে রেখেছে। সমাজের বিবেকী মানুষ হিসাবে আমরা এই শোষণ-পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন দাবী করি, দাবী করি সংবিধানের পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতি-নির্ভর নবীকরণ।

পরিশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকা বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে এই অগ্রজের এই আবেদন যে আপনাদের রাজ্য সম্মেলনগুলি কেবল মামুলি সভাসমিতি ও আনন্দোৎসবেই যেন সমাপ্ত না হয়। আপনাদের প্রস্তাবিত কার্যধারা বিভিন্ন জেলাস্তরে সুবিন্যস্ত ও বাস্তব হয়ে উঠুক। সংগঠন হোক সংগ্রামী ও প্রতিবাদী, অথচ সেইসঙ্গে গঠনমূলক। সাম্প্রদায়িক কলহ, জাতপাঁতের বিচার- যা জঘন্য পশুবৃত্তি – তা মানুষের মন থেকে নির্মূল করার খানিকটা নৈতিক দায়িত্ব শিক্ষকদের, এ কথা তো ঠিক। কেবল সরকারি মৌখিক প্রতিশ্রুতির অনুকরণ, বাস্তবে তার প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগই সমাজ আপনাদের কাছ থেকে কামনা করে। আপনাদের বিশেষ গৌরব এই যে গ্রামীন মানুষের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্টতার পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। আর, গ্রাম-বাঙলাই তো রাজ্যের সব থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ সংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত অংশ। আপনাদের জাতীয় চেতনা ও কর্মীরূপ আপনাদের জীবিকা ও বৃত্তিগত পরিস্থিতিকে ছাড়িয়ে দেশের বাস্তব সমস্যার অভিমুখেও বিস্‌তৃত হোক।

শুভানুধ্যায়ী
ক্ষুদিরাম দাস
কৃষ্ণনগর
সভাপতি অভ্যর্থনা কমিটি
১০/০৬/৮৪ ৬ষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন